বৈষ্ণব পাটবাড়ি চর্চা

মিতালী বিশ্বাস

বৈষ্ণব পাটবাড়ি চর্চা

বই পড়ুন... বই পড়ান

বৈষ্ণব পাটবাড়ি চর্চা

মিতালী বিশ্বাস

আ

Baishnab Patbari Charcha
By Mitali Biswas
Published by ATMAJAA PUBLISHERS
ওয়েব :www.atmajaa.com
ইমেইল :info@atmajaa.com

ISBN : 978-93-87885-46-2

প্রথম প্রকাশ : রাস পূর্ণিমা ১৪২৬

প্রকাশক
অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়
আত্মজা পাবলিশার্স
বসন্ত কুসুম, আড়িয়াদহ, কলকাতা - ৫৭

মুদ্রণ
শরৎ ইমপ্রেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩

বইটিতে পুরোনো বানান অপরিবর্তিত আছে

উৎসর্গ

বাবা ও মা'কে

সূচি

কথামুখ

বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মচর্চা ও প্রবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ আধার বৈষ্ণব পাটবাড়িগুলি। এই পাটবাড়িগুলি বৈষ্ণবদের কাছে ধর্মসাধনার তীর্থক্ষেত্র। বৈষ্ণব আচার্যরা ধর্মালোচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে পাটবাড়িগুলি তৈরি করতেন। অনেক ক্ষেত্রে বৈষ্ণব আচার্যরা নিজেদের আবাসকেও পাটবাড়িতে পরিণত করতেন। সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতাপ থেকে সর্বস্তরের মানুষকে স্বকীয় ও স্বতন্ত্রভাবে ধর্মাচার পালনের প্রেরণা যুগিয়ে দিতেন বৈষ্ণব প্রভুরা। আর এই আন্দোলনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বৈষ্ণব পাটবাড়িগুলি। সমাজের বহু অসহায়, বিধবা ও পতিতা নারীর সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করার সম্মানীয় অধিষ্ঠান ছিল বৈষ্ণব পাটবাড়ি। এছাড়া প্রাচীন পুথি, বৈষ্ণব পদ, প্রাচীন সাহিত্য এবং মহান ব্যাক্তিদের ব্যবহৃত বহু জিনিসের দুর্লভ সংগ্রহশালা হিসাবেও বাংলাদেশের বিভিন্ন বৈষ্ণব পাটবাড়িগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজে ব্রাহ্মণ্য বা শিক্ষিত উচ্চশ্রেণির মানুষের উচ্চতর ধর্মভাবনার রক্ষণশীলতা, বৃহত্তর প্রান্তীয় সমাজের অমানবিক, হিংসাদীর্ণ, বীভৎস, রক্তাক্ত ধর্মাচার পালন, ইসলাম রাজশক্তির বিকৃতকরণে তমসাপূর্ণ সমাজ জীবনকে মুক্তি দিয়েছিলেন বাংলার ভক্তি আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্ব শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি মানবিকতার স্রোতে সমস্ত বীভৎসতা ও চেতনাহীন অসুস্থতা ভাসিয়ে দিলেন। তিনিই শেখালেন মানবিক আত্মমর্যাদা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার মন্ত্র। নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করলেন যুক্তিবাদী এই মানুষটি। মানবিক প্রেম, বিনয়, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও ক্ষমা যেন ধর্মের সমার্থক হয়ে উঠল। বাঙালি হিন্দু নারীর সমাজের ধর্ম পালনে প্রত্যক্ষ অধিকার জন্মাল। আত্মশক্তিতে ভরপুর এই মানুষটি সমাজ ও ধর্মীয় জীবনের স্থবিরতাকে এক নতুন উজ্জীবনের স্রোতে পরিণত করলেন। চৈতন্যদেবের বিচরিত পূণ্যভূমিগুলো অর্থাৎ বৈষ্ণব শ্রীপাটগুলো ধর্মের এই নতুন প্রবাহকে নির্বিঘ্নে বয়ে নিয়ে চলার দায়িত্ব নিল। তাই বাংলার বৈষ্ণবধর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী শ্রীপাটের সমগ্র ইতিবৃত্ত আলোচনা করা খুবই জরুরি। বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান অদ্বৈত আচার্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাভূমি নদিয়া জেলা এবং বৈষ্ণব মহান্ত ও চৈতন্য পরিকরদের বিহারক্ষেত্র বর্ধমান জেলার প্রায় ছাব্বিশটি উল্লেখযোগ্য পাটবাড়ি রয়েছে। নদিয়া ও বর্ধমান জেলার পাটবাড়িগুলো বহুকাল ধরে বৈষ্ণবীয় ভাবধর্মের অনুশীলন করে চলেছে।

আমি জন্মসূত্রে নদিয়ার শান্তিপুরের বাসিন্দা। বিগ্রহ নিয়ে পাটবাড়ির নানা বৈচিত্রময় কার্যকলাপ ছোটো থেকেই আমায় আকর্ষণ করত। তাই এই বইটিতে আমি বৈষ্ণব শ্রীপাট সম্পর্কে বিশদে জানা ও জানানোর চেষ্টা করেছি।

মানুষ জীবনের কোনো একসময় তার শিকড়ের সন্ধানে ফেরে। কারণ এই সন্ধান খুবই জরুরি। তাই ভারতবর্ষের উল্লেখ্যযোগ্য ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম কেন্দ্র নদিয়া ও বর্ধমান জেলার শ্রীপাটগুলোর অতীত ও বর্তমান ইতিহাসচর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাস, দোল, জন্মাষ্টমী, নাম-সংকীর্তন ইত্যাদি বারোমাসিক উৎসবের মধ্যে দিয়ে বৈষ্ণব পাটবাড়িগুলির ধর্মসাধনা প্রবাহিত হচ্ছে। আনন্দের কথা, পাটবাড়িগুলো এই উৎসবের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ধর্মীয় সীমানা অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। তাই আমি ক্ষেত্রসমীক্ষার দ্বারা নদিয়া ও বর্ধমান জেলার পাটবাড়িগুলোর সামগ্রিক ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থাকে তুলে ধরতে চাই। এছাড়া আলোচনার সুবিধার্থে বইটিকে আমরা চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি, বৈষ্ণব পাটবাড়ি কাকে বলে? বৈষ্ণব সাহিত্য বা

সংস্কৃতিচর্চায় পাটবাড়ির গুরুত্ব কি? পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাটবাড়ির পরিচয় এবং তাদের প্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি, নদিয়া জেলার পাটবাড়ি নিয়ে। বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনে অদ্বৈতাচার্য, সীতাদেবী ও চৈতন্যদেবের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। এছাড়া শান্তিপুরের বিভিন্ন পাটবাড়ি, নবদ্বীপের বিভিন্ন পাটবাড়ি, শ্রীপাট কুলিয়া এবং শ্রীপাট যশড়ার অতীত ও বর্তমান ইতিহাস আলোচনা করেছি। এ ব্যতীত নদিয়া জেলার পাটবাড়ির বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাস এবং শান্তিপুর ও নবদ্বীপের বিখ্যাত উৎসব রাসের কথা আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল, বর্ধমানের বিভিন্ন পাটবাড়ির সামগ্রিক ইতিহাস। বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনে কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কুলীনগ্রাম ও অগ্রদ্বীপ শ্রীপাটের মহান বৈষ্ণবদের অবদান পর্যালোচিত হয়েছে। চৈতন্যপরবর্তী বাংলার ভক্তি আন্দোলনকে প্রসারিত করতে বর্ধমানের বৈষ্ণবদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের ইতিহাস এখানে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি, বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চায় নদিয়া ও বর্ধমানের তুলনা। শুধু সাহিত্যই নয়, বৈষ্ণব সংস্কৃতি চর্চাতেও দুই জেলা ভূমিকা অগ্রগণ্য। এছাড়া আছে উপসংহার, পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপঞ্জি।

সবশেষে স্মরণ করি তাঁদের কথা, যাঁরা না থাকলে আমার ভাবনাটি মুদ্রণ রূপ পেত না। সমগ্র বিষয়টি রূপায়ণে বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, আমার শিক্ষক নির্মল কুমার মণ্ডলের কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী। এই গুরুঋণ অপরিশোধযোগ্য। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এই অবসরে একজনের কথা না বললেই নয়, তিনি অধ্যাপক অপর্ণা রায়। সময়ে অসময়ে বিভাগে বা বিভাগের বাইরে তাঁর ছত্রছায়ায় আমি শিখেছি অনেককিছু। এই ঋণও গুরুঋণতুল্য, পরিশোধ হবার নয়। তাঁকে জানাই ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। এছাড়া অধ্যাপক শ্রীলা বসুর কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণী। তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম রইল। এই কাজের ব্যপারে বিভাগীয় শিক্ষকদের বাইরে যিনি সর্বাধিক উৎসাহ দিয়েছিলেন, তিনি প্রাগাধুনিক কালের সাহিত্য গবেষণায় আমাদের সকলের আচার্যাণীতুল্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্যবতী গিরি। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই অবসরে তাঁকেও জানাই আমার বিনম্র প্রণাম।

বিভিন্ন সময়ে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, বরাহনগর পাটবাড়ির গ্রন্থাগার, বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাগার, চৈতন্য রিসার্চ ইন্সটিউট অব চৈতন্যডোবা, নবদ্বীপের হরিবোল কুটীর, শ্রীখণ্ড পাটবাড়ির গ্রন্থসম্ভার থেকে পেয়েছি নানারকম তথ্যের যোগান। এইসমস্ত গ্রন্থাগারিকদের কাছেও আমার ঋণ কম নয়। এছাড়াও সময়ে অসময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা ও দৈনিক সংবাদপত্র আমায় অনেক তথ্য সরবরাহ করেছে। সেইসব সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক ও দৈনিক পত্রিকা দপ্তরের কাছেও আমি ঋণী। আমি ঋণী নদিয়া ও বর্ধমান জেলার পাটবাড়ির সদস্যদের কাছে। সত্যনারায়ণ গোস্বামী, যুবরাজ ব্রজকিশোর গোস্বামী, স্বরূপ গোস্বামী, রঘুনন্দন গোস্বামী, গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী, প্রসুন গোস্বামী, শশাঙ্ক গোস্বামী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অশোক দত্ত, মদন ঠাকুর, নিত্যানন্দ গোস্বামী, লক্ষ্মীকান্ত গোস্বামী, নৃপতীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরি গোস্বামী ও লক্ষণ গোস্বামী নিজেদের হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে আমার নানা কৌতুহলের নিরসন ঘটিয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম রইল। নানা সময়ে ক্ষেত্রসমীক্ষায় আমার সহযাত্রী হয়েছে আমার সহপাঠী ব্রজসৌরভ চট্টোপাধ্যায়, মুগ্ধ মজুমদার, রাজীব শেখ ও পূজা কর্মকার। এই বন্ধুদের ভালোবাসা। এছাড়া উল্লেখ্য, আমার অগ্রজপ্রতিম সোমাঞ্জন মণ্ডল ও সুপ্রিয় কাঞ্জিলাল, শুভাশিষ গায়েন এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা না থাকলে বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি ছাপার রূপ পেত না। তাঁদের প্রতি আমার অসংখ্য ধন্যবাদ রইল। সবশেষে বলতেই হয় আমার দুই সহোদরা নুপু ও চুটুর সার্বিক সাহায্য ব্যতীত আমার কাজটি অসম্পূর্ণ থাকত। ওদের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা রইল।

যদিও নির্দিষ্ট সময়সীমা ও পরিসরে এই বৃহৎ বিষয়টির আলোচনায় রয়ে গেল অনেক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা, যার ঐকান্তিক দায় গবেষকের নিজের।

প্রথম অধ্যায়

বৈষ্ণব ধর্মচর্চায় পাটবাড়ি

কপালে রসকলি, গলায় কাঠের মালা, মুখে কৃষ্ণ নাম - এই মানুষগুলোর বেশ কয়েকটা শতকের সংগ্রামের ইতিহাস লুকিয়ে আছে ভারতবর্ষ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পাটবাড়িগুলোতে। মাধবেন্দ্রপুরী, অদ্বৈতাচার্য, চৈতন্যদেব, সীতাদেবী থেকে শুরু করে ভাগবতাচর্য, সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী, জাহ্নবা দেবী, হেমলতা ঠাকুরানী, দেবকীনন্দন গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যদের জীবনলীলার নানা ঘটনার সাক্ষী হয়েও রয়েছে এই শ্রীপাটগুলো। তবে পাটবাড়ি বা শ্রীপাটের পরিচয় শুধু এইটুকুই নয়। পরম বৈষ্ণব হরিদাস লিখেছেন -

> "বৈষ্ণব পরিভাষায় শ্রীধাম ও শ্রীপাট শব্দদ্বয় যথাক্রমে শ্রীভগবান ও শ্রীভক্তের লীলানিকেতনকে বুঝায়। শ্রীনবদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীক্ষেত্রকে শ্রীধাম এবং কাটোয়া, যাজিগ্রাম, শ্রীখণ্ড প্রভৃতিকে শ্রীপাট বলা হয়। পট্ট শব্দের অপভ্রংশ - পাট অর্থাৎ গ্রাম।"[১]

আবার অভিরাম দাসের মতে দুই তিনজন ভক্তের বসবাস বা জন্মের কারণে ও কোনো স্থানকে মহাপাট বলা যায়। তিনি চৌত্রিশটি পাটের কথা উল্লেখ করেছেন।

> "পঞ্চধাম দ্বাদশ পাট সপ্তদশ হয়।
>
> ভক্তগনের সপ্তদশ সহ চৌত্রিশা পাট কয়।।"[২]

তিনি পাঁচটি ধাম অর্থাৎ নবদ্বীপ, কাটোয়া, একচক্রা, খড়দহ ও শান্তিপুর; দ্বাদশ গোপালের বারোটি শ্রীপাট এবং ভক্তদের সতেরোটি শ্রীপাট মোট চৌত্রিশটি শ্রীপাটের উল্লেখ করলেও পরবর্তীকালে গবেষকদের অনুসন্ধান এবং আমাদের ব্যাক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। আরো অনেকগুলি শ্রীপাটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে বর্ধমানের মাধাইতলা শ্রীপাট, সখীআখড়া; নদিয়ার কুলিয়াপাট, বড় গোস্বামী বাড়ি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাড়ি, পাগলা গোস্বামী বাড়ি, কৃষ্ণনগরের দোগাছি ইত্যাদি। পাটবাড়িগুলো মহাপুরুষদের ভাবাবেশ ও চিন্তা তরঙ্গের উদ্দীপন। বৈষ্ণব আচার্যরা ধর্মালোচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে পাটবাড়িগুলি তৈরি করতেন। অনেক ক্ষেত্রে বৈষ্ণব আচার্যরা নিজেদের বাসভূমিকে পাটবাড়িতে পরিণত করেছেন।

'শ্রীমদ্‌ভাগবত'এর মতে ভাগবতগণই যদি স্বয়ং মহাতীর্থ হয় তাহলে বলা যেতে পারে শ্রীপাটগুলি বৈষ্ণবদের কাছে ধর্মসাধনার তীর্থক্ষেত্র। সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতাপ থেকে সর্বস্তরের মানুষকে স্বকীয় ও স্বতন্ত্রভাবে ধর্মাচার পালনের প্রেরণা যুগিয়েছিলেন বৈষ্ণব প্রভুরা।

আর এই আন্দোলনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়েছে পাটবাড়ি। এছাড়াও প্রাচীন পুথি, পদ, প্রাচীন সাহিত্য ইত্যাদি শ্রীপাটগুলোতে অরক্ষিত বা সংরক্ষিত অবস্থায় আছে। আবার শ্রীপাটে বৈষ্ণব মহাপুরুষদের ব্যবহৃত নানা জিনিষ সংরক্ষিত করা আছে। যেমন বরাহনগর পাটবাড়িতে চৈতন্যদেবের ব্যবহৃত পাদুকা, উপবীত, হাতের লেখা, বিদ্যাপতির হাতের লেখা, মহাপ্রভুর ব্যবহৃত কমণ্ডুল, শ্যামানন্দ প্রভুর কাঁথা, মহাপ্রভুর জন্ম-কুণ্ডলি, মহাপ্রভুর ব্যবহৃত কাঁথা, মহাপ্রভু নিত্যানন্দের দণ্ডের অংশ, রূপ-সনাতন হাতের লেখা, ষোড়শ শতকের রূপার মুদ্রা, চণ্ডীদাসের হাতের লেখা, বিভিন্ন তীর্থের রজ-জল,

মহাপ্রভুর ব্যবহৃত বসন, ইত্যাদি। শ্রীখণ্ডে আছে নরহরি সরকার ঠাকুরের ব্যবহৃত শয্যা আসবাব; যশড়ায় আছে জগদীশ পণ্ডিতের পুরী থেকে জগন্নাথ মূর্তি বহন করে আনার দণ্ড ইত্যাদি।[৩]

বিভিন্ন দুর্লভ জিনিসের সংগ্রহ ছাড়াও পাটবাড়িতে ধর্মাচারণের এক অদ্ভুত বাতাবরণ আছে। অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন, ভাগবত-গীতা পাঠ নানা আচার-অনুষ্ঠান, পূজাপাঠ ঈশ্বরের কথা আলোচনা প্রভৃতি হয়। শ্রীপাটে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ প্রত্যেক দিন কাজের শেষে ভগবানের নাম গান করতে আসে। প্রত্যেকের মধ্যে শুভভাবের সঞ্চারণ আরো বেড়ে ওঠে। যে মানুষগুলো রোজ লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যায় বা জাল নিয়ে পুকুরে বা নদীতে যায় তারাও 'রামায়ণ', 'মহাভারত' বা 'ভগবত'এর বিভিন্ন ঘটনা খুব সহজ ভাষায় বলে দিতে পারে। এককথায় মধ্যযুগে কথকতার যে রেওয়াজ ছিল তা এখনো শ্রীপাটগুলির মাধ্যমে টিকে আছে। আমরা প্রশ্ন তুলতেই পারি এ ঘটনার মধ্যে মৌলিকতা কি আছে? কারণ কলকাতা শহরেও এখন 'পাট', 'ভগবত' বা 'হরিসভা' দেখতে পাওয়া যায়, একথা ঠিক কিন্তু সেই সভার মধ্যে যে সাজসজ্জা, আড়ম্বর ও জৌলুসের কৃত্রিমতা দেখতে পাওয়া যায় সে তুলনায় প্রাণবত্তা নেই। আর গ্রাম বা মফঃস্বলের শ্রীপাটের আসরে প্রাণোচ্ছলতাই মূল উপাদান। শুধু তাই নয়, পাটবাড়িগুলো নানা সামাজিক কর্তব্য পালন করে চলেছে। অর্থের অভাবে গরিব মানুষ বিভিন্ন অনুষ্ঠান (যেমন- বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি) সামাজিকভাবে পালন না করতে পারলে শ্রীপাটে এসে বিগ্রহের আরাধনা করে যৎসামান্য খরচে অনুষ্ঠান অতিবাহিত করে।

সমাজের অসহায় নারীরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে খুব ভালোভাবে বাঁচার রসদ পেয়েছিল। বৈষ্ণব নারীরা সাক্ষর ছিলেন। এরা বিত্তশালীদের নারীমহলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতেন। এছাড়া পতিতাপল্লিতেও ঘুরে ঘুরে তাঁরা শিক্ষার আলো প্রসারিত করতেন। সেকালের স্বাস্থ্যচর্চা ও শিক্ষাচর্চার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল শ্রীপাটগুলো।

চৈতন্যসমকালে ও চৈতন্যোত্তরকালে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার প্রচার ও প্রসারে বৈষ্ণব পাটবাড়িগুলি সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিল। বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠানগুলি বর্তমান কাল পর্যন্ত নিখুঁতভাবে পালন ও বহন করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের ছোটো ছোটো পাটবাড়িগুলো।

ঐতিহাসিকেরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনেক পাটবাড়ির সন্ধান দিয়েছেন।[৪] এই পাটবাড়িগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বীরভূমের একচক্রা-বীরচন্দ্রপুর, নানুর, পাহাড়পুর, মঙ্গলডিহি, খয়রাসোল, মুলুক; হুগলির কৃষ্ণনগর, অনন্তনগর, রাধানগর, কোটরা, গোপালনগর, দ্বীপা; বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, গোকুলনগর; মুর্শিদাবাদের ভরতপুর, ডাঁহাপাড়া; মালদহের রামকেলি; মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর, তমলুক, গড়বেতা, রোহিণী, হিজলি, আঙ্গিরি; পুরুলিয়ার বেগুনকোদর, রঘুনাথপুর, চাকলতোড়; কলকাতার বরাহনগর, উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ, পানিহাটী; বর্ধমানের অগ্রদ্বীপ, কাটোয়া, কাঞ্চননগর, দেড়, ঝামটপুর এবং নদিয়ার নবদ্বীপ, মায়াপুর, শান্তিপুর, কুলিয়া, যশড়া, দোগাছি ইত্যাদি।

বীরভূমের পাটবাড়ি :

একচক্রা-বীরচন্দ্রপুর:- শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান। বীরভূম জেলার অন্যতম শ্রীপাট। সেবিত বিগ্রহ 'বঙ্কিমদেব'।

কেন্দুবিল্ব:- কবি জয়দেবের শ্রীপাট। বর্ধমানরাজ কৃত্তিচাঁদের রাণী নৈরাণীর দানে ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে কেন্দুবিল্বে 'রাধামাধব মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫] বর্তমানেও পৌষ সংক্রান্তিতে কেন্দুলিতে বৈষ্ণবদের বড় উৎসব হয়।

মঙ্গলডিহি :- সুন্দরী ঠাকুর ও পানুয়া গোপালের শ্রীপাট আছে মঙ্গলডিহিতে। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ 'শ্যামাচাঁদ' ছাড়াও 'বলরাম', 'রাধারানী', 'রেবতী' ও 'গোপাল' পূজিত হয়। এখানে আগে বৈষ্ণব সম্মেলন হত এবং সংস্কৃত শিক্ষার টোল ছিল।

নানুর :- চণ্ডীদাসের পাট। তান্ত্রিকদেবী 'বিশালাক্ষী'-র বিগ্রহ আছে। তান্ত্রিকদেবী 'বিশালাক্ষী'-র সঙ্গে এখানে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের সাধনাও হয়।

জলন্দি :- চৈতন্যপার্ষদ ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট।

পানুরি :- অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-গদাধর ও মুকুন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেব পানুরিতে একটি গাছতলায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেটাই পরবর্তীকালে পানুরি শ্রীপাটে পরিণত হয়েছে।

কাকুটিয়া দেউলি :- লোচনদাসের শ্রীপাট

পাহাড়পুর :- ঈশান নাগরের পাটবাড়ি

জোকলাই :- পরম বৈষ্ণব জগদানন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত পাটবাড়ি। এখানে গোপীনাথ মন্দিরে 'গৌরাঙ্গ' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

বাঁকুড়ার পাটবাড়ি :

বিষ্ণুপুর :- বৈষ্ণব আচার্য শ্রীনিবাস ও তাঁর প্রিয় শিষ্য রাজা বীরহাম্বিরের বৈষ্ণবচর্চার আলোড়নের ফলে বিষ্ণুপুরে শ্রীপাট গড়ে ওঠে। এখানে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ 'কালাচাঁদ', 'মদনমোহন', 'মদনগোপাল', 'শ্যামাচাদ জিউ'। নিত্য সেবার দ্বারা বিগ্রহের পূজা হয়। শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই ধর্মের শান্তিময় সহাবস্থান ঘটেছে এখানে।

ছাতনা :- বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীপাট। এই পাটে বাসুলি দেবীর মূর্তি আছে।

কেশিয়াকোল বা গোড়াসোল :- শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা দেবীর শ্রীপাট। এখানে নিয়মিত নামগান, নগর-সংকীর্তন দীক্ষা প্রভৃতি হয়। গৌড়ীয় সারস্বত নামে একটি পত্রিকা এই শ্রীপাট থেকে প্রকাশিত হয়।

হুগলির পাটবাড়ি :

আনরবাটী :- বৈষ্ণব সমাজের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম পরমেশ্বর দাস আনরবাটীতে শ্যামের পাট গড়ে তুলেছিলেন। এখানে গোপালভাবে সাধনার দ্বারা বিগ্রহের নিত্যসেবা পূজা হয়।

অনন্তনগর :- খানাকুল থেকে বাসে করে অনন্তনগর। শ্রী হীরামাধবের শ্রীপাট।

কৃষ্ণনগর :- খানাকুলের কৃষ্ণনগরে অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাট অবস্থিত। অভিরাম গোস্বামী চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ ছিলেন। তিনি এখানে 'গোপীনাথ বিগ্রহ' প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণনগরের রাস এই অঞ্চলের দর্শনীয় উৎসব। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা সপ্তমীতে শ্রীপাটে মহোৎসব হয়।

কৃষ্ণপুর :- ষড়গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাট কৃষ্ণপুরে প্রতিষ্ঠিত। এই পাটে জনৈক মাধবদাসের অনুলিখিত তুলোট কাগজে লেখা চৈতন্য চরিতামৃত-এর একটি সম্পূর্ণ পুথি রক্ষিত আছে।

আদিসপ্তগ্রাম :- আদিসপ্তগ্রামের কাছেই উদ্ধারণপুরে দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট প্রতিষ্ঠিত। এখানকার সেবিত বিগ্রহ 'গৌরনিতাই', 'গদাধর', কষ্টিপাথরের 'কৃষ্ণ' এবং 'শ্রীরাধা'।

গোপালনগর :- কৃষ্ণনগর ও খানাকুলের মাঝে গোপালনগর শ্রীপাট। এটি শ্রীহরিদাস দাসের শ্রীপাট।

জিরাট :- নিত্যানন্দের কন্যা শ্রীগঙ্গাদেবীর শ্রীপাট। সেবিত বিগ্রহ রাধা শ্রীরাধা গোপীনাথ। এই শ্রীপাটের উল্লেখযোগ্য উৎসব রাস।

বল্লভপুর :- গৌরাঙ্গ পার্ষর্দ কাশীশ্বর পণ্ডিত, শ্রীনাথ ও রুদ্রপণ্ডিতের শ্রীপাট। সেবিত বিগ্রহ ‘রাধাবল্লভ’ ও ‘রাধারাণী’। এই শ্রীপাটের উল্লেখযোগ্য উৎসব রাস।

ভোদো বা ভেদুয়া :- সপ্তগ্রামের কাছে ভোদোতে গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীঝড়ু ঠাকুরের পাট আছে। ঝড়ু ঠাকুর এখানে ‘শ্রীমদনগোপাল-রাধারাণী’ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সেবা করতেন।

মাহেশ :- চৈতন্যদেবের প্রিয়পাত্র ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী স্বপ্নে জগন্নাথের আদেশে শ্রীরামপুরের মাহেশে ‘জগন্নাথ’ মূর্তির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কমলাকর পিপলাই-এর জামাতা শ্রীসুধাময় শ্রীপাটের সেবা পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে ঢাকার ‘নবাব’ ওয়ালিস খানের উদারতায় মাহেশের শ্রীপাটের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। অতীতে মাহেশ সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল এবং তন্ত্র সাধনাতেও উন্নত ছিল।[৬] কালের প্রবহমানতায় মাহেশের প্রাচীন গৌরব অনেকটাই ম্লান হয়েছে।

গোস্বামী মালিপাড়া :- শ্রীখঞ্জ ভগবান আচার্যের শ্রীপাট।

ভঙ্গমোড়া :- তারকেশ্বরের কাছে শ্রী অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য শ্রী সুন্দরানন্দের শ্রীপাট।

গৌরাঙ্গপুর :- শ্রী বাসুদেব ঘোষের শ্রীপাট।

মেদিনীপুরের পাটবাড়ি :

গোপীবল্লভপুর :- শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ গোস্বামীর লীলাস্থল। এই শ্রীপাটটি বৈষ্ণবদের অন্যতম তীর্থস্থান। আদিম অধিবাসী, উৎকল ও বঙ্গ সংস্কৃতি মিলেমিশে এখানে এক মিশ্র সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে। রাস উৎসবে শ্রীপাটের বিগ্রহকে কেন্দ্র করে মহাধুমধাম হয়। শ্রীপাটে রসিকানন্দের দুটি পদ ও একটি পুথি পাওয়া যায়।

তমলুক :- শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাধন্য বাসুদেব ঘোষ তমলুকে শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সেবিত বিগ্রহ হল ‘বাল গৌরাঙ্গ’। শ্রীপাটে বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষের বহু পদ পাওয়া যায় ছাপার অক্ষরে।[৭]

গড়বেতা :- কানাই ঠাকুরের লীলাস্থল।

হিজলি :- রসিকানন্দের পত্নী ইচ্ছাদেবীর জন্মভূমি।

পুরুলিয়ার পাটবাড়ি :

বেগুনকোদর :- দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বংশধর স্বরূপচাঁদ ঠাকুর পুরুলিয়ার বেগুনকোদরে শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন। স্বরূপচাঁদ ঠাকুর এখানে একটি ব্রহ্ম শিলালেখ নিয়ে আসেন। শ্রীপাটে শিলালেখটি বিগ্রহের সঙ্গে নিত্য পূজিত হয়।

হাওড়ার পাটবাড়ি :

সোনাতলা :- অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য রঙ্গন কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট আছে সোনাতলায়। আমতা থেকে রিক্সা করে সোনাতলায় যাওয়া যায়।

পিছলদহ :- মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত স্থান।

মুর্শিদাবাদের পাটবাড়ি :

ভরতপুর :- শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুস্পুত্র নয়নানন্দ মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে একটি শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে গদাধরের নিজের হাতের লেখা একটি 'গীতা' গ্রন্থ ছিল। সেই গ্রন্থের একটি শ্লোক মহাপ্রভু নিজে লিখেছিলেন। বহুদিন পূর্বে সেখানে প্রেমবিলাসবিবর্ত'র শেষ দুটি ছত্র ও নয়নানন্দের কিছু পদ পাওয়া যায়।[৮]

ডাঁহাপাড়া :- বাসুদেব সার্বভৌমের বংশধর শ্রী জগবন্ধু মুর্শিদাবাদের ডাঁহাপাড়া শ্রীপাটের প্রতিষ্ঠা করেন। জগবন্ধু প্রচার বিমুখ ছিলেন তাই জনসমক্ষে খুব বেশি আসতেন না। তাঁর মঠে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রবেশাধিকার আছে।

মালদহের পাটবাড়ি :

রামকেলি :- বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্যতম রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী মালদহের রামকেলিতে শ্রীশ্রীমদনমোহন জিউ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মহাপ্রভুর পদচিহ্ন আছে। মন্দিরের বাইরে অষ্টসখীর নামে আটটি কুণ্ড আছে। এটি বৈষ্ণব ধর্মচর্চার অন্যতম ক্ষেত্র। এখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে পাঁচদিন ব্যাপী অখণ্ড নাম সংকীর্তন ও অন্নকূট উৎসব হয়। এই উৎসবে বিভিন্ন রাজ্যের বহু মানুষের সমাগম ঘটে।

কোচবিহারের পাটবাড়ি :

কোচবিহারে বৈষ্ণবগুরু শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেব ও দামোদরদেব বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার করেন। তথাকথিত পাটবাড়ি কোচবিহারে নেই। তবে রাজবাড়িতে রাজানুকূল্যে মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।[৯] এরপর থেকে মহাধুমধামে বিগ্রহের সেবা-পূজা চলে আসছে। কোচবিহারের প্রধান উৎসব রাসে বিভিন্ন ধর্মের অসংখ্য মানুষের পদচারণা ঘটে।

উত্তর-চব্বিশ-পরগণার পাটবাড়ি :

খড়দহ :- চৈতন্য পার্ষদ পুরন্দর পণ্ডিত খড়দহে শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন। নিত্যানন্দের বিহারভূমি হিসেবে এই শ্রীপাটটি গুরুত্বপূর্ণ। বীরচন্দ্র, জাহ্নদেবী এই পাটের অন্যতম সদস্য। এখানে শ্যামসুন্দর মন্দিরে 'গৌরনিতাই' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

পাণিহাটি :- মহাপ্রভুর স্নেহধন্য রাঘব পণ্ডিত পাণিহাটিতে শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন। এই পাটের বিগ্রহের নাম 'শ্রীরাধামোহন'। পাণিহাটির দধিচিড়া মহোৎসব উল্লেখযোগ্য।

হালিশহর চৈতন্যডোবা :- মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী, শ্রীবাস পণ্ডিত ও নারায়ণীদেবীর হালিশহরে বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি শৈব ও শাক্ত ধর্মচর্চা হয় প্রাচীনকাল থেকে। এখানে বিগ্রহের নিত্য সেবাপূজা ও

বিভিন্ন উৎসব পালিত হয় নিষ্ঠার সঙ্গে। এই শ্রীপাট থেকে বর্তমান সেবাইত কিশোরী দাস বাবাজির সম্পাদনায় বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই পাটবাড়িতে অসংখ্য পুথি সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

সাঁইবনা :- মহাপ্রভুর সহচর রুদ্রপণ্ডিত সাইবেনেতে 'শ্যামসুন্দর', 'বল্লভজি' ও 'নন্দদুলাল বিগ্রহ' প্রতিষ্ঠা করে শ্রীপাট স্থাপন করেন। যদিও একথা নিয়ে নানা মতভেদ আছে। মাঘী পূর্ণিমার উৎসব এই শ্রীপাটের প্রধান উৎসব।

কলকাতার পাটবাড়ি :

বরাহনগর :- ভাগবত আচার্য বরাহনগরে শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে রামদাস বাবাজি এই শ্রীপাটের দায়িত্ব নেন। তিনি যবন হরিদাসকে আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। শ্রীমদ্ বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজি এই শ্রীপাটের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। এখানে 'ভাগবত চতুষ্পঠী'-তে নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। এই পাটবাড়ি থেকে নিয়মিত নানা বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এখানে অনেক প্রাচীন পুথি সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও ভগবান ও ভাগবতগণের বহু ব্যবহৃত জিনিষের সংগ্রহশালাও বিদ্যমান।

বর্ধমানের পাটবাড়ি :

অগ্রদ্বীপ :- পরম বৈষ্ণব গোবিন্দঘোষ ঠাকুরের শ্রীপাট হল অগ্রদ্বীপ। গোবিন্দঘোষ এখানে শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

কাটোয়া :- চৈতন্যদেবের দীক্ষাস্থল কাটোয়ায় গদাধর দাস ও কেশবভারতী শ্রীপাঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার সেবিত বিগ্রহ 'গৌরাঙ্গ'।

অম্বিকা কালনা :- চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই গৌরীদাস পণ্ডিত ও সূর্যদাস পণ্ডিত কালনায় শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে শ্রীপাটটি ভগবান দাস বাবাজির নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 'গৌর-নিতাই' বিগ্রহটির নিত্য সেবা পূজা ও বিভিন্ন উৎসব হয়।

কাঞ্চননগর :- গোবিন্দ কর্মকারের শ্রীপাট। সেবিত বিগ্রহ 'গৌরাঙ্গ'।

কুলীনগ্রাম :- মালাধর বসু, রামানন্দ বসু ও হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। এখানে 'মদনগোপাল' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

কান্দরা :- জ্ঞানদাস ও মঙ্গলঠাকুরের শ্রীপাট। সেবিত বিগ্রহ 'বৃন্দাবনচন্দ্র', 'রাধাকান্ত' ও 'রাধাকৃষ্ণ'।

বাঘনাপাড়া :- রামাই পণ্ডিতের শ্রীপাট বাঘনাপাড়া। এখানকার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ 'কৃষ্ণবলরাম'।

শ্রীখণ্ড :- নরহরি সরকারের শ্রীপাট। এখানে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, 'শ্রীগৌরাঙ্গ', 'বিষ্ণুপ্রিয়া এবং রাধাকৃষ্ণ'-এর যুগল বিগ্রহের সেবা করা হয়।

যাজিগ্রাম :- শ্রীনিবাস আচার্যের শ্রীপাট। শ্রীনিবাস এখানে 'শ্রীশ্রীগৌরনিতাই', 'মদনমোহন' ও 'রাধানাথ' বিগ্রহের সেবা পূজা প্রতিষ্ঠা করে যান।

নদিয়ার পাটবাড়ি :

নবদ্বীপ :- চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নবদ্বীপে অনেকগুলি শ্রীপাট আছে। সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির, নবদ্বীপ সমাজবাড়ি, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মিশন ইত্যাদি। এছাড়াও শ্রীবাস প্রভুর বাড়ি, পরম বৈষ্ণব হরিদাস দাসের কুঠির। এখানে 'গৌরনিতাই' ও 'রাধাকৃষ্ণ'-এর যুগল বিগ্রহ সেবিত হয়।

মায়াপুর :- শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মায়াপুরে গৌড়ীয় মঠ ও চৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

শান্তিপুর:- বৈষ্ণবগুরু অদ্বৈতাচার্য এবং তাঁর বংশধরদের শ্রীপাট শান্তিপুর। এখানকার সেবিত বিগ্রহ 'অদ্বৈতাচার্য-সীতাদেবী', 'রাধারমণ ও রাধিকা', 'গোকুলচাঁদ' ও 'শ্যামসুন্দর'।

যশোড়া:- চৈতন্য পার্ষদ জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট যশোড়া। তিনি এখানে 'জগন্নাথদেব' প্রতিষ্ঠা করে সেবা পূজা চালু করেছেন।

পালপাড়া:- চৈতন্য পরিকর দ্বাদশ গোপালের শ্রীপাট।

কুলিয়া:- দেবানন্দ গোস্বামীর অপরাধভঞ্জন পাট। সেবিত বিগ্রহ 'গৌরনিতাই'।

দোগাছি:- শ্রীবলরাম গোস্বামীর শ্রীপাট।

তথ্যসূত্র :

১। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-তীর্থ বা শ্রীপাট-বিবরণী, হরিদাস দাস; হরিবোল কুঠীর, নবদ্বীপ; দ্বিতীয় সংস্করণ, ৫০১ গৌরাব্দ; উদ্বোধিকা-অংশ।

২। সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা অষ্টাদশ ভাগ (ত্রৈমাসিক); সম্পাদক - নগেন্দ্রনাথ বসু; ১৩১৮ বঙ্গাব্দ; প্রবন্ধ - পাটপর্য্যটন ও শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয়; অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির; কলকাতা; পৃষ্ঠা - ১০৭। [অতঃপর পত্রিকাটি সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা অষ্টাদশ ভাগ (ত্রৈমাসিক): নামে উল্লিখিত হবে।]

৩। ক্ষেত্রসমীক্ষা; সাক্ষাৎকার দাতা- লক্ষণ গোস্বামী, গোস্বামী, বয়স – ৪৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা – মাধ্যমিক পাস, ঠিকানা - বরাহনগর পাটবাড়ি, কলকাতা, তারিখ – ০৬/০৬/২০১৫। সাক্ষাৎকার গ্রহিতা - গবেষক নিজে।

৪। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা অষ্টাদশ ভাগ (ত্রৈমাসিক): পৃষ্ঠা - ১০৭।

৫। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি; ষষ্ঠিচরণ ভট্টাচার্য; পুনশ্চ কলকাতা ৯; বইমেলা, ২০০১ সাল; পৃষ্ঠা - ১৫৩

৬। তদেব; পৃষ্ঠা - ২৩৭ - ২৩৮।

৭। তদেব; পৃষ্ঠা – ২৯২।

৮। তদেব; পৃষ্ঠা - ২৪৭ - ২৪৯।

৯। তদেব; পৃষ্ঠা - ২৭১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নদিয়া জেলার পাটবাড়ি

শান্তিপুরের পাটবাড়ি :

হরিচরণ দাস 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থে বলেছেন -

"শান্তিপুর গ্রাম হয় যোজন প্রমাণ।
প্রভু কহে নিত্যধাম মথুরা সমান।।
বৈকুণ্ঠে বিরজা নদী বহে চতুর্দিগে।
শান্তিপুরে দ্রবময়ী বহে তিন ভাগে।।"[১]

চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ অদ্বৈতাচার্যের লীলাভূমি শান্তিপুর প্রায় আটশো বছর ধরে প্রসিদ্ধি লাভ করছে।[২] সেন রাজাদের আমলে নবদ্বীপ ছিল বঙ্গের অন্যতম রাজধানী। তখন নবদ্বীপ গঙ্গা গর্ভস্থিত অনেকগুলি দ্বীপমালায় বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে প্রধান বারোটি দ্বীপ হল অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, এড়ুদ্বীপ, প্রবালদ্বীপ, কুশদ্বীপ, অন্ধ্রদ্বীপ, বৃদ্ধদ্বীপ, সূর্যদ্বীপ, জয়দ্বীপ ও চন্দ্রদ্বীপ। এই দ্বীপগুলির মধ্যে অন্যতম মধ্যদ্বীপের অন্তর্গত উলা বা বীরনগর, শান্তিপুর ইত্যাদি বিখ্যাত।[৩] শান্তিপুর যে বহুকাল আগে জলমগ্ন ভূখণ্ড ছিল তার প্রমাণ সময় সময় পাওয়া যায়। এখনও গভীরে খনন করলে নৌকার ভাঙা অংশ পাওয়া যায়। "কলিকাতা হইতে ৫৮ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এবং নদিয়া-জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম ও বৈষ্ণবতীর্থ শান্তিপুর ভাগীরথীর উত্তরতীরে বিরাজমান। ইহার লঘিমা ২৩°১৪'২৪'' উত্তর এবং দ্রাঘিমা ৮৮°২৯'৬'' পূর্ব।" পরবর্তীকালে নদিয়া জেলার নগরগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনঘনত্বপূর্ণ স্থান শান্তিপুর।[৪]

শান্তিপুরের নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা মতবাদ আছে। অনেকের মতে শান্তিপুরের বাবলা নামক স্থানে শান্ত বা শান্তমুনি নামে একজন বেদাচার্য বাস করতেন। তাঁর নামানুসারেই শান্তিপুর নাম হয়।[৫] তবে এ মত নিয়েও যথেষ্ট বিরোধ আছে। কারণ এই শান্তমুনি অদ্বৈতচার্যের সমসাময়িক। অদ্বৈতদেব বার বছর বয়সে শান্তমুনির কাছে 'বেদান্ত' ও 'শ্রীমদ্ভাগবত' পড়তে এসেছিলেন। ঈশান নাগর লিখেছেন

"পুর্ণবটীগ্রামে শীঘ্রগতি উত্তরিলা।
শান্তমুর্তি শান্ত দ্বিজবরে প্রণমিলা।।
প্রভুর সৌন্দর্য দেখি দ্বিজের বিস্ময়।
আশীর্ব্বাদ করি তবে লৈল পরিচয়।।
তাঁর সহ দ্বিজবর শাস্ত্র আলাপিয়া।
প্রশংসা করিলা বহু হরষিত হৈয়া।।
দ্বিজ কহে পড় বাছা যাহা লয় মনে।
তাঁর ঠাঞি প্রভু বেদ কৈলা অধ্যয়নে।।"[৬]

গৌড়ের বাদশার কাজের জন্য অদ্বৈতাচর্যের প্রপিতামহ নরসিংহ শান্তিপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি শান্তমুনিরও আগের লোক ছিলেন। সেই সময় শান্তিপুর দূর-দুরান্ত বিশ্রুত একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল।

আবার কারো মতে আগে হিন্দুরা তাঁদের মৃতকল্প পিতামাতাকে শান্তিপুরে এনে ভাগীরথীর তীরস্থ করে রাখত। যারা রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠত তাঁরা অমঙ্গলের ভয়ে সংসারে না ফিরে এখানেই বাকি জীবনটা এখানেই শান্তিতে কাটিয়ে দিত। এইসব সংসারত্যাগী শান্তিভিলাষী মানুষ নিয়ে গ্রাম গড়ে উঠেছিল বলে এই অঞ্চলের নাম শান্তিপুর।[৭]

অভিরাম দাস 'পাট পর্য্যটন' গ্রন্থে বৈষ্ণবদের পঞ্চধামের কথা উল্লেখ করেছেন–

"শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রভুর জন্ম হয়।
কাটোঙা প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয়।।
একচাকা জন্মভূমি খড়দহে বাস।
শ্রীনিত্যানন্দের দুইধাম জানিবা নির্যাস।।
শ্রীঅদ্বৈতের ধাম শান্তিপুরে হয়।[৮]
এই পঞ্চগ্রাম সবে জানিহ নিশ্চয়।।"

শ্রীধাম শান্তিপুর শুধুমাত্র অদ্বৈতদেবের লীলাভূমিই নয়, এই স্থানের মাটি পুণ্য হয়েছে বৈষ্ণব মাতা সীতাদেবী, পরম বৈষ্ণব অচ্যুতানন্দ (অদ্বৈতপুত্র) এবং মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর স্পর্শে। আজও শান্তিপুর বৈষ্ণবদের কাছে মহাতীর্থধাম। তাদের বিশ্বাস শান্তিপুরে যারা জন্মায় তার পরম ভাগ্যবান ও প্রণম্য ব্যক্তি। আমরা আগেই জেনেছি অদ্বৈতদেব বেদান্ত চর্চার জন্য শান্তিপুরে এসেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় নবদ্বীপের মতো শান্তিপুরও বিদ্যাচর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। 'Bengal Past and Present' গ্রন্থে C. R. Wilson জানিয়েছেন শান্তিপুরের বিদ্যাচর্চার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এককালে কুমারহট্ট, গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর, নবদ্বীপ এই চারটি স্থান ছিল হিন্দু বিদ্যা চর্চার অন্যতম কেন্দ্র।[৯] অদ্বৈতচার্যের শান্তিপুর গমনকালে শান্তিপুরে ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রচুর ছিল এবং তাদের প্রতাপও ছিল। শ্রীহট্টের লাউড় গ্রামবাসী কমলাক্ষ ভট্টাচার্য শান্তিপুরে বিদ্যাশিক্ষা শেষ করে সেখানেই স্থায়ী বসবাস গড়ে তোলেন। দীনেশচন্দ্র সেন লিখছেন – "ইনি যেরূপ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই ধনশালী হইয়াছিলেন। শান্তিপুরে ইহার রাজপ্রাসাদের ন্যায় অট্টালিকার নাম ছিল উপকারিকা।"[১০]

মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ, যবন হরিদাসকে বৈষ্ণব মন্ত্রদান, সীতাদেবী ও শ্রীদেবীকে বিবাহ ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে তিনি বিভীষিকাময় সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছিলেন। আর সেই পথ হল অরাজকতার বিরুদ্ধে একটি ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

অদ্বৈতাচার্য (১৪৩৪খ্রিঃ), হরিদাস (১৪০৫খ্রিঃ), চৈতন্যদেব (১৪৮৬খ্রিঃ) ও নিত্যানন্দ (১৪৭৮খ্রিঃ) - এঁদের জন্মের আগে থেকেই বাংলাদেশের বৈষ্ণব আন্দোলন সীমিতভাবে প্রচলিত ছিল। মোটামুটিভাবে হিন্দু শাস্ত্রের পাঠ, আলোচনা এবং কীর্তন এই আন্দোলনের অংশ ছিল। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রায় অবলুপ্ত। অন্যদিকে রাজধর্ম ইসলাম দৃঢ়ভাবে প্রসারিত ও প্রচারিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে এই সময় মোগল ও পাঠান রাজশক্তি বাংলায় প্রবেশ করেনি।[১১] একদিকে দলে দলে হিন্দু ইসলামের ছত্রছায়ায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করছে, অন্যদিকে ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দু সমাজে শাসনের বেড়াজাল আরও শক্তপোক্ত হচ্ছে। ধর্মীয় উদারতাহীন হিন্দুসমাজে তাই ইচ্ছে থাকলেও কোন অহিন্দুর পক্ষে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিধিনিষেধ না মানলে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা, দেবদেবীদের নিয়ে অলৌকিক কাহিনী বিস্তার করা, যুক্তি-বুদ্ধি-সত্যতা দিয়ে কোনো কিছুকে বিচার করার ক্ষমতা মানুষের মধ্য থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। সমাজজীবনে এই

সঙ্কটাপূর্ণ অবস্থা দূর করার জন্য বেশ কিছু মানুষ গভীর চিন্তাশীল হয়ে পড়ে। মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কমলাক্ষ এই বিশৃঙ্খলাময় অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে একটি পথ পান।

“প্রভু কহে নন্দসুত ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ।
গৌররূপে নবদ্বীপে হৈত অবতীর্ণ।
হরিনাম প্রেম দিয়া জগত তারিবে।।
মো অধমের বাঞ্ছা তবে অবশ্য পূরিবে।।”[১২]

এরপর শুরু হল অদ্বৈতের চৈতন্য আবাহন। ভাগীরথীতে জল তুলসীর অঞ্জলি দিয়ে তিনি কৃষ্ণের অবতারের প্রার্থনা করলেন। সমগ্র নদিয়াবাসীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক পূর্ণিমার রাতে তিনি অবতীর্ণ হলেন –

“চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার।।
সেই সিংহ বসুক সবার হৃদয় কন্দরে।
কল্মষ দ্বিরদ নাশ যাঁহার হুঙ্কারে।।”[১৩]

বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য পেয়েছেন তাঁর আন্দোলনের যোগ্য নেতাকে। কিন্তু বিশম্ভর ভারী অহংকারী, গম্ভীর ও আত্মদর্পী। নবদ্বীপে বাস করে অদ্বৈত এই বিশম্ভরকেই গড়ে পিঠে শ্রীচৈতন্য-এ পরিবর্তন করলেন। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য হ্রাস করা থেকে, প্রকাশ্যে রাস্তায় নাম সংকীর্তন ও কাজী দলন সব কিছুতেই চৈতন্যকে রাখলেন পুরোভাগে। কিন্তু চৈতন্যর সন্ন্যাস গ্রহণ তাঁকে আশাহত করল। চৈতন্যের মাধ্যমে সমস্ত জগত বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার করা এবং সামাজিক তমসা কাটানোর কাজ তাঁর কিছুটা হলেও অপূর্ণ থেকে গেলো। চৈতন্যদেব উড়িষ্যায় চলে যাবার পর অদ্বৈত নিজের শিষ্যবর্গের মাধ্যমে আন্দোলন জারি রাখেন। তবে অদ্বৈতের জীবৎকালেই তাঁর তেতাল্লিশ জন ভক্ত শিষ্য দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন – অচুত্যানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, যদুনন্দন আচার্য, হৃদয়ানন্দ সেন, অনন্ত দাস, কানুপণ্ডিত, নারায়ণ দাস, পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী প্রমুখ।[১৪] কামদেব নাগর, আগল ও পাগল নামে তিন অদ্বৈত শিষ্য ভক্তিবাদে আস্থা না রাখতে পেরে অদ্বৈতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

“নিষ্ঠাভক্তি দ্বারা কর শ্রীকৃষ্ণ-সেবন।
অনায়াসে ভব-বন্ধন হইবে মোচন।।
...
কামদেব নাগর আর আগল পাগল।
এই তিনে নাহি মানে আচার্য্যের বোল।।”[১৫]

পরবর্তীকালে অদ্বৈতশাখার বৈষ্ণবরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সমর্থক হয়েছিলেন।[১৬] অদ্বৈতের বংশধরেরা এখনো শান্তিপুরে বর্তমান। শান্তিপুরে গোস্বামী উপাধিধারণকারী বৈষ্ণবরা অন্যদের মতো কৃষ্ণ ও চৈতন্যর মধ্যে বিভেদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁদের এই ধারণার সঙ্গে নবদ্বীপের বৈষ্ণবরা একমত ছিলেন না। উনিশ শতকের শেষে এই বিরোধের ফলে দুই দলের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত হয়।[১৭]

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্মের তাবড় তাবড় পুরুষ নেতা থাকা সত্ত্বেও বৈষ্ণব মাতা, শান্তিপুর নিবাসী সীতাদেবীর অবস্থান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র শান্তিপুর তথা নদিয়াবাসী অদ্বৈতাচার্যকে ‘সীতানাথ’ নামেই জানে। ঈশান নাগরও তাঁর গ্রন্থের বন্দনায় বারবার বলেছেন –

“জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।”[১৮]

পঞ্চদশ শতকে দাঁড়িয়েও তিনি নিজেই নিজের বিবাহের পাত্র নির্বাচন করেন। বাবা নৃসিংহ ভাদুড়ির সঙ্গে গঙ্গাযাত্রা করার সময় সীতাদেবী ও শ্রীদেবী (সীতাদেবীর বোন) অদ্বৈতের অপূর্ব রূপ দেখে তাঁকেই মনে মনে পতিরূপে বরণ করেন।

"আজানুলম্বিত বাহুর অগ্রে পদ্মাকর।
অঙ্গুলি বিরাজে চম্পক কলিকা আকার।।
সুকমলসম শ্রীচরণ সুকোমল।
দেখি মোর ফুল্ল হৈল হৃদয়কমল।।
এই মহাপুরুষে সঁপিনু দেহপ্রাণ।
ইহারে না পা যদি ছাড়িমু পরান।।"[১৯]

সীতাদেবীর সঙ্গে চৈতন্যর বড় মধুর সম্পর্ক ছিল। গৌরাঙ্গ সীতাকে 'মা' বলে ডাকতেন। সীতাদেবী মদনগোপাল এর ভোগের সঙ্গে অদ্বৈতদেবের ও গৌরাঙ্গের ভোগ দিতেন। গৌরাঙ্গের প্রিয়খাদ্য যেমন- শাক, পানা, ঘৃতপক্ক, পিঠা, ক্ষীর, সর, লাউয়ের পায়েস, পরমান্ন প্রভৃতি সীতাদেবী গৌরাঙ্গকে রান্না করে খাওয়াতেন। চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি লীলাচলেও যেতেন। বৈষ্ণবজগতে সীতাদেবী নারী গুরুদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। স্বামী, সন্তান ও সংসারের দায়িত্ব পালন করেও তিনি অক্লান্ত ভাবে ধর্ম প্রচার করেছেন। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি সহমৃতা হননি।

"সীতাদেবী বঙ্গীয় ভক্তি আন্দোলনের গোঁড়া থেকেই জড়িয়ে ছিলেন ... চৈতন্যঅদ্বৈত-নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর সীতাদেবী তাঁর অসাধারণ সাংগাঠনিক দক্ষতায় কেবল অদ্বৈতপন্থীদেরই নয় বৃহত্তর বৈষ্ণবসমাজেও স্থাপন করেছিলেন ঐক্যবন্ধনের দৃষ্টান্ত। সমকালীন পুরুষশাসিত সমাজ নেত্রী হিসেবে তাঁর সার্থক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিল তাঁর জীবনীগ্রন্থ - বাঙালী মহিলার প্রথম জীবনীগ্রন্থ দুটি হল বিষ্ণুদাস আচার্যের 'সিতাগুণকদম্ব' ও লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র'।"[২০]

চৈতন্যর ভক্তি আন্দোলনের পরিণামে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষের মুক্তির যে পরিসর তৈরি হয়েছিল সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন সীতাদেবী। শান্তিপুরের নিকটবর্তী হরিপুরের এক ব্রাহ্মণ কুমার সীতাদেবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী। যজ্ঞেশ্বর স্ত্রীবেশ ধারণ করেন এবং তাঁর নাম হয় জঙ্গলী। সীতাদেবীর অপর শিষ্য নন্দরাম সিংহও নন্দিনী নাম ধারণ করে স্ত্রীবেশ নিয়ে সীতাদেবীর কাছে দীক্ষা নেন। হরিদাস জানিয়েছেন –

"সীতাদেবী দুই দাসী জঙ্গলী নন্দিনী।
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা সীতা দিলেন আপনি।।"[২১]

নন্দিনী ও জঙ্গলী শুধু স্ত্রীবেশ ধারণ করেনি তারা রজঃস্বলাও হয়েছিলেন। সীতাদেবী সন্দেহ মোচনের জন্য দুইজনকেই পরীক্ষা করেছিলেন।

"তাথেরাধাবীজপেতেজিইয়ানহয়।
পুংসত্তস্বভাবছাড়িপ্রকৃতিউদয়।।
হয়নহেঠাকুরাণীইথেদেহমন।
ইহাবলিদুইশিষ্যজিলবসন।।
শুনিঠাকুরাণীশিষ্যপানেচাহিলাআপনি।
প্রকৃতিস্বভাবেদুহারভেলপ্রমাণি।
আনন্দিতসীতাদেবীশিষ্যরেআজ্ঞাদিল।
আজ্ঞাপাঞাদুইশিষ্যবসনএড়িল।।"[২২]

সীতাদেবী এই দুই শিষ্যকে নিয়ে জঙ্গলে সাধনা শুরু করেন। তৎকালীন গৌড়েশ্বর শিকারে গিয়ে জঙ্গলীর রূপে মোহিত হয়ে তাঁর ধর্মনাশ করতে গেলে দেখতে পান জঙ্গলী নারী নন পুরুষ। পরক্ষনেই একজন নারীদ্বারা পরীক্ষা করে দেখা যায় তিনি নারী। জঙ্গলী বলছেন -

"নারীজনে নারী দেখে পুরুষে পুরুষ।

কিন্তু কোন কালে আমি না হই পুরুষ।।"[২৩]

এই ঘটনার পর গৌড়েশ্বর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে জঙ্গলীকে 'জঙ্গলী টোটা' নামে একটি প্রাসাদ তৈরি করে দিয়েছিল। এখনো মালদহে 'জঙ্গলী টোটা' নামে একটি শ্রীপাট আছে। জঙ্গলীর দাসী নন্দরামও স্ত্রীবেশ ধারণ করে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এই নন্দরাম 'শ্রীকৃষ্ণমিশ্র চরিত্র' রচনা করেন।[২৪] সীতাদেবীর অপর শিষ্য নন্দিনী "শ্রীগোপীনাথ"-এর সেবা করতেন। শেষ বয়সে তিনি পুরীতে বসবাস করেন। পুরীতে এখনও নন্দিনী মঠ আছে।[২৫]

অদ্বৈতাচার্যের বড়পুত্র অচ্যুতানন্দ শৈশব থেকেই মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করতেন। পুরীতে তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছিলেন। তিনিই প্রভুকে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড দর্শন করিয়েছিলেন।

"শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কহে আচার্য্য নন্দনে।

এই রাধাকুণ্ড হয় দেখহ লক্ষণে।।

...

এই সত্য রাধাকুণ্ড নাহিক সংশয়।

ইহার সংশ্লিষ্ট খাদ শ্যামকুণ্ড হয়।।[২৬]

বৈষ্ণব জগতে অচ্যুতের এই মতই গ্রাহ্য। কৃষ্ণদাস লিখছেন -

"অচ্যুতের যেই মত সেই মতসারে।।"[২৭]

চৈতন্য মৃত্যুর পর অচ্যুতানন্দ খেতুরী মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি উড়িষ্যায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার্যে পরিণত হন।[২৮]

অদ্বৈতাচার্যের ছয়পুত্রের (অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরাম, রূপ ও জগদীশ) মধ্যে কৃষ্ণমিশ্র ও বলরাম বিবাহ করেছিলেন। অদ্বৈতদেব তীর্থে গিয়ে নেপালের গণ্ডকী নদী থেকে একটি শালগ্রাম শিলা আনেন। এইসময় তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণের স্বপ্নাদেশ পেয়ে কুব্জা সেবিত কৃষ্ণমূর্তি উদ্ধার করেন এবং সেখান থেকেই ললিতা আঁকা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি নিয়ে আসেন শান্তিপুরে।

"মোর এক দিব্য মূর্তি মহামণিময়।

মদনমোহন নাম কৃষ্ণ মধ্যে রয়।।

দ্বাদশ আদিত্য তীর্থে যমুনার তীরে।

অল্প মৃত্তিকাতেও আচ্ছাদিত কলেবরে।।

পূর্ব্বে এই মুর্ত্তি কুজা কৈলা সুসেবন।

দস্যু ভয়ে শেষে মুই হৈনু সংগোপন।।

...

মদনগোপাল স্বপ্নে আদেশিলা মোরে।

মথুরাতে আনি মোহে স্থাপহ সত্ত্বরে।।"[২৯]

অদ্বৈতদেব 'মদনমোহন' মূর্তি উদ্ধার করে শান্তিপুরে নিজের বাড়িতে সেবা প্রতিষ্ঠা করার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু 'মদনমোহন' মথুরাতে স্থাপিত হতে চায়। তখন 'মদনমোহন' বিরহে বিধস্ত প্রভু ঈশ্বরের

আদেশে যুগল চিত্রপট নিজের গৃহে প্রতিষ্ঠা করেন। আর চিত্রপটের অনুরূপ মূর্তি নির্মাণ করে। অদ্বৈতাচর্য কৃষ্ণমিশ্রকে 'মদন গোপাল' এর সেবার ভার অর্পণ করেন। বর্তমানে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য'র বংশধরদের আটটি পাটবাড়ি আছে। আর বাবলায় আছে সীতানাথের পাট বা অদ্বৈতপাট। অদ্বৈতের বংশধরদের আটটি পাটবাড়ি যথাক্রমে – (ক) অদ্বৈতর দ্বিতীয়পুত্র কৃষ্ণমিশ্রের পৌত্র যাদবেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল গোস্বামী বাড়ি।

(খ) অদ্বৈতর চতুর্থপুত্র বলরামের প্রথমপুত্র মধুসূদন প্রতিষ্ঠিত গোস্বামী ভট্টাচার্য বাড়ি। (গ) বলরামের ষষ্ঠপুত্র মথুরেশের তিনপুত্রের তিনটি পাটবাড়ি। বড়পুত্র রাঘবেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বড় গোস্বামী বাড়ি।

(ঘ) মথুরেশের মধ্যমপুত্র ঘনশ্যাম প্রতিষ্ঠিত মধ্যম বা হাটখোলা গোস্বামী বাড়ি।

(ঙ) মথুরেশের কনিষ্ঠপুত্র রামেশ্বর প্রতিষ্ঠিত চাকফেরা গোস্বামী বাড়ি।

(চ) বলরামের দশমপুত্র কুমুদানন্দ প্রতিষ্ঠিত পাগলা গোস্বামী বাড়ি।

(ছ) বলরামের ষষ্ঠপুত্র মথুরেশের পৌত্র (রামেশ্বরের পুত্র) সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত বাঁশবুনিয়া গোস্বামী বাড়ি।

(জ) বলরামের সপ্তম পুত্র দেবকীনন্দনের প্রতিষ্ঠিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাড়ি।

সীতানাথের পাট বা অদ্বৈতপাট :

অদ্বৈত, গৌরাঙ্গ, হরিদাস, সীতাদেবী প্রমুখর লীলাভূমি শান্তিপুরের সীতানাথ পাট বা অদ্বৈতপাট বৈষ্ণবদের কাছে পরম তীর্থক্ষেত্র। তবে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের মুল বাসভূমি বা 'উপকারিকা' অনেকদিন আগেই ভাগীরথী তীরে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে শান্তিপুর ষ্টেশন থেকে এক কিমি উত্তর পশ্চিমে বাবলা নামক স্থানে অদ্বৈতপাট অবস্থিত। অতীতে এই স্থানে একটি বালির স্তুপ ছিল। জনশ্রুতি আছে, ব্রাহ্মণ কুলজাত শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব সীতানাথ দাস তীর্থ পর্যটনকালে বালেশ্বরের কাছে নয়াবাজার গ্রামে অবস্থান করেন। এই সময় শান্তিপুরের উত্তর প্রান্তে অদ্বৈতপাটের সেবাপ্রকাশের স্বপ্নাদেশ পান।[৩০] অতঃপর তিনি শান্তিপুর এসে বড় গোস্বামীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে উক্ত পাটের সঠিক অনুসন্ধান চালান। স্বপ্নে দেখা স্থানটির কাছাকাছি এলে এক রাখাল বালক মাধবীলতা বেষ্টিত তমালতলায় বালির স্তুপ দেখিয়ে সেটিকেই অদ্বৈতাচার্যের ভজনস্থান হিসেবে নির্দেশ করে আকস্মিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। সীতানাথ বাবাজি মহারাজ এই স্থানে অদ্বৈতপাট প্রতিষ্ঠা করে নিত্য সেবা পূজা চালিয়ে যেতে থাকেন। বাবাজির ভজনগুণে এবং শান্তিপুরবাসীর ভক্তির টানে এখানে দেশ-বিদেশ থেকে ভক্ত এবং বৈষ্ণবদের সমাগম ঘটে। কিংবদন্তী আছে, শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অদ্বৈতপাটের সেবাইত থাকার সময় বাবলার কোনো একটি বিশেষ স্থানের খনন করে কমলাক্ষ নামাঙ্কিত এক কাঠের পাদুকা, কমণ্ডলু প্রভৃতি উদ্ধার করেন। কিন্তু বৈষ্ণবদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির সম্ভাবনায় তিনি ওগুলোকে অদ্বৈতপ্রভুর বিগ্রহের আসন বেদীর তলায় পুঁতে দেন।[৩১]

সীতানাথ বাবাজির পর অদ্বৈতপাটের সেবাপূজার দায়িত্ব নেন নারায়ণ দাস বাবাজি। এরপর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও তাঁর বংশধরেরা শ্রীপাটের দায়িত্ব নেন। বর্তমানে ব্রজকিশোর গোস্বামী ১৯৯৬ সাল থেকে শ্রীপাটের সেবাইতের দায়িত্ব পালন করছেন। সীতানাথ বাবাজি অদ্বৈতপ্রভুর দারুবিগ্রহসহ 'রাধাকৃষ্ণ-গোপাল' জীউ, 'বিষ্ণু-নারায়ণ' শালগ্রাম শিলাপ্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজা ভোগ চালু করেন। বর্তমানে মূল মন্দিরে কোন টেরাকোটার কাজ নেই তবুও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গর্ভমন্দিরে সিংহাসনে শোভা পাচ্ছেন 'অদ্বৈতপ্রভু'র দারুবিগ্রহ (উচ্চতা দু'ফুট), কষ্টিপাথরের 'কৃষ্ণ' (উচ্চতা এক ফুট এক ইঞ্চি), অষ্টধাতুর 'রাধিকা', 'শ্রীশ্রীগোপাল জীউ (কষ্টিপাথর), শালগ্রাম শিলা এবং গৌরাঙ্গের দারুবিগ্রহ। একমাত্র দোল উৎসবের সময় অদ্বৈতের বিগ্রহকে গর্ভমন্দিরের বাইরে আনা হয়।

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন নিয়মের মাধ্যমে বিগ্রহগুলির নিত্য সেবা পূজা করা হয়। সকালে বিগ্রহগণের গাত্রোত্থান ও বাল্যভোগ নিবেদন, বেলা দশটায় স্নান, বস্ত্র, চন্দন দিয়ে শৃঙ্গার এবং নিত্যপূজা হয়। দুপুরে অন্নভোগ, ভোগারতি শয়ন; বিকেল চারটেয় নিদ্রাভঙ্গ বৈকালিক ভোগ, সন্ধ্যায় আরতি, নামগান, গ্রন্থপাঠ, ভোগ নিবেদন এবং রাত ন'টার মধ্যে শয়ন। প্রতি মঙ্গলবার নাম সংকীর্তন হয় মহাধুমধামে। বৈকালিক ভোগে শীতকালে ফল, মিষ্টি, গরম দুধ; গ্রীষ্মকালে ফল, মিষ্টি, ভিজে ছোলা, ডাব বা সরবত থাকে। নিয়মিত পূজাভোগ ছাড়া এখানে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মধ্যে মাঘীসপ্তমীতে অদ্বৈতপ্রভুর জন্মতিথি, দোলউৎসব ইত্যাদি পালন করা হয়। দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে নানা স্থান থেকে ভক্তগণ আসেন, প্রভুর পায়ে আবির দিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেন। যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে মাধবেন্দ্রপুরীর স্মরণোৎসব পালিত হয়। প্রতিটি উৎসবেই ভক্তগনের নামগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শ্রীপাট। উৎসব উপলক্ষ্যে অখণ্ড নামগান, মালসা ভোগ, প্রসাদ বিতরণ, বৈষ্ণব গ্রন্থপাঠ এবং কীর্তনগান প্রভৃতি হয়। এই শ্রীপাটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নির্জন নীরবতা। চারিদিকে বাগান ঘেরা নির্মল শান্ত অদ্বৈত পাটটি ভক্তদের মনঃসংযোগের অন্যতম স্থান।

বড় গোস্বামীর বাড়ি :

অদ্বৈতাচার্যের পৌত্র মথুরেশ গোস্বামী (বলরামের পুত্র) রাজা প্রতাপাদিত্যের 'কৃষ্ণ' বিগ্রহের পূজারী ছিলেন। এই বিগ্রহটি অতীতে উড়িষ্যাধিপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরীতে 'দোলগোবিন্দ' নামে প্রতিষ্ঠা করেন। মানসিংহের যশোর আক্রমণকালে মথুরেশ গোস্বামী যশোররাজের অনুরোধে 'দোলগোবিন্দ'কে শান্তিপুরে এনে রাধারমণ নামে প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর আগে মথুরেশ গোস্বামী নিজের পূজিত তিনটি বিগ্রহ তাঁর তিনটি পুত্রকে দিয়ে যান। বড় ছেলে রাঘবেন্দ্রকে 'রাধারমণ', মেজোছেলে ঘনশ্যামকে 'রাধাবিনোদ' এবং ছোটো ছেলে রামেশ্বরকে 'রাধাবল্লভ' বিগ্রহের সেবাপূজার ভার দেন।[৩২]

আনুমানিক সাড়ে তিনশো বছর আগে মথুরেশ বড় গোস্বামী বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্বৈতদেব নেপালের গণ্ডকী নদী থেকে একটি নারায়ণ শিলা আনেন, সেই নারায়ণ শিলা বড় গোস্বামীর বাড়িতে এখন প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈতপ্রভুর আনা বিশাখার চিত্রিত যুগল চিত্রপট নষ্ট হওয়ার পর বড়-মধ্যম-ছোট গোস্বামী বাড়ি তার আদলে কাঠের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। রাধারমণ ও 'শ্রীমতি' ছাড়া বড় গোস্বামী বাড়িতে মদনমোহন জীউ 'গোপালরায়-রাধিকা', 'রাধাবল্লভ-রাধিকা' প্রতিষ্ঠিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা পণ্ডিত রাঘবেন্দ্রের পৌত্র ব্রজকিশোর গোস্বামীর সময় 'রাধারমণ' চুরি হয়ে যান। বড় গোস্বামী বাড়ির মেয়েরা কাত্যায়নী ব্রত করে বিগ্রহ ফিরে পান। তারপর থেকে 'রাধারমণ'-এর পাশে অষ্টধাতুর 'শ্রীরাধিকা' মূর্তি স্থাপন করা হয়। এছাড়াও এখানে 'গৌরাঙ্গের ষড়ভুজ' মূর্তি আছে।

বড় গোস্বামী বাড়ি সম্পর্কে রত্না ভট্টাচার্য ও শক্তিপদ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন -

> "বড় গোস্বামী শাখা শুরু হয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পৌত্র মথুরেশের পুত্র রাঘবেন্দ্র ও তাঁর বংশধর থেকে। এই বাড়ির ঠাকুর দালান দুটি। একটি পূর্বমুখী, মাঝখানে নাটমন্দির। এই মন্দিরের মূল দেবতা রাধারমণ বিগ্রহ, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মথুরেশ। মূর্তিটি কষ্টিপাথরের। ... রয়েছেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সেবিত মদনগোপাল মূর্তির প্রতিরূপ মদন মোহন বিগ্রহ। এই বংশের বিভিন্ন বংশধর অদ্বৈত আচার্য, সীতাদেবী প্রতিষ্ঠা করেন রঘুনাথ, ষড়ভুজ মহাপ্রভু, শ্রীগোপাল, সুভদ্রা, বলরাম, জগন্নাথ প্রভৃতি বিগ্রহ। এগুলি সবই দারুমুর্তি। এছাড়াও রয়েছে কাত্যায়নী দেবী ও শিবের মন্দির।"[৩৩]

বড় গোস্বামী বাড়িতে বিগ্রহের নিত্য সেবায় নানা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। প্রতিদিন সকালে (গরমকালে ৬.৩০ ও শীতকালে ৭.০০টায়) বিগ্রহের গাত্রোত্থান করানো হয়। তারপর বিগ্রহের প্রাতঃক্রিয়া করানো, স্নান,

বস্ত্র পরিধান, শৃঙ্গার নিত্য পূজা প্রভৃতি হয়। এরপর দুপুর ১২ টার মধ্যে অন্নভোগ, ভোগারতি এবং ১ টার সময় শয়ন। বিকাল সাড়ে চারটেয় নিদ্রাভঙ্গ করিয়ে জল মিষ্টি দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি, ভোগ ও রাত ৯টায় শয়ন। দুপুরের ভোগে অন্ন, শাক, শুক্তো, বেগুনি, ছানার ডালনা, মোচা, চাটনি, পরমান্ন প্রভৃতি থাকে। সন্ধ্যার ভোগে থাকে লুচি, সুজি, দুধ, ছানা, মিষ্টি প্রভৃতি। আবার বৈশাখ মাসে রাত্রে পান্তাভোগ; জ্যৈষ্ঠমাসে চিড়ে দই আম কাঁঠাল প্রভৃতি দিয়ে মাখাচোখা নামে একটি ভোগ হয় এবং মাঘ মাসে সকালে বাল্যভোগ খিচুরী, আলুমাখা, ঘি, পাঁচরকমের ভাজা, দই ইত্যাদি নিবেদন করা হয়।

বিগ্রহের নিত্যসেবার সঙ্গে সঙ্গে বড় গোস্বামী বাড়িতে বৈশাখ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসব হয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুলদোল ও অচ্যুতানন্দের জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হয়। জৈষ্ঠ্যমাসে জামাই ষষ্ঠী (রাধারমণের পাশে রাধিকার মূর্তি স্থাপন করার পর থেকে এই উৎসব শুরু হয়); আষাঢ় মাসে রথ, শ্রাবণ মাসে ঝুলন, ভাদ্রমাসে বিশেষভাবে জন্মাষ্টমী পালন করা হয়। জন্মাষ্টমীর রাতে চাঁদ উঠলে কৃষ্ণের নাড়ী কাটা হয়। আর পরের দিন ছোটো বাচ্চাদের প্রচুর ফলসামগ্রী উপহার দিয়ে নন্দোৎসব পালন করা হয়। আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা (কাত্যায়নী ব্রতের কারণে শ্বেতঅশ্বাকৃতি সিংহে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ দুর্গামূর্তি); কার্তিকে কালিপূজা (শ্রী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের শুরু করা কালিপূজা); অগ্রহায়ণে রাস, মাঘমাসে সরস্বতী পূজা ও মাঘী সপ্তমীতে অদ্বৈত জন্মতিথি পালন এবং ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব পালিত হয়। দেবোত্তর সম্পত্তি ও বংশধরদের দ্বারা এই সেবা পূজা ও উৎসবের ব্যয়ভার বাহিত হয়।

হাটখোলা বা মধ্যম গোস্বামী বাড়ি :

মথুরেশ গোস্বামীর মধ্যম পুত্র ঘনশ্যাম গোস্বামী এবং তাঁর বংশধরদের নিয়ে হাটখোলা বা মধ্যম গোস্বামীর বাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বাড়ির আদি বিগ্রহ 'শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ'। শান্তিপুর স্টেশন থেকে দুই কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে মধ্যম গোস্বামী বাড়ি অবস্থিত। আনুমানিক ২৬৭ বছর আগে এই গোস্বামী বাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়। জনশ্রুতি আছে, তৎকালীন সময়ে এই অঞ্চলে হাট বসতো তাই এই শ্রীপাটের নাম হাটখোলা। এই বাড়িতে কষ্টিপাথরের 'রাধাবিনোদ', অষ্টধাতুর রাধিকা, দারুময় 'শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদ' জীউ, দারুময় অদ্বৈত এবং রামচন্দ্রের মূর্তি আছে। শান্তিপুরের পাটবাড়িগুলির মধ্যে অন্যতম বিশেষত্ব হল, রথে এখানে জগন্নাথের সঙ্গে নবদূর্বাদল শ্যামবর্ণের রামচন্দ্রের মূর্তি পূজিত হয়। গবেষকরা জানিয়েছেন -

> "এই বংশের রঘুনন্দন গুপ্তিপাড়া থেকে গোকুলচাঁদ বিগ্রহ এনে প্রতিষ্ঠা করেন। গোকুলজিউ-এর মতো এমন নয়নাভিরাম মুর্তি শান্তিপুর কমই আছে। এখানে অদ্বৈতাচার্যের মন্দিরও রয়েছে। অদ্বৈতপ্রভু ও গোকুল চাঁদের মন্দিরদুটি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের দিক থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠাকালের লিপি পাওয়া না গেলেও গঠন দেখে মনে হয় মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। বাংলা আটচালা রীতিতে নির্মিত। ... এই মন্দিরে রয়েছে পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য যেমন শিকার দৃশ্য, দশাবতার, দশভুজা মহিষমর্দিনী ইত্যাদি।
>
> গোকুলচাঁদের মন্দিরটি বর্ধমান জেলার জামগ্রামের নন্দীদের সাহায্যে তৈরি হয়েছিল। এই মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির মুর্তি বা অলংকারাদি নেই তবে পঙ্খের কিছু কাজ দেখা যায়।"[৩৪]

এই বাড়ির বাৎসরিক উৎসবের মধ্যে বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুলদোল; আষাঢ় মাসে রথ ও আষাঢ় নবমীতে গোকুলচাঁদের প্রতিষ্ঠা দিবস; শ্রাবণ মাসে ঝুলন, ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী; আশ্বিনে বড় গোস্বামীর বাড়ির অনুকরণে দুর্গাপূজা; কার্তিক মাসে রাস (কখনও অগ্রহায়ণ মাসেও হয়), মাঘ মাসে মাঘী সপ্তমী; ফাল্গুনে দোল ও চৈত্র মাসে 'গোকুলচাঁদ'-এর বিশেষ পূজা হয়। বিগ্রহের নিত্য সেবা হয় বিভিন্ন নিয়মের সাহায্যে। সকালে বিগ্রহের গাত্রোত্থান, স্নান, শৃঙ্গার সকাল সাড়ে ৮ টায় ফল মিষ্টি সহযোগে বাল্যভোগ হয়। দুপুর ১ টার মধ্যে অন্নভোগ ভোগারতি, শয়ন। অন্নভোগে অন্ন, পঞ্চব্যঞ্জন,পরমান্ন, মিষ্টি থাকে এবং বৈশাখ মাসে

বিকালে শিতলী ভোগ হয়। বিগ্রহের নিত্যসেবা ও বাৎসরিক ব্যয়ভার চলে দেবোত্তর সম্পত্তি ও বংশধারদের সাহায্যে।

চাকফেরা বা ছোটো গোস্বামীবাড়ি :

মথুরেশ গোস্বামীর কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর 'রাধাবল্লভ'জীউর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ছোটো গোস্বামী বাড়ি প্রতিষ্ঠিত করেন। শান্তিপুর ষ্টেশন থেকে সাতশোমিটার দক্ষিণে চাকফেরা গোস্বামী শ্রীপাট অবস্থিত। রামেশ্বর মহাতেজস্বী শূদ্র প্রতিগ্রাহী মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি চক্ররাসের প্রবর্তন করেন। রাসের সময় 'রাধাবল্লভ' জীউর চারপাশে যুগ্ম গোপ-গোপীদের হাত ধরাধরি করিয়ে চক্রাকারে একটি কাঠের চক্রে ঘোরানোর ব্যবস্থা করেন। "রাসের সময় এই বিগ্রহকে এক মধ্যস্থলে রেখে এক গোলাকার কাঠের চাকার প্রান্তে স্থাপিত জোড়ায় জোড়ায় গোপ-গোপিনী মূর্তি পরস্পরের হাত ধরে ঘুরতে থাকেন বলে তাদের নাম হয় চাকফেরা।"[৩৫] কষ্টিপাথরের 'রাধাবল্লভ' জীউ এবং অষ্টধাতুর 'রাধিকা' এই শ্রীপাটে পূজিত হন।

চাকঘেরা গোস্বামী বাড়ির বিগ্রহকে ঘিরে সারাবছর রাস, দোল, ঝুলন, মাঘী সপ্তমী, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব পালিত হয়। সকালে পূজা, নৈবেদ্য, অন্নভোগ, সন্ধ্যায় আরতি দুধ ও মিষ্টি ভোগ প্রভৃতির নিবেদনে বিগ্রহের সেবা হয়। অন্নভোগে আতপ চালের অন্ন, পঞ্চব্যঞ্জন, পরমান্ন প্রভৃতি থাকে। সামান্য কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি ও বংশধরদের আর্থিক ব্যয়ে বিগ্রহের সেবা পূজা চলে।

মদনগোপাল গোস্বামী বাড়ি :

অদ্বৈতাচার্যের পৌত্র রঘুনাথ (কৃষ্ণমিশ্রের পুত্র) গোস্বামীর যাদবেন্দ্র শান্তিপুরে মদনগোপাল গোস্বামী বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিপুর ষ্টেশন থেকে এক কি.মি. দক্ষিণে মদনগোপাল গোস্বামী বাড়ি অবস্থিত। অদ্বৈতদেব ও সীতা দেবী সেবিত মদনগোপাল বিগ্রহের সেবার ভার অদ্বৈতদেব কৃষ্ণমিশ্রকে অর্পণ করেন।

"এই কহি শ্রীমদন-গোপাল বিগ্রহ।
কৃষ্ণমিশ্রে সমর্পিল করিয়া আগ্রহ।।
কৃষ্ণসেৰা পাঞা কৃষ্ণমিশ্র প্রেমানন্দে।
দন্ডবত কৈলা প্রভুর চরণারবিন্দে।।"[৩৬]

এই 'মদনগোপাল' বিগ্রহের নামে এই বাড়ির নাম মদনগোপাল গোস্বামী বাড়ি। এই বাড়ির প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের মধ্যে দারুময় মদনগোপাল বিগ্রহ ছাড়াও অষ্টধাতুর রাধিকা, নারায়ণ শিলা ('রাজ-রাজেশ্বর') নামে প্রতিষ্ঠিত।

মদনগোপাল বাড়িতে সকালে মঙ্গলারতি, ৮টায় পূজা, দুপুর ১২টায় অন্নভোগ, ১টায় শয়ন, বিকাল ৪টায় নিদ্রাভঙ্গ, জল মিষ্টি প্রদান, ভাগবত কথা আলোচনা, সন্ধ্যারতি, সন্ধায় ভোগ, রাতে শয়ন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বিগ্রহ সেবা হয়। এই বাড়িতে বিগ্রহকে ঘিরে সারাবছর দোল, ঝুলন, রাস, মাঘীসপ্তমী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব পালিত হয়। বংশধরদের আনুকূল্যে ও ভক্তদের দানে বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার চলে।

আতাবুনিয়া গোস্বামী বাড়ি :

অদ্বৈতাচার্যের পৌত্র দেবকীনন্দন গোস্বামী (বলরামের পুত্র) শান্তিপুরে আতাবুনিয়া গোস্বামী বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিপুর ষ্টেশন থেকে দুই কি.মি. দক্ষিণ পূর্বে এই গোস্বামী বাড়ি অবস্থিত। "জনশ্রুতি, আতা বন কেটে এই বসতি গড়ে উঠেছিল বলে এই বাড়ির আরেক নাম আতাবুনিয়া গোস্বামী বাড়ি। এই বাড়ির দশম পুরুষ ছিলেন সাধক মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। সেই কারণ বর্তমানে অনেকে এই বাড়িকে বিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামীর বাড়িও বলে থাকেন।"[৩৭] কথিত আছে, দেবকীনন্দনের বংশধর আনন্দকিশোর গোস্বামী পুত্র খুবই শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বিগ্রহের ভোগ রান্নার কাঠও গঙ্গার জলে ধুতেন। তাই এই বাড়িকে খড়ি ধোয়া গোঁসাই বাড়িও বলা হত। দেবকীনন্দন এখানে কষ্টিপাথরের 'শ্যামসুন্দর' জীউ এবং অষ্টধাতুর রাধিকা প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বংশের দশম বংশধরদের মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনটা বৈচিত্র্যপূর্ণ। ১২৫১ বঙ্গাব্দে করিমপুর থানার শিকারপুরে তাঁর জন্ম হয়। যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় তিনি বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকের দায়িত্ব পান। তিনি গয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে গিয়ে এক সিদ্ধ যোগীপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়ে তাকেই গুরুপদে গ্রহণ করেন। এরপর তিনি হিন্দু ধর্মে ফিরে এসে গেরুয়া বসন, মালা, জটাজুট ধারণ করে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হন। হয়তো এইসময় তিনি অদ্বৈতপাটের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর অলৌকিক যোগপ্রভাব ছিল। তাঁর শিষ্যগণ এখনও বর্তমান। শেষবয়সে বিজয়কৃষ্ণ পুরীধামে বাস করেন। সেখানে তিনি 'জটিয়া বাবা' নামে পরিচিত। পুরীতে নরেন্দ্র সরোবরের তীরে তাঁর সমাধি ও মঠ এখনো আছে।[৩৮] এই শ্রীপাটে সকাল, দুপুর ও রাত্রি তিনবারই বিগ্রহের নিত্য ভোগ সেবা হয়। বাৎসরিক উৎসবের মধ্যে দোল, ঝুলন, রাস, জন্মাষ্টমী পালিত হয়। দেবোত্তর কিছু সম্পত্তি ও ভক্তদের দানে বিগ্রহসেবার আর্থিক সংস্থান হয়।

বাঁশবুনিয়া গোস্বামী বাড়ি :

অদ্বৈতাচার্যের প্রপৌত্র রামেশ্বরের পুত্র সন্তোষ গোস্বামী বাঁশবুনিয়া গোস্বামী শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন। সাড়ে তিনশো বছর আগে সন্তোষ গোস্বামী এই বাঁশবন কেটে এই বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। তাই এরূপ নামকরণ।[৩৯] শান্তিপুর ষ্টেশন থেকে সাতশো মিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বাঁশবুনিয়া বাড়ির পূজিত বিগ্রহ 'শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর' জীউ ও অষ্টধাতুর রাধিকা। একই নিয়মে বিগ্রহের সেবা পূজা দেওয়া হয়। এই বিগ্রহকে ঘিরে রাস, দোল, ঝুলন প্রভৃতি উৎসব পালিত হয়। ট্রাস্টবোর্ড ও ভক্তদের সহায়তায় বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার পরিচালিত হয়।

পাগলা গোস্বামী বাড়ি :

অদ্বৈতপ্রভুর পৌত্র কুমুদানন্দ গোস্বামী শান্তিপুরে একটি গোস্বামী বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। "পরম বৈষ্ণব কুমুদানন্দ ছিলেন নিরাসক্ত নিবিষ্ট সাধক। বিষয় সম্পত্তির জগত থেকে বহুদূরে থাকতেন তিনি। শোনা যায় একবার নদিয়ারাজের পক্ষ থেকে তাকে কিছু সম্পত্তি দান করতে চাইলে, তিনি তা অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করেন। রাজার দান ফিরিয়ে দেবার পর থেকেই তিনি পাগলা গোঁসাই নামে খ্যাত হন। কেউ কেউ তাকে আউলিয়া গোঁসাইও বলত।"[৪০] এই শ্রীপাটের সেবিত বিগ্রহ অষ্টধাতুর 'শ্রীশ্রী কৃষ্ণরায় ও রাধিকা' এবং 'কেশবরায় ও রাধিকা।'

পাগলা গোস্বামী বাড়িটি শান্তিপুর ষ্টেশন থেকে দেড় কি.মি. পূর্বে অবস্থিত। এই বাড়ির নিত্য দেবসেবায় নানা বৈচিত্র্য আছে। রাস, জন্মাষ্টমী, ঝুলন, দোল মাঘী সপ্তমী বিভিন্ন উৎসব পালিত হয়। সকালে পূজা আরতি নৈবেদ্য, দুপুরে অন্ন, পঞ্চব্যঞ্জন, পরমান্ন মিষ্টি প্রভৃতি থাকে। শয়নের পর বিকালে নিদ্রাভঙ্গ, সন্ধ্যায় আরতি ও দুধ-মিষ্টি প্রদানে রাতের ভোগ হয়। দেবোত্তর সম্পত্তি, ট্রাস্টবোর্ডের টাকা এবং বংশধরদের আর্থিক আনুকূল্যে বিগ্রহের সেবা পূজা চলে।

গোস্বামী ভট্টাচার্য বাড়ি :

অদ্বৈতাচর্যের পৌত্র মধুসূদন শান্তিপুরে একটি পাটবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। নাটোরের রাজা বিশ্বনাথ রায়ের স্ত্রী কৃষ্ণমণির গুরুপণ্ডিত ছিলেন রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি। রাধামোহন মধুসূদনের বংশধর ছিলেন। এছাড়া রাধামোহন বংশপরম্পরায় রাজবাড়ির কুলপুরোহিত ছিলেন। তাই এই বাড়ির নাম হয় গোস্বামী ভট্টাচার্য বাড়ি। এই বাড়ির সেবিত বিগ্রহ 'বিজয়কৃষ্ণচন্দ্র' কষ্টিপাথরের এবং রাধিকা অষ্টধাতুর। সকাল দুপুর রাত্রি বিগ্রহের নিত্য সেবাভোগ হয়। রাস, দোল প্রভৃতি উৎসব পালন করা হয় এই বিগ্রহকে ঘিরে। বংশধরদের অর্থে ব্যয়ভার বাহিত হয়।

শান্তিপুরের বিভিন্ন পাটবাড়িগুলি তাঁর নিজেস্ব কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব সাধনার প্রাচীন রীতিনীতিগুলিকে ধরে রেখেছে। প্রতিটি বাড়ি একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্য বহন করে চলেছে দীর্ঘকাল ধরে।

শ্রীপাট নবদ্বীপ :

ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গমে কলকাতা থেকে ৬৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত প্রাচীন বঙ্গদেশের রাজধানী নবদ্বীপ নগর। এই নগরের নাম থেকেই নদিয়া জেলার নাম হয়েছে। আর 'জ্ঞান নদিয়ার রক্ত মাংস অস্থি ও মজ্জা এবং ধর্মই নদিয়ার প্রাণ।'[৪১] কালের গতিতে প্রাচীন বিদ্যাচর্চার মুখ্যকেন্দ্রস্থল নবদ্বীপ শহরের বর্তমান অবস্থান ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে। নবদ্বীপ শহরটি ২৩$^{\circ}$২৪' উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮$^{\circ}$২৩' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। হাওড়া থেকে রেলপথে নবদ্বীপের দূরত্ব ১০৫ কি.মি.

নবদ্বীপ শহরটির আভিধানিক অর্থ নতুন দ্বীপ বা নবগঠিত ভূ-ভাগ। এই অর্থের প্রমাণ পাওয়া যায় বৈদেশিক পর্যটকের বিবরণে - 'The town of Nadia or NABADWIP (meaning 'new island") from which the district takes its name, has a very ancient history.'[৪২]

নবদ্বীপ শব্দের প্রাকৃত তদ্ভব রূপ হল নদিয়া। ১২৬০ সালে রচিত কাজি মিনহাজ-ই-সিরাজের তাবকাত-ই-নাসির-তে ফার্সি ভাষায় নবদ্বীপকে 'নওদিয়াহ' বা 'নোদিয়াহ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৩] ত্রয়োদশ শতক থেকেই এখনো পর্যন্ত স্থানটি নবদ্বীপ বা নদিয়া নগরী নামেই পরিচিত। নবদ্বীপের স্থান নাম দিয়ে নানা মতবাদ ও ভেদ দেখা যায়।[৪৪] যারা মনে করেন নবদ্বীপের অর্থ নতুন দ্বীপ তাদের মতে, আগে এই স্থানটি গঙ্গা মধ্যবর্তী চরভূমি ছিল এবং এর চারদিকে বেষ্টন করে গঙ্গা ও জলঙ্গী নদী প্রবাহিত ছিল। কালে নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় এই চরভূমি ক্রমশ বিস্তৃত হয় এবং মানুষের বাসোপযোগী হয়ে ওঠে। ক্রমশ জনসমাগমের ফলে এটি একদিন বঙ্গের রাজধানীতে পরিণত হয়। দ্বীপের উপর নতুন গ্রাম স্থাপিত হয় বলে একে নব-দ্বীপ বলা হয়।

আবার পরম বৈষ্ণব নরহরি চক্রবর্তী তাঁর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নবদ্বীপকে নয়টি দ্বীপের সমষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। গঙ্গার পূর্বপারে চারটি ও পশ্চিমপারে পাঁচটি মোট নয়টি দ্বীপ এগুলির মধ্যে গঙ্গার পূর্বপারে –

(১) অন্তদ্বীপ (মায়াপুর ও ভারুইডাঙার অন্তর্গত)

(২) সীমন্তদ্বীপ (সরডাঙা ও সিমলা এর অন্তর্গত)

(৩) গোপদ্বীপ (গাদিগাছা ও সুবর্ণবিহার এর অন্তর্গত)

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা ও ভালুকার অন্তর্গত)

গঙ্গার পশ্চিমপারে

(১) কোলদ্বীপ (কুলিয়া, তেঘড়িয়া দক্ষিণ অংশ ও সমুদ্রগড় এর অন্তর্গত)

(২) ঋতুদ্বীপ (রাতপুর, রাহুতপুর ও বিদ্যানগর এর অন্তর্গত)

(৩) মোদম দ্বীপ (মাউগাছি, মামগাছি ও মহতপুর এর অন্তর্গত)

(৪) রুদ্রদ্বীপ (রাদুপুর বা রুদ্রভাঙা, সংকাপুর ও পূর্বস্থলী এর অন্তর্গত)

নবদ্বীপের সংলগ্নবর্তী এলাকায় এই অঞ্চলগুলি অবস্থিত।

জনৈক কিছু ব্যক্তিবর্গের মতে নয়টি দীয়া বা দীপ থেকে নবদ্বীপ নামের উৎপত্তি। যখন গঙ্গা মধ্যস্থিত সুবিস্তীর্ণ চরে প্রথম মনুষ্য সমাগম হতে শুরু করে, তখন এক সন্ন্যাসী প্রত্যেক রাতে সেখানে নয়টি দীপ জ্বেলে তান্ত্রিক সাধনা করতেন। লোকে দূর থেকে ঐ দীপগুলিকে দেখে চরটিকে নদিয়ার চর বলে অভিহিত করত। ক্রমে চরে গ্রাম বসলে এটি নদিয়া নামে খ্যাত হয়।

নবদ্বীপ এখন নদিয়া জেলার অন্তর্গত সুপ্রতিষ্ঠিত একটি শহর। শুধু তাই নয় নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি (মতান্তর আছে, তৎসংলগ্ন মায়াপুরও হতে পারে। এছাড়াও বাসুদেব সার্বভৌম, কানভট্ট শিরোমণি, রঘুনাথ শিরোমণি, আনন্দরাম তর্কালঙ্কার, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, তন্ত্রবিদ কৃষ্ণনন্দ আগমবাগীশ প্রমুখদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল নবদ্বীপের বিদ্যোৎসমাজ।[৪৫]

শ্রী (রামানুজ), সনক (নিম্বাদিত্য), রুদ্র (বিষ্ণুস্বামী) মাধ্বী (মাধবাচার্য) এই চারটি আদি সম্প্রদায়ই ভারতবর্ষের অন্যতম বৈষ্ণব সম্প্রদায়। একাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভারতবর্ষের প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায়। মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, কেশবভারতী, অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ মাধ্বী সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবরাই বঙ্গদেশে প্রথম ভক্তিধর্ম প্রবাহের আবাহন করেন। কথিত আছে, চৈতন্যদেব মাধ্বী-সম্প্রদায়ভুক্ত।...কিন্তু চৈতন্যদেবের মতামত ঠিক মাধ্বী সম্প্রদায়ের অনুকুল নহে, তাঁহার ধর্ম কতকটা তাঁহারই নিজের। এজন্য তিনি বারবার তাঁহার শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের নিয়মভঙ্গ করিয়া স্বরূপ দামোদরের নিকট তাড়া খাইতেন। অনেকের মতে চৈতন্যদেবের ধর্মমতের সঙ্গে মাধ্বী মতের ঐক্য নাই।”[৪৬] এখন দেখার বিষয় চৈতন্যের পূর্বপুরুষরা ধর্ম ও কর্মের ক্ষেত্রে কোন জায়গার মানুষ ছিলেন। চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ মধুকর মিশ্র উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের অত্যাচারে যাজপুর থেকে শ্রীহট্ট পালিয়ে আসেন। বাৎস্যায়ন গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ মিশ্রের পুত্র ছিলেন মধুকর মিশ্র। মধুকরের জেষ্ঠ্য পুত্র উপেন্দ্রর পুত্র ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র।[৪৭] পড়াশোনা শেষ করার জন্য জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে আসেন এবং এখানে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। তিনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর মেয়ে শচীদেবীকে বিবাহ করেন। জগন্নাথ মিশ্র সুপণ্ডিত ছিলেন কিন্তু সঠিক কর্মসংস্থানের অভাবে সংসারে যথেষ্ট অর্থাভাব ছিল। আট কন্যা (এঁরা মৃত) ও একপুত্রের পর (বিশ্বরূপ) ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে গৌরাঙ্গের চরম দৌরাত্মে অতিষ্ঠ হয়ে জগন্নাথ তাকে পুনরায় টোলে পাঠায়। পড়াশোনা শেষের আগেই যৌবনের প্রারম্ভেই বল্লাভাচর্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে গৌরাঙ্গর বিয়ে হয়। এই বিয়ে ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রণয়ঘটিত। প্রথম দর্শনেই দুজনের প্রতি দুজনের আকর্ষণ জন্মেছিল। গৌরাঙ্গ তখন টোলের ছাত্র। সেইসময় –

> “দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গাস্নানে।
> গৌরচন্দ্র হেনই সময় সেই খানে।।
> নিজ লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিল গৌরচন্দ্র।
> লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু পাদদ্বন্দ্ব।।”[৪৮]

কিন্তু এই বিয়েতে শচীদেবীর আপত্তি ছিল। জগন্নাথ মিশ্রের পরিবার নৈষ্ঠিক বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবার। অন্যদিকে বল্লাভাচর্য ব্রাহ্মণ হলেও রুদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব পরিবার। তিনি বারাণসী। নিবাসী দরিদ্র বৈষ্ণব ছিলেন। ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ করাতে শচীদেবীর মত ছিল না। দুই পরিবারের আচার নিয়ম, রীতি নীতির মধ্যে অমিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। আর লক্ষ্মী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচেতাও ছিলেন। অপরদিকে গৌরাঙ্গের পড়াশোনা শেষ হয়নি বলেও শচীদেবীর আপত্তি ছিল। যাই-

হোক বিয়ে হল। কিন্তু বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্মীদেবী মারা গেলেন। গৌরাঙ্গের অনুপস্থিতিতে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি। চৈতন্য জীবনীকারের মতে -

"প্রভুর বিরহ সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।

বিরহ সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল।।"[৪৯]

কিন্তু এই 'বিরহ সর্প' আর সর্পাঘাত এক নয়। একজন স্বাধীনচেতা নারী স্বামীর জন্য কিছুদিনের বিরহে মারা যাবেন এটা বোধহয় ভাবার বিষয়।

তার্কিক অহংকারী, গম্ভীর ব্রাহ্মণ গৌরাঙ্গের জীবনে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু যেন একটা মোর। ফিরিয়ে দিয়েছিল। গৌরাঙ্গের ভক্তি-আন্দোলনে সামিল হওয়ার পিছনে লক্ষ্মী দেবীর একটা ভূমিকা ছিল। বৈষ্ণব ঘরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবার পর, গোরা ব্রাহ্মণ গৌরাঙ্গের বরফ হয়তো কিছুটা গলেছিল। গয়ায় পিণ্ডদান করতে গিয়ে ঈশ্বরপুরীর কাছে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ, প্রকাশ্যে নাম সংকীর্তন এই সব কিছুর আগে একটা প্রস্তুতি পর্ব ছিল। অদ্বৈতাচার্য ভবিষ্যতের এই নেতাকে প্রস্তুত করছিলেন পরোক্ষভাবে। এবার হয়তো সেই চেষ্টা সফল হল।

নিমাইয়ের ভাবান্তর ঘটার কিছুদিনের মধ্যেই শচীদেবী নবদ্বীপের রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইয়ের বিয়ে দিলেন। এরপর নিমাই শ্রীবাসের ঘরে নামসংকীর্তন, কাজীদলন, সন্ন্যাসগ্রহণ প্রভৃতি ঘটনা ঘটে। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন না। তাঁর ভোজনাধিক্য, চারিত্রিক শৈথিল্যের কলঙ্ক রচনা প্রভৃতি তাকে সন্ন্যাসীর জীবন থেকে বিচ্যুত করে। বাসুদেব সার্বভৌমও তাঁর সন্ন্যাস গ্রহনে খুশি হননি। কারণ সন্ন্যাসী নিজেকে মহাজ্ঞানী নারায়ণ ভাবেন যা বৈষ্ণবের দীনতার বিপরীত। তখন চৈতন্য বললেন -

"প্রভু বলে শুন সার্বভৌম মহাশয়।

সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়।।"[৫০]

তবে সন্ন্যাস জীবনে চৈতন্যের ওপর যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করা হয়, তিনি তাঁর ঘোর বিরোধী ছিলেন। সকলের মতে তিনি কৃষ্ণ অবতার ছিলেন। কিন্তু চৈতন্য নিজে এর কিছুটা বিরোধিতাই করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন লিখছেন -

"... যে ব্যক্তিকে লইয়া এই দেববূহ্য পরিকল্পিত হইয়াছিল তিনি দীনের দীন ছিলেন, কেহ তাঁহার পা ছুইতে গেলে তিনি বিরক্ত হইতেন। পুরীতে পাছে কেহ তাঁহার পাদোদক পান করে এই ভয়ে তিনি একটি বৃক্ষতলে অতি সঙ্গোপনে স্নানের একটা জায়গা করিয়া লইয়াছিলেন। একবার 'কৃষ্ণজয়' স্থানে 'চৈতন্যজয়' বলিয়া কোন বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহারই নামকীর্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন; তিনি অত্যন্ত বিরক্ত সহকারে তাহা থামাইয়া দিয়াছিলেন।"[৫১]

এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন -

"অহে অহে শ্রীবাস পণ্ডিত উদার।

আজি তুমি সব কি করিলা অবতার।।

ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্তন।

কি গাইলা আমারে তা বুঝাহ এখন।।"[৫২]

চৈতন্যদেব আপাদমস্তক এমন একজন মানুষ ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতা হন। তাঁর উৎসাহ, উদ্দীপনা ও নেতৃত্বের গুণে ভক্তিআন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষ দলে দলে তাঁর সংকীর্তনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি কোনো তত্ত্ব নয় ভাবধর্ম প্রচার করেছিলেন। অধ্যাপক নিরঞ্জন ধরের মতে - "চৈতন্য স্বয়ং কোনো তত্ত্বও প্রচার করেননি।

তাঁর মূল বক্তব্য ছিল-‘আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও’ এবং কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তনই ভববন্ধন থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়।”[৫৩] চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর নবদ্বীপে ভক্তিআন্দোলনে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের। মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়। চৈতন্যদেব এই পরিস্থিতি বুঝতে পেরে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে আন্দোলনের ভার দেন। তিনি বলেছেন –

“সুন সতী বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণব জননী
নবদ্বীপ রক্ষা কর চিন্তা মণি গণি।
কলিকার সর্পে দংশিব সর্ব্বজীবে
সংকীর্ত্তন বিনে আর রক্ষা নাহি হবে।
তুমি না থাকিলে হব সংকীর্ত্তন বাদ।
নবদ্বীপ নিয়া হব বড় পরমাদ।
মহান্ত বৈষ্ণব উদাসীন হব দ্বন্দ্ব
তুমি সভার মাতা পুত্রের সম্মন্ধ।”[৫৪]

চৈতন্যের নবদ্বীপ ত্যাগ করার পর নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এক বলিষ্ঠ শিষ্যবর্গ গড়ে ওঠে। ক্রমেই তার পরিসর বাড়তে থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৌরাঙ্গের মূর্তি নির্মাণ করে তার সেবা পূজা শুরু করেন। বর্তমানে সেই বিগ্রহ বিভিন্ন জনের হাত ঘুরে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতৃকুলের বংশধরদের দ্বারা পূজিত হচ্ছে। বর্তমানে নবদ্বীপে অনেকগুলি বৈষ্ণব পাটবাড়ি আছে। যথা – চৈতন্যের জন্মস্থান, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মস্থান, ধামেশ্বর প্রভুর পাট, শ্রীবাস অঙ্গন, সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির, রাধারমণবাগ সমাজবাড়ি, জগাই মাধাই উদ্ধার মন্দির, হরিবোল কুঠীর ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীধামেশ্বর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির :

জনশ্রুতি আছে চৈতন্যের সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগের পর প্রভুর পরিত্যক্ত খড়ম দুটি সামনে রেখে চিরবিরহী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুর রূপ দর্শনে কাতর প্রার্থনা করেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ডাকে সাড়া দিয়ে গৌরাঙ্গ তাকে দর্শন দেন। গৌরাঙ্গের একান্তভক্ত বংশীবদন স্বপ্নাদেশ পেলেন গৌরাঙ্গের সেই রূপের অনুরূপ একটি মূর্তি নির্মাণ করার। বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছায় গৌরাঙ্গের বাড়ির একটি নিমগাছ দিয়ে মূর্তিটি তৈরি করা হয়। বংশীবদন দাঁইহাট নিবাসী এক শিল্পী নবীনানন্দ আচার্যকে দিয়ে গৌরাঙ্গের মূর্তি তৈরি করিয়ে মহাপ্রভুর জন্মভিটায় প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেই বিগ্রহের সেবা করতেন। তাঁর তিরোধানের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতুস্পুত্রেরা বংশানুক্রমে এই বিগ্রহের। সেবা করতে থাকেন। তখন নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ গৌরাঙ্গ পূজা নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছেন। তখন লুকিয়ে লুকিয়ে গৌরাঙ্গ পূজা চলত, তারপর বিভিন্ন রাজরোষ টানাপড়েন অতিক্রম করে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রকাশ্যে ধামেশ্বরের পূজা হতে থাকে।[৫৫] বর্তমানে মন্দিরটি সেবাইত গোস্বামীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

গৌরাঙ্গের এই মূর্তিটি পরবর্তীকালে ‘ধামেশ্বর’ নামে পূজিত হতে থাকে। চারফুট উচ্চতার এই মূর্তিটি হরিদ্রাভ বর্ণের এবং হাতগুলি সামনের দিকে প্রসারিত। মূর্তিটি রুপোর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া এখানে মহাপ্রভুর পৈতৃক শালগ্রাম শিলা, মহাপ্রভুর পাদুকা যুগল আছে। এই বিগ্রহের নিত্য সেবা হয়। প্রভাতে মঙ্গলারতি, কীর্তন সহ মন্দির পরিক্রমা, বাল্যভোগ; বেলা ৯ টায় স্নান বস্ত্রশৃঙ্গার, পূজা, বেলা ১২ টায় অন্নভোগ, ভোগারতি, নামগান, শয়ন; সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি, নামগান রাত ৯ টায় অন্নভোগ শয়ন। রাত্রে শয়নের পর প্রত্যেকদিন একঘণ্টা করে নামগান ও পালাকীর্তন হয়। প্রত্যহ পঞ্চব্যঞ্জন সহ প্রিয় খাদ্য কাঁচাকলা, মোচা, থোড়, লাউ, হালাঞ্চ শাক, পুষ্পন্ন, পরমান্ন ইত্যাদি থাকে। বৃন্দাবনদাস জানিয়েছেন –

"তাঁর থোড় কলা মুলা হয় শ্রীব্যঞ্জন।।
শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে।
তাহা খায় প্রভু দুগ্ধ মরিচের ঝালে।"[৫৬]

তবে প্রভুর ভোগে আমিষ জাতীয় খাবার, ফুলকপি, টমেটো, পুঁইশাক, সজনেশাক বা ডাঁটা, মুসুরডাল, গাজর, বীট ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

সারাবছর এখানে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর জন্মোৎসব দোল, ঝুলন, রাস, জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, পৌষপূর্ণিমায় সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজির জন্মতিথি পালন করা হয়। এছাড়া এখানে জামাইষষ্ঠী খুব ধুমধাম করে পালন করা হয়। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন -

"প্রতিদিন তিনি ধামেশ্বর মহাপ্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কেবল একটি দিন তাই তিনি ভক্তের আরাধ্য নন, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথ নদিয়াবিহারীর সেইদিন জামাই আদর।

জীবন্ত এক জনপদ মিলিয়ে দিয়েছে দুই ভিন্ন ধারার ঐতিহ্যকে। একদিকে রয়েছে, ষোড়শ শতকের বাঙালী নবজাগরণ। অন্যদিকে ইংরেজ আমলে শুরু হওয়া বাবু সংস্কৃতি। নবদ্বীপ এই দুই ধারাই বহন করে চলেছে। তাই সেই নবজাগরণের প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেবকে জামাই বলে পুজো করা হয় খাস নবদ্বীপে।"[৫৭]

সকালে ষাটের বাতাস, জামাইবরণ, বিশেষ পূজা, ষোড়শোপাচারভোগ, সুগন্ধিপান সব কিছুই থাকে। বছরে এই দিনটায় ধামেশ্বর প্রভুর বরণে ঢাক বেজে ওঠে। এইদিন সকালে জামাই বরণের পর মিষ্টি, দই, নানা রকমের ফল, দুপুরে অন্নভোগে শাক, শুক্তো, পাঁচরকম ভাজা, মোচাঘন্ট, ডাল, পটলের ব্যঞ্জন, বেলায় মিষ্টি এবং রাতে লুচি রাবড়ি ইত্যাদি থাকে। সেবাইতরা ছাড়াও এলাকার মানুষরাও এইদিন প্রভুকে জামাই হিসেবে বরণ ও পুজা করে। মহাপ্রভুর জন্মোৎসবে এখানে হাজার হাজার ভক্ত ও পর্যটকদের সমাগম ঘটে। সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারেন। চৈতন্য দাস বাবাজী ছিলেন গৌর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার নাগরীভাবের শিষ্য। তিনি মন্দির সংলগ্ন স্থানে থাকতেন। তৎকালীন সময়ে তিনি বিগ্রহের সেবাপুজার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনিই তীব্র বিরোধিতা করে মন্দিরে মাথুর ও নিমাই সন্ন্যাস পালা পরিবেশন বন্ধ করেন। মন্দিরের সেবাইত গোস্বামী কঠোরভাবে বৈষ্ণবধর্ম পালন করেন, তাঁরা কখনও আমিষ খান না। এই সেবাইতদের প্রত্যেকের একটি শিষ্য গোষ্ঠী আছে। মূলত এই সব শিষ্যভক্তদের দান ও দেবোত্তর সম্পত্তিতে মন্দিরের ব্যয়ভার চলে।

শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ মন্দির :

খড়দহের নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর প্রভুপাদ প্রতাপচন্দ্র গোস্বামী প্রায় একশো শতাব্দী আগে নবদ্বীপে সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকেই প্রতাপচন্দ্র নবদ্বীপে বসবাস শুরু করেন। তাঁর বংশশাখাই নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গন পরিচালনার দায়িত্ব নেন। এঁরাই বর্তমানে মন্দিরের সেবাইত। এখানকার সেবিত বিগ্রহ হল অষ্টধাতুর আড়াইফুট উচ্চতার গৌরাঙ্গ বিগ্রহ, যুগল রাধাকৃষ্ণ শালগ্রাম শিলা, চৈতন্য পদচিহ্ন। এছাড়া গৌরাঙ্গের জীবনের নানা ঘটনা মাটির মূর্তির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে।

গৌরাঙ্গ মন্দিরে সকাল দুপুর রাত্রি তিনবার বিগ্রহের সেবাপূজা করা হয়। প্রভাতে মঙ্গলারতি, বাল্যভোগ, মধ্যাহ্নে অন্নভোগ, সন্ধ্যারতি, রাতে অন্নভোগ ইত্যাদির মাধ্যমে বিগ্রহের সেবা করা হয়। রথ ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, রাস, দোল ইত্যাদি উৎসবে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। মন্দিরের সেবাইতদের প্রচুর শিষ্য আছে, সেবাইতরা প্রত্যেকেই দীক্ষা দেন। শিষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু বিদেশী শিষ্যও আছে। শিষ্যবর্গের প্রণামী ছাড়াও কিছু দেবোত্তর সম্পত্তির ফসল ও সেই সম্পত্তি থেকে যে টাকা পাওয়া যায় তা দিয়ে মন্দিরের

ব্যয়ভার চলে। এছাড়া বিগ্রহ দর্শনের জন্য প্রণামী দেওয়া বাধ্যতামূলক। শিষ্যদের দানেই সেবাইতদের পরিবারের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

শ্রীরাধারমণ বাগ সমাজবাড়ি :

নবদ্বীপে সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরের অদূরেই রাধারমণ বাগ সমাজবাড়ি অবস্থিত। ১৩১০ বঙ্গাব্দে রাধারমণ চরণদাস বাবাজী 'শ্রীশ্রীরাধারমণ' মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এখানে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য শ্রীলরামদাস, বাবাজী শ্রীপাটের দায়িত্ব নেন। রামদাস বাবাজী বরাহনগর পাটবাড়ির সদস্য। রাধারমণের শিষ্য ললিতা সখী দাসী ও বিনোদিনী দাসীর সাহায্যে এই শ্রীপাটটি বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হয়। ললিতা সখী এই শ্রীপাটে প্রচুর সম্পত্তি দান করেন। ললিতা ও বিনোদিনী সখী প্রকৃত অর্থে পুরুষ ছিলেন। সাধনার কারণে তাঁরা নারীর নাম ও বেশভূষা গ্রহণ করেন।[৫৮]

এই শ্রীপাটে 'শ্রীরাধারমণ ও রাধিকা', 'গৌর-নিতাই' 'কৃষ্ণ-বলরাম' বিগ্রহ আছে। রামদাস বাবাজী এখানে 'গৌর-নিতাই'এর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরে রাধারমণ চরণদাসের সমাধির। উপর একটি বড় পিতলের মূর্তি আছে উপবিষ্টের ভঙ্গিতে। আর এখানে শালগ্রাম শিলা নাটমঞ্চের দক্ষিণে ললিতা সখীর সমাধি, রামদাস বাবাজির দন্ত সমাধি, গৌর হরিদাস বাবাজীর ও গোবর্ধন দাস বাবাজীর পুষ্প সমাধি আছে। প্রত্যেকদিন নিয়ম করে তিনবেলা বিগ্রহের ও সমাধির পূজা। আরতি ভোগ, শয়ন ইত্যাদি হয়। বিগ্রহের অন্নভোগে অন্ন, পঞ্চব্যঞ্জন, ডাল, ব্যঞ্জন থাকে। প্রাহরিক পূজা, নামগান ছাড়াও পালা কীর্তন, ধর্মগ্রন্থপাঠ ইত্যাদি হয়। এই শ্রীপাটের বিশেষ আকর্ষণ হল এখানে অষ্টকালীন সেবা দ্বারা বিগ্রহ সেবিত হয়। অর্থাৎ প্রভাতি কীর্তন দিয়ে মন্দিরের দ্বার খোলে এবং অভিসার কীর্তন দিয়ে দ্বার বন্ধ হয়। রাস, দোল, ঝুলন, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি অনুষ্ঠান ছাড়াও ফাল্গুনের শুক্লা তিথিতে রাধারমণ চরণ দাসের তিরোধান উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবে নামকীর্তন, মালসাভোগ, নগর পরিক্রমা, অন্নকূট উৎসব, পালাকীর্তন ইত্যাদি হয়। প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি, গোশালা, ভক্তদের দান ও ভিক্ষার অর্থে মন্দিরের বিগ্রহ সেবার ব্যয়ভার ও মন্দির সংস্কার হয়। বর্তমানে মন্দিরটি বরাহনগর পাটবাড়ির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই শ্রীপাটে অনেক বাবাজী এবং তাঁদের শিষ্যরা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। নারীরা এখানে স্থায়ীভাবে থাকেন না।

শ্রীবাস অঙ্গন মন্দির :

সমাজবাড়ির কাছেই মহাপ্রভুর সংকীর্তনের লীলাস্থল শ্রীবাস অঙ্গন অবস্থিত। মূল মন্দিরে মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলার মূর্তি, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, বসুধা, জাহ্নবা সহ বহু বিগ্রহের সেবা পূজা হয়। প্রণামী দিয়ে বিগ্রহ দর্শন করতে হয়। নিয়মানুসারে বিগ্রহের সেবাপূজা হয়। আগেই বলেছি, নিত্যানন্দের নবদ্বীপবাসী বংশধররা এই শ্রীপাটের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই শ্রীবাস অঙ্গন অতীতে তোতারাম দাসের শিষ্য লছমন দাস পুরাণগঞ্জে স্থাপন করেন। গঙ্গাগর্ভে তা বিলীন হয়ে যাওয়ার পর লছমনদাসের শিষ্যদের হাত থেকে নিত্যানন্দ বংশীয়রা শ্রীবাস অঙ্গনের ভার নিয়ে নেয়।[৫৯]

জগাই মাধাই উদ্ধার মন্দির :

মদ্যপ জগাই-মাধাইকে হরিনামের মাধ্যমে বৈষ্ণব সাধকে পরিণত করেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনের কাছেই জগাই-মাধাই উদ্ধার মন্দির অবস্থিত। এখানে গৌর-নিতাই মূর্তি, জগাই-মাধাই উদ্ধার মূর্তি, চাপাল-গোপাল উদ্ধার মূর্তি ছাড়াও কয়েকটি শালগ্রাম শিলা আছে। পুজাপাঠ, মঙ্গলারতি, ভোগ ইত্যাদির মাধ্যমে বিগ্রহের সেবা হয়। এই শ্রীপাটে। সেবাইতদের দান ও প্রণামীর অর্থে মন্দিরের ব্যয়ভার চলে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান :

গৌরাঙ্গের সঠিক জন্মস্থান নিয়ে বৈষ্ণব মহলে বিতর্কের শেষ নেই। কারো মতে নবদ্বীপে, কেউ বলেন মায়াপুরে, কেউ বা বলেন গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছেন। প্রাচীন নবদ্বীপের কোন স্থানে মহাপ্রভুর জন্মস্থান তা বলা কঠিন। প্রকৃত জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ গবেষণা বলছে ভাগীরথী ও জলঙ্গির সঙ্গম স্থলে উৎপত্তি হয়েছিল নবদ্বীপের। ভৌগলিক কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে বহুবার। তাই প্রাচীন স্থানের পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। তবে বর্তমানের নবদ্বীপের মায়াপুর নামের স্থানকে কিছু লোক মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলে মনে করেন। এখানে শ্রীরামদাস বাবাজি মহারাজের শিষ্যদের দ্বারা মহাপ্রভুর জন্মস্থান মন্দির স্থাপিত ও পরিচালিত হয়।

শ্রীপাটের সেবিত বিগ্রহ 'শ্রীরাধা-কৃষ্ণ', 'জগন্নাথ মিশ্র-শচীমাতা', 'বিশ্বরূপ ও গৌরাঙ্গ' প্রভু। মূল মন্দিরের সামনে একটি নিমগাছের তলায় গৌরাঙ্গের আতুরঘর। আঁতুর ঘরে শচীমাতার কোলে নিমাই অধিষ্ঠান করছেন। এখানে সকালে মঙ্গলারতি, বাল্যভোগ, শয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে বিগ্রহের সেবাপূজা হয়। সেবাইতদের দান, শ্রীপাটের গোশালা থেকে অর্জিত অর্থ এবং এই শ্রীপাটের গ্রন্থমন্দিরের বিক্রিত বই-এর অর্থে শ্রীপাটের ব্যয়ভার চলে।

চারিদিকে বৈষ্ণব তীর্থময় নবদ্বীপ শহরটি বৈষ্ণবদের কাছে বাংলার বৃন্দাবন নামে খ্যাত। প্রাচীন ভারতের অন্যতম বিদ্যাক্ষেত্র ও বৈষ্ণবদের পরমধাম নবদ্বীপ বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

শ্রীপাট কুলিয়া :

বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান অদ্বৈত আচার্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাভূমি নদিয়া জেলার একটি উল্লেখযোগ্য শ্রীপাট হল 'অপরাধভঞ্জন পাট' বা কুলিয়া পাট। শিয়ালদহ থেকে কাঁচড়াপাড়া গামী ট্রেনে গিয়ে কাঁচড়াপাড়া স্টেশনে নেমে, সেখান থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্বে কুলিয়া পাট অবস্থিত। এটি দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীপাট। বহু বছর আগে এক জনৈক উদাসীন ভক্ত কুলিয়াতে 'শ্রীশ্রীনিতাইগৌর' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তার পরে খড়দহের জনৈক গোস্বামী ঐ সেবা পূজার ভার পান। কিন্তু স্থানীয় জমিদার মাধবচাঁদ বাবু খড়দহের গোস্বামী প্রভুকে সেবাচ্যুত করে বলাগড়ের অচ্যুতানন্দ গোস্বামীকে সেবা প্রদান করেন। এরপর কলকাতার মঙ্গল লেন নিবাসী কিষাণ দয়াল ধর মহাশয় মন্দির নির্মাণ করেন।[৬০] তবে বর্তমানে মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। আর মন্দিরের সামনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোচারণক্ষেত্র, মৎস গবেষণা কেন্দ্র ও পিঁজরাপোল আছে। তবে আমাদের জানার বিষয় কেন কুলিয়া একটি অন্যতম বৈষ্ণব শ্রীপাট? কি ঘটেছিল চৈতন্যসমকালে, যার জন্য কুলিয়াকে 'অপরাধভঞ্জন পাট' বলা হয়?

গম্ভীর, দাম্ভিক পুরুষ গৌরাঙ্গ মায়ের আদেশে গয়ায় পিতৃ পিণ্ড দান করতে যান। সেখানে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে নবদ্বীপে ফেরেন। তখন নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতাপ। সাধারণ ও নিম্নবর্ণের মানুষের দৃঢ় ধর্মীয় ভাষা ও ধর্মীয় আচরণ বিলুপ্ত হতে শুরু করেছে। এমত অবস্থায় কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সেই দাম্ভিক মানুষটি নাম-সংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে বাঁচার আশা দেখায়, একত্রিত করতে শুরু করেন। তবে বলায় বাহুল্য, অদ্বৈত আচার্য পরোক্ষভাবে এই দাম্ভিককে ভবিষ্যতের যুগনেতা করার প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন যা বিশ্বম্ভরের মধ্যে প্রেম ও উদারতার ধারা প্রবাহনে সাহায্য

করে। যদি ও নবদ্বীপের তাবড় ব্রাহ্মণ সমাজ ও তৎকালীন রাজা অর্থাৎ প্রশাসন এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই প্রকাশ্য স্থানে নামসংকীর্তন করার অনুমতি ছিল না তার। প্রত্যেক দিনের মতো সেদিনও শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে রাত্রিবেলা দরজা-জানালা বন্ধ করে নাম-সংকীর্তন চলছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় –

"দ্বার দিঞা কীর্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসি আইসে না পায় প্রবেশে।।
কীর্তন শুনি পাষণ্ডী জ্বলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসের দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে।।
একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্মুখ বাচাল।।
ভবানী পূজার সব সামগ্রী আনিল।
আসি শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইল।।
কদলীর পত্র পরে থুইল ওড্র ফুল।
হরিদ্রা সিন্দুর রক্ত চন্দন তণ্ডুল।।
মদ্য ভাণ্ড পাসে ধরি নিজ ঘরে গেল।
প্রতঃকালে শ্রীবাস তাহা ত দেখিল।।"[৬১]

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা গৌরাঙ্গ ও শ্রীবাসের সৎ প্রয়াসকে প্রতিরোধ করার জন্য এই কাণ্ড ঘটায়। আর এর উপযুক্ত শাস্তি হিসাবে এই ঘটনার তিন দিনের মধ্যে গোপালের কুষ্ঠ হয়। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে তার ভুল বুঝতে পারে। তখন গোপাল গৌরাঙ্গের দ্বারস্থ হলে তিনি ভীষণ রাগে গোপালকে ভৎসনা করে কোটি জন্ম রৌরব নরক পাবার অভিশাপ দেন।

এরপর গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিয়ে নবদ্বীপ ত্যাগ করে নিলাচলে চলে যান এবং শ্রীচৈতন্য নামে পরিচিত হন। চৈতন্যদেব পুরী থেকে বৃন্দাবন যাত্রাকালে গৌড়ে এসে বাসুদেব সার্বভৌমের ভাই বিদ্যাবাচস্পতির বাড়িতে আশ্রয় নেন।[৬২] কিন্তু সেখানে অত্যন্ত লোকের ভিড় হওয়ায় কুলিয়া বাসী। মাধৰ দাসের বাড়িতে মহাপ্রভু সাতদিনের জন্য অবস্থান করেন।[৬৩] বৃন্দাবন দাস লিখেছেন -

"কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
তথা সর্ব লোক হইল পরম কাতর।।
...
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পর কুতূহলে।।
...
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জন।
কত হাট বাজার বসায় কত জন।।
চতুর্দিকে যার যেই ইচ্ছা সেই কেনে।
হেন নাহি জানি ইহা কোরে কোন জনে।।
ক্ষণেকের মধ্যে গ্রাম নগর প্রান্তর।
পরি পূর্ণ হৈল স্থল নাহি অবসর।।"[৬৪]

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় সেই সময় চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে একটি বিপণনের পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। আর এই সময় গোপাল নিজের পাপ মুক্তির সন্ধান করতে করতে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রত্যাখ্যত

হয়ে কুলিয়াতে অবস্থান করে। তখন চৈতন্যদেবের নির্দেশে সে শ্রীবাসের শরণাপর্ণ হলে শ্রীবাসের প্রসাদে তার পাপ বিমোচন ঘটে। দেব দুর্লভ ভগবৎ প্রেম লাভ করে গোপাল পরবর্তীকালে শ্রীদেবকীনন্দন দাস নামে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হন। তিনি 'শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা' ও সংস্কৃত ভাষায় 'বৈষ্ণবাভিধান' নামে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন।[৬৫]

চৈতন্য সমকালীন ভাগবত অধ্যপক কুলিয়া গ্রামবাসী দেবানন্দ পণ্ডিত থাকতেন নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পতিত জমিতে।[৬৬] সুশান্ত, জ্ঞানবান, উদাসীন দেবানন্দ ভক্তি নয় মোক্ষের পিপাসু ছিলেন। ভাগবত অধ্যাপনা করলেও ভক্তিরসের আস্বাদ অনুধাবন করতে শেখেননি। সেইসময় গৌরাঙ্গ শ্রীচৈতন্য হয়ে ওঠেনি। একদিন শ্রীবাস দেবানন্দের ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। তখন পড়ুয়াদের নিয়ে ভাগবত ব্যাখ্যা করছেন দেবানন্দ। শ্রীবাস ভাগবত পাঠ শুনে বিহ্বল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকলেন। এহেন অস্বাভাবিক আচারণ দেখে দেবানন্দের ছাত্ররা তাকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। কিন্তু দেবানন্দ এর কোনো প্রতিবাদ করেননি। এরপর বিশ্বম্ভর দেবানন্দকে তিরস্কার করে বলেন-

"ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণঃরসে।
টানিয়া পেলিতে সে তাহারে যোগ্য আইসে।।
বুঝিলাম তুমি সে পঢ়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত।।
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়।।
প্রেমময় ভাগবত পঢ়াইয়া তুমি।
ততখানি সুখ না পাইলা কহি আমি।।"[৬৭]

তবুও অবিশ্বসী দেবানন্দ প্রভুর কথায় আস্থা রাখতে পারলেন না। কিন্তু বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। প্রেমাবেশের অর্থ বুঝতে পেরে নৃত্যরত বক্রেশ্বরের অঙ্গরজ নিজের দেহে মাখলেন। আর এই ভক্তধূলি তাঁকে ভক্তিতে বিশ্বাস করাল, শ্রীচৈতন্যে আস্থা জাগাল। কৃষ্ণদাস লিখেছেন-

"ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর কৃপাতে।
ভাগবতে ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হৈতে।"[৬৮]

সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু যখন কুলিয়ায় আসেন তখন প্রভুর অনুগ্রহে দেবানন্দের অপরাধভঞ্জন হয়। বৃন্দাবন দাসের ভাষায়-

"শুন দ্বিজ ভাগবতে এই বাখানিবা।
ভক্ত বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা।"[৬৯]

এই কারণে কুলিয়া পাটের নাম হয় 'অপরাধভঞ্জন পাট'। ভক্তদের বিশ্বাস, এখানে এসে শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে অপরাধ ভঞ্জনের প্রার্থনা করলে তার সমস্ত অপরাধ ভঞ্জন হয়ে যায়।

কুলিয়া পাটের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরনিতাই দারুর তৈরি। পূজারি ব্রাহ্মণের দ্বারা বিগ্রহের নিত্য সেবা হয়। সকালে বিগ্রহের জাগরণ, স্নান, পূজা ও বাল্যভোগ হয়। দুপুরে বিগ্রহের পূজা, অন্নভোগ বা কোনো কোনো দিন চিড়া ভোগও হয় এবং তারপর শয়ন। বিকেলে গাত্রোত্থান, সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি, মিষ্টিভোগ তারপর শয়ন হয়। বাল্য ভোগে (সকালে ভোগকে বাল্যভোগ বলা হয়) খিচুড়ি, ফল, মিষ্টি, ইত্যাদি থকে। দুপরে অন্নভোগ থাকে অন্ন, সজি, ডাল, ছানার বিভিন্ন পদ, চাটনি, পরমান্ন, মিষ্টি ইত্যাদি। আর শিতলি ভোগ (বিকেলে ও রাতে যে ভোগ বলে। আবার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরকে যে ভোগ দেওয়া হয় তাকে শিতলি ভোগ বলে) মিষ্টি, ছানা থাকে এবং রাতে রুটি বা লুচি, সজ্জি, ছানা, দুধ, মিষ্টি প্রভৃতি দেওয়া হয়। ভোগে

টমেটো, বিট, গাজর, কচু ইত্যাদি সব্জি ও ডালের মধ্যে কলাই, মসুর ভোগ ব্যবহার করা হয় না। কারণ ডাল জাতীয় কোন খাদ্যদ্রব্য ঈশ্বরের ভোগে নিবেদন করা নিষিদ্ধ। এছাড়া বিভিন্ন উৎসবে বিগ্রহের বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা থাকে। এই শ্রীপাটের বার্ষিক উৎসব বলতে জন্মাষ্টমী, দোল ও অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে চৈতন্যদেবের আগমণ তিথির করণে তিন দিন ব্যাপী বিরাট মেলা হয়। এই মেলাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু ভক্ত সমাগম ঘটে। প্রখ্যত সাহিত্যিক নবীনচন্দ্র সেন 'নদিয়ার স্মৃতি' তে কুলিয়ার মেলার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন-

> "মেলা স্থানটি ক্ষুদ্র বৃক্ষচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন কানন। তাহার এক প্রান্তে চৈতন্যদেবের খ্যাতনামা ভক্ত 'গোপাল চাপাল'-এর সমাধি! তাহারই পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে গৌর-নিতাইয়ের দুইটি সুন্দর কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি স্থাপিত। তাহারই নিকটে শুষ্ক যমুনার গর্ভে একটি ক্ষুদ্র বাঁওড়। ... অপরাহ্নে দেখিলাম, মেলাক্ষেত্রে শতশত চাদর ও সামিয়ানা টাঙাইয়া যাত্রিগণ হরিনাম করিতেছে। ... মরি! মরি! মেলার এখন কি অপূর্ব শ্রী হইয়াছে। সমস্ত আম্রকাননটি শতশত দীপালোকে প্রদীপ্ত, ঘন ঘন হরিনাম ধ্বনিতে মুখরিত হইতেছে। ত্রিশ চল্লিশ সহস্র লোক সকলেরই মুখে হরিনাম![৭০]

নবীনচন্দ্রের বিবরণের পর আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে কুলিয়া পাট বৈষ্ণবদের কাছে একটি মহা তীর্থক্ষেত্র। তবে দুঃখের বিষয়, আজ আমরা অনেকেই শান্তিপুর, নবদ্বীপ, মায়াপুর, কাটোয়া ইত্যাদি তীর্থস্থানের মত কুলিয়া পাটের নাম অবগত নই। ষোড়শ শতকে মানব সাম্যের লক্ষ্যে সংঘটিত বাংলাদেশের প্রথম গণতান্ত্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা ছিলেন শ্রীচৈতন্য। তিনিই ভক্তিবাদী বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা বাংলার সামাজিক ও আত্মিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন তার সাক্ষী হয়ে আছে শ্রীপাট কুলিয়া। হাতে খোল, করতাল, মাদল ও মুখে 'হরিবোল' কে সম্বল করে কোনো মানুষ যে ধর্মীয় সমাজমানসের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে তার অন্যতম প্রমাণ কুলিয়া পাট।

শ্রীপাট যশড়া :

চৈতন্যসমকালে ও চৈতন্যোত্তরকালে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার প্রচার ও প্রসারে বৈষ্ণব পাটবাড়িগুলি সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিল। এই পাটবাড়িগুলি বৈষ্ণবদের কাছে ধর্ম সাধনার তীর্থক্ষেত্র। সেইরকম একটি বৈষ্ণব শ্রীপাট নদিয়ার চাকদহের যশড়া। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর শ্রীপাট। কলকাতা থেকে ৩৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত অর্থাৎ শিয়ালদহ থেকে চাকদহ গামী ট্রেনে করে চাকদহ স্টেশনে নেমে সেখান থেকে টোটো বা রিক্সায় ২/৩ কিলোমিটার পশ্চিমে যশড়া শ্রীপাট। চাকদহ নদিয়ার অনেক পুরোনো শহর। চাকদহের প্রাচীন নাম চক্রদ্বীপ বা চক্ৰদহ। চাকদহের নামকরণ নিয়ে অনেক কিংবদন্তী আছে। অনেকের মতে, মর্তে গঙ্গা আনয়নের সময় ভগীরথের প্রভাবে এখানে একটি খাত পূর্ণ হয় এবং এই স্থানের নাম হয় চক্রদহ বা চাকদহ। আগে এই খাতের জলকে মানুষ ভীষণ পবিত্র জ্ঞান করত। প্রাচীনকালে গঙ্গাসাগরের মতো এই স্থানে লোকে শিশু সন্তান বিসর্জন দিত। অনেকে মুক্তি বা পূর্ণের আশায় চাকদহের জলে ডুবে প্রাণ ত্যাগ করত। কথিত আছে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজ মানসিংহ যখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে বাংলায় আসেন তখন তার সৈন্যরা ঝড়বৃষ্টির কারণে এখানে কয়েকদিনের জন্য আটকে পড়েছিল।[৭১]

অপর একটি জনশ্রুতি আছে, শ্রীকৃষ্ণ নন্দন প্রদ্যুম্ন এখানকার স্থানীয় কোনো অসুর বংশের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তাঁর(প্রদ্যুম্ন) রথের চাকা মাটিতে পুঁতে যায়। তার ফলে এখানে একটি দহের সৃষ্টি হয় এবং সেই দহ থেকেই 'চক্রদহ' বা চাকদহ নাম হয়েছে। এখানে প্রদ্যুম্ন সরোবর নামে একটি খাল বা দিঘি আছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, আর্য-অনার্য সংস্কৃতির একটি সংঘাতের স্মৃতি বহন করছে এই স্থান।[৭২] কারও মতে, শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন অসুর অধিপতি সম্বরাসুরকে হত্যা করে এখানে পুঁতে রাখেন এবং নিজের নামে এই

অঞ্চলের নাম দেন প্রদ্যুম্ননগর। তার আগে এর নাম ছিল ঋক্ষবন্তনগর।[৭৩] তবে এই মত নিয়ে অনেকের নানা মতভেদও থাকতে পারে। যাই হোক, তৎকালীন সময়ে এই চাকদহ যে বিখ্যাত নগর ছিল তার কিছু কিছু প্রমাণ এখনও বর্তমান। শিমুরালি (চাকদহের পার্শ্ববর্তী স্থান) থেকে চাকদহ পর্যন্ত নানা জায়গায় উঁচু ভিটে, পুকুর, মন্দির ও মঠের ধ্বংসস্তুপ এখনও দেখা যায়। শিমুরালি ও চাকদহের মাঝামাঝি পশ্চিমদিকে এইরকম একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি ছোটো ছোটো লাল ইটের তৈরি ও অপূর্ব কারুকার্য বিশিষ্ট সেই পুরোনো স্থাপত্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। 'Vide the List of Ancient Monuments in the presidency division' বইতে এই মন্দিরের বিবরণ আছে।[৭৪] বর্তমানে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন হওয়ার কারণে চাকদহ থেকে গঙ্গা অনেক দূরে অবস্থিত।

চাকদহের প্রাচীন ঐতিহ্য ছাড়াও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, চাকদহের কাঁঠালপুল পল্লিতে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহেশ পণ্ডিতের ফুলসমাজ বেদী ও শ্রীপাট অবস্থিত এবং যশড়ায় চৈতন্যপার্ষদ ও ভক্ত জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট আছে। চৈতন্যশাখা ও নিত্যানন্দশাখার শিষ্য মহেশ পণ্ডিত সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন-

"মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নিত্য করে যেন মাতোয়াল।।"[৭৫]

শ্রীজগদীশ চরিত্র বিজয় থেকে জানা যায় মহেশ পণ্ডিতের জন্ম হয় শ্রীহট্টে (বর্তমান বাংলাদেশে)। শ্রীহট্টেই তিনি বেড়ে ওঠেন। তাঁর বাবার নাম কমলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা ভাগ্যবতী। আনন্দ দাস লিখেছেন -

"মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে একাদশী তিথি।
ভীম একাদশী বলি লোকে যার খ্যাতি।।
...
পূর্ব দেশস্থিত দ্বিজ কমলাক্ষ নাম।
গয়ঘড় বন্দ্য ভূট্য নারায়ণ সন্তান।
তাঁহার গৃহিণী অতি পতিব্রতা সতী।
তাঁর নাম বিখ্যাত শ্রীমতী ভাগ্যবতী।।
...
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে একাদশীতিথি।
শুভলগ্ন শুভগ্রহ শুভক্ষেত্র রাশি।
অবতীর্ণ জগদীশ সর্ব্বগুণ রাশি।"[৭৬]

কমলাক্ষের দুই সন্তান, বড় ছেলে জগদীশ ও ছোটো ছেলে মহেশ। ব্রজের উদার গোপাল মহাবাহু। মহেশ পণ্ডিত ব্রজলীলায় মহাবাহু সখা ছিলেন।[৭৭] সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব নিত্যনন্দের সঙ্গে যশড়ায় জগদীশের কাছে আসেন। তখন নিত্যানন্দ মহেশকে দীক্ষা দেন। মহেশ নিত্যানন্দের সঙ্গে পানিহাটীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

"তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে।
নিত্যানন্দ প্রভুর পাশ চলিলা আর দিনে।।
পাণিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহু জন।।
...
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস।

মহেশ গৌরীদাস হোড় কৃষ্ণদাস।।"[৭৮]

খড়দহের নিত্যানন্দের শ্রীপাট স্থাপনের পর মহেশ যশড়ার কাছে মসিপুরে শ্রীপাট স্থাপন করেন। মসিপুর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হওয়ার পর শ্রীপাট সবরডাঙায় স্থানান্তরিত হয়। সেই স্থানও গঙ্গা দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে শ্রীপাট বর্তমান কাঁঠালপুলীতে অবস্থান করছে। এখানে গোপীনাথ, নিতাইগৌর ও মদনমোহন বিগ্রহ আছে। গভীর নিষ্ঠার সাথে বিগ্রহের নিত্য সেবা চলে। রাস দোল জন্মাষ্টমী ইত্যাদি উৎসব ছাড়াও অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মহেশ পণ্ডিতের আবির্ভাব তিথি এখানে মহাধুমধামে পালিত হয়। এই তিথিতে বিভিন্ন বৈষ্ণবগণ এখানে মহাসমারোহে একত্রিত হয়।

যশড়া শ্রী পাটের প্রতিষ্ঠিতা জগদীশ পণ্ডিত ছিলেন-

"জগদীশ পণ্ডিত হয় জগত পাবন।

কৃষ্ণ প্রেমামৃত বর্ষে যৈছে বর্ষাঘন।।"[৭৯]

জগদীশ চৈতন্যদেবের থেকে বয়সে অনেক বড়ো ছিলেন। বৃন্দাবন দাসের ভাষায় -

"নিগূঢ়ে অনেক তারা বৈসে নদীয়ায়।
পূর্বেই জন্মিলা সবে চৈতন্য-আজ্ঞায়।।
শ্রীচন্দ্রশেখর জগদীশ গোপীনাথ।
শ্রীমান মুরারি শ্রীগরুড় গঙ্গাদাস।।"[৮০]

শ্রীশ্রীজগদীশ চরিত্র বিজয় থেকে জগদীশের সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যায়। আগেই আমরা জগদীশের পারিবারিক পরিচয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি। কমলাক্ষের প্রতিবেশী দুখিনী নামের কোনো এক ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে জগদীশের বিবাহ হয়। বাবা মায়ের মৃত্যুর পর জগদীশ স্ত্রী দুখিনী ও ভাই মহেশকে নিয়ে নবদ্বীপে চলে আসেন। নবদ্বীপে তিনি জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশী ছিলেন। সেখানে জগদীশের হিরণ্য ভাগবত নামে অপর এক প্রতিবেশী ছিলেন। এঁদের সকলের সঙ্গে ধীরে ধীরে জগদীশের ঘনিষ্ঠতা ও সখ্যতা বেড়ে ওঠে। এরপর নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়। শৈশবে শিশু গৌরাঙ্গ কৌতুক করে নানা অহেতুক বায়নায় বড়দের বিড়ম্বনায় ফেলত। এক একাদশীর উপবাসের দিন বিশ্বম্ভর অসম্ভব বায়না করে জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য-ভাগবতের বিষ্ণু-নৈবেদ্য খেতে চাইলেন। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন -

"প্রভু বলে যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ।
তবে ঝাঁট দুই ব্রাহ্মণের ঘর যাহ।।
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।
এই দুই স্থানে মোর আছে অভিমত।।"[৮১]

আবার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনাকারের ভাষায় -

"জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়।।
সেই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে।।"[৮২]

সকলে শিশুর এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে বিস্মিত হল এবং শিশুর খাওয়াতেই বিষ্ণুর আহার ভেবে আনন্দে হরিধ্বনি দিল। এইভাবে ধীরে ধীরে নবদ্বীপবাসী গৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্ব বরণ করে নিতে শুরু করেছিল।

জগদীশ ক্রমে ক্রমে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলায় যুক্ত হলেন। গৌরাঙ্গের নৈশ নাম-সংকীর্তন, কাজীদলন প্রভৃতি কাজের সঙ্গী হলেন তিনি। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন –

"গোপীনাথ জগদীশ শ্রীমাল শ্রীধর।

সদাশিব বক্রেশ্বর শ্রীগর্ভ শুক্লাম্বর।।
ব্রহ্মানন্দ পুরুষোত্তম সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য ভৃত্য নাম জানি কত।।
সভেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সঙ্ঘতি।
সপার্ষদ বহি আর কেহ নাহি তথি।।”[৮৩]

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পর, তাঁর পুরী যাবার কথায় জগদীশ মর্মাহত হন। তিনি ঠিক করলেন, শ্রীচৈতন্য জগন্নাথের পায়ে আশ্রয় নিতে পুরী যাবেন। তাই জগন্নাথকেই যদি নবদ্বীপে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে তিনি আর নদিয়াবাসীকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না। এই কারণে তিনি পুরী থেকে জগন্নাথের মূর্তি আনলেন। আসার পথে বিশ্রামের কারণে তিনি চাকদহের যশড়া নাম্নী একটি স্থানে বিগ্রহ নামিয়ে বিশ্রাম করতে শুরু করলেন। এমন সময় ঈশ্বরের স্বপ্নাদেশ পেলেন বিগ্রহ ওই স্থানে প্রতিষ্ঠা করার। এইভাবে যশড়া শ্রীপাট প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর জগদীশ নবদ্বীপ ছেড়ে স্ত্রী ও ভাইকে নিয়ে যশড়া চলে আসেন। চৈতন্যদেব পুরী যাত্রা কালে শান্তিপুর থেকে যশড়ায় আসেন এবং দুখিনী মায়ের হাতের রান্না খান। মহাপ্রভু চলে যাবার পর জগদীশ বাল-গৌর-বিগ্রহ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন। শিশু গৌরাঙ্গের খেলাচ্ছলে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা সেই মূর্তি। এরপর জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর দর্শনের জন্য পুরী যান। ফেরার সময় চৈতন্যের নির্দেশে তিনি রামদাস, গদাধর প্রমুখদের ন্যায় নিত্যানন্দের সঙ্গী হয়ে গৌড়ে আসেন। সেই সময় খঞ্জ ভগবান-আচার্যও তাদের সঙ্গী ছিলেন এবং মহাপ্রভুর আদেশে খঞ্জের সন্তান রঘুনাথ জগদীশের মন্ত্রশিষ্য হন। এই রঘুনাথ শিষ্য ভগবতানন্দ ও তাঁর শিষ্য আনন্দচন্দ্র দাস শ্রীশ্রীজগদীশ চরিত্র বিজয় নামক গ্রন্থের রচয়িতা। রঘুনাথ দাস আয়োজিত পানিহাটির দধিচিড়া মহোৎসবে জগদীশও নিত্যানন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

এবার আমরা যশড়ার জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের বর্তমান অবস্থার কথায় ফিরে আসি। জগদীশ পণ্ডিত জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যশড়াতে জগন্নাথ মন্দির ও দোলমঞ্চ তৈরি করেন। শোনা যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই মন্দির নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন। যদিও তার কোনো দলিল নেই। পাঁচখিলানের দালান মন্দিরটিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ, বাল-গৌর-বিগ্রহ, পিতল ও মাটির রাধাকৃষ্ণ মূর্তি এবং দুখিনী মায়ের মূর্তি পূজিত হয়। জগদীশ পুরী থেকে যে লাঠিতে বুলিয়ে জগন্নাথ বিগ্রহ এনেছিলেন সেই লাঠিটি এখনো নিয়মিত পুজো হয়। বলরাম-সুভদ্রাহীন জগন্নাথ মূর্তিটি প্রায় চার ফুট উচ্চতার, বাল-গৌর-বিগ্রহটি কাঠের। দোলমঞ্চটি একচুড়া ও আটটি কোণ বিশিষ্ট। যশড়ার বার্ষিক উৎসবের মধ্যে ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, গুরুপূর্ণিমা, অন্নকূট [অন্নকূট কথার অর্থ হল, অন্নের পর্বত, মথুরায় গিরিরাজ গোবর্ধন পর্বতের পাদদেশে শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত গোবর্ধন পূজার সময় যে ভোগরাশি নিবেদন করা হয়েছিল তাকে অন্নকূট বলে। পরবর্তীকালে মাধবেন্দ্রপুরী পুনরায় গোবর্দ্ধনধারী ‘শ্রীগোপাল’কে প্রকট করিয়ে এই উৎসবের প্রচলন করেন। অন্নকূট উৎসবে ভাত, রুটি, ডাল, সুপ, বন্য শাক, ফল, নানা ব্যঞ্জন, দই, দুধ, মাখন, পায়েস, মাটা ইত্যাদির স্তুপ করে ভগবান গোপালকে ভোগ নিবেদন করা হয় (কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সম্পাদনা- সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দশম আনন্দ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ - ১৪২-১৪৫)।] উৎসব। পালিত হয়। এছাড়া এই শ্রীপাটের বিশেষ উৎসব জৈষ্ঠ্য পূর্ণিমা তিথিতে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা এবং পৌষ শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব। স্নানযাত্রার দিন যশড়ার নিকটবর্তী ভাগরথী থেকে মন্ত্রোচ্চারণ করে ১০৮ টি কলসিতে জল ভরে নানা সুগন্ধিদ্রব্যতে সুবাসিত করে মন্দিরে আনা হয়। তারপর জগন্নাথ দেবকে স্নানমঞ্চে এনে মালা, চামর, পতাকা, তোরণ, চন্দন, সুগন্ধি ধূপ, আতর, ফুল, বাদ্য সহযোগে স্নান করানো হয়। স্নানের পর সুন্দর পোশাক পরিয়ে বিগ্রহের অঙ্গরাগ করা হয় এবং বিশেষ পূজা ও ভোগরাগ দেওয়া হয়। স্নান যাত্রা উপলক্ষে পাটবাড়ির চারিদিকে মেলা বসে।

নাগোরদোলা, নানা খেলনার দোকান, খাবারের দোকান, নিত্য প্রয়োজনীয় নানা জিনিসের পসরা সবমিলিয়ে ভরপুর উৎসবের আমেজ তৈরি হয়। এছাড়া সারাদিন ধরে মন্দিরে নামগান ও পালাকীর্তন চলে। জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথিও একই সমারোহে পালিত হয়। এই দুই তিথিতে দূরদুরান্ত থেকে বহু ভক্ত সমাগম ঘটে। শ্রীপাটে একটি বড় বকুল গাছ ছিল। কথিত আছে, বকুল গাছটিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছায় আম ধরেছিল। পাটবাড়ির ভক্তদের বিশ্বাস বকুল গাছের নিকটেই পুরোনো নিম গাছটির ছায়ায় চৈতন্য প্রভু ও নিত্যনন্দ প্রভু ক্ষণিক অবস্থান করেছিলেন। তাই এই গাছ দুটি ভক্তদের কাছে পরম পবিত্র ও পূজ্য। যদিও পুরোনো বকুল গাছটি আর নেই সেখানে একটি নতুন গাছ লাগানো হয়েছে। স্নানমঞ্চের কাছে একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও একটি শিব লিঙ্গ আছে। শোনা যায় এখানে 'বুড়ো মা' নামে কালী মূর্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তবে বর্তমানে তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হয়ত জগদীশ পণ্ডিতের এখানে বৈষ্ণব শ্রীপাট স্থাপন করার ফলে প্রবল শাক্ত প্রভাব খর্ব হয়েছে।

যশড়া পাটে বিগ্রহের নিত্য ভোগসেবা শুরু হয় ভোর ৪.৩০ থেকে। ভোর বেলায় বিগ্রহের গাত্রোত্থান, মঙ্গলারতি, বাল্যভোগ, অর্চন ও পাঠকীর্তন। বাল্যভোগে পরোটা, পুরী, ক্ষীর, মিছরি, মাখন, মিষ্টি, ফল ইত্যাদি থাকে। তারপর স্নান, অঙ্গরাগ, মধ্যাহ্নকালীন পূজা, মধ্যাহ্নভোগ বা রাজভোগ ও শয়ন। দুপুরের ভোগে অন্ন, শাক, ডাল, ভাজা, বিভিন্ন ব্যঞ্জন, পরমান্ন ইত্যাদি থাকে। বিকেলে বিগ্রহের জাগরণ, আরতি, শীতলিভোগ, সন্ধ্যায় আরতি, রাত ৮ টায় ভোগ এবং শয়ন। শীতলি ভোগে ফল, মিষ্টি থাকে এবং রাতের ভোগে ভাত, রুটি ব্যঞ্জন, দুধ, মিষ্টি, ক্ষীর ইত্যাদি দেওয়া হয়।

নিকটেই মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে গৌরনিতাই বিগ্রহ ও তাঁর সমাধিবেদীরও জগদীশ পাটের অনুরূপ সেবাপূজা হয়। এই শ্রীপাটের বিশেষ উৎসব হল অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে মহেশ পণ্ডিতের তিরোধান উৎসব।

নবদ্বীপে চৈতন্যদেব এবং তাঁর পরিবার সমর্থকদের বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন প্রসারের কারণ মূলত হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যাভিমান, নিম্নবর্গের হিন্দুদের কুসংস্কার ও অর্থহীন ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি আসক্তি, ব্রাহ্মণ্য সদাচারের অবলুপ্তি, তান্ত্রিক বামাচারের বিকৃতকরণ এবং জাত বিচারের কঠোরতা থেকে সমাজ ও ধর্মকে মুক্তি দেওয়া এবং চৈতন্য ভক্তির কথা বলেছিলেন। বিচার, বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক ও মননের শুস্কতার বিরুদ্ধে তিনি ভক্তির মৌল তত্বটিকে উপস্থাপিত করেছিলেন। চৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দের আবেদন ছিল হৃদয়ের কাছে। যুক্তি, তর্ক, কূটনীতিপূর্ণ মস্তিষ্কের কাছে নয়। কিন্তু বৃন্দাবনবাসী ছয় গোস্বামী চৈতন্যের সরল এবং জনসমর্থিত ভক্তিকে নিজেদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য এবং বৈদগ্ধতার দ্বারা একটি কঠিন জটিল ও উচ্চশ্রেণীর ভক্তিতত্বে রূপান্তরিত করলেন। তাঁরা বুদ্ধি ও যুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়াই 'অচিন্ত ভেদাভেদবাদ' এর কথা বললেন। যা মেলানো যায় না, অর্থাৎ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মনন পদ্ধতি অচিন্ত্য শব্দের মধ্য দিয়ে মিলিত হল। যেখানেই তাত্ত্বিক স্ববিরোধ সেখানেই অচিন্ত্য। অর্থাৎ সামাজিক এবং ধর্মীয় পরিবর্তন ও উদারতার প্রয়োজনে চৈতন্যদেব যে আন্দোলনের প্রসারণ ঘটাতে চেয়েছিলেন গোস্বামী শাস্ত্রে তাই ভিন্নরূপ ধারণ করল। চৈতন্যজীবনীকারদের দ্বারা জনসমক্ষে রটিত হল, চৈতন্যের নির্দেশে এবং শিক্ষানুসারে বৃন্দাবনই। গোস্বামীগণ তাঁর ভক্তি আন্দোলনের ধর্মতত্ব রচনা করেছিলেন। আর এই বৃন্দাবনী তত্ব আপামর বাংলার বৈষ্ণবদের কাছে সহজবোধ্য ছিল না। যে মানুষটা আটটি শ্লোক ছাড়া আর কোন তত্ব বা তথ্য তাঁর সমর্থককুলের জন্য রেখে যান নি তাঁর উপর সংস্কৃতে রচিত এই বৃন্দাবনী তত্ব আরোপিত হল।

চৈতন্যের আন্দোলনের ভাবই ছিল প্রধান। এই আন্দোলন ক্রমশ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লেও এর মূলকেন্দ্র ছিল বৃন্দাবন, পুরী ও নবদ্বীপ। সেখানে নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল না। তাই আমলাতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রূপ ও সনাতন গোস্বামী তাত্ত্বিক প্রণালী দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করে চৈতন্যের আন্দোলনের ভাবে

আতিশয্যকে অবদমিত করতে চেয়েছিলেন। তার ফলে এই আন্দোলন বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হল। বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন অদ্বৈতাচর্য ও নিত্যানন্দ। কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তাঁদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখেননি। বৃদ্ধ অদ্বৈতাচর্যের শিষ্যরা যথা ঈশান নাগর ঢাকার মাণিকগঞ্জে, লাউলিয়া কৃষ্ণদাস শ্রীহট্টে এবং শ্যামদাস আচার্য পূর্ব বর্ধমানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও সংগঠিত করেন। অদ্বৈতদেবের মৃত্যুর পর সীতাদেবী অচ্যুতানন্দ (অদ্বৈতপুত্র) স্থানীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ফলে অদ্বৈতপন্থী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্ষনশীলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিত্যানন্দ ও তার পরিবার শিষ্যবর্গ সখ্য'ভাবের উপাসক ছিলেন। নিত্যানন্দের পরিবাররা দ্বাদশ গোপাল নামে পরিচিত হন। দ্বাদশ গোপালসহ নিত্যানন্দ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যেমন, খড়দহ, পানিহাটি ও চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে, বীরভূমের অধিকাংশ স্থান, নদিয়ার কিছু অংশ, বর্ধমানের অনেকাংশ হুগলীর বিস্তারিত অঞ্চল, সপ্তগ্রাম, ময়মনসিংহের হাজং উপজাতি অঞ্চলে সখ্যভাবের প্রচার ও[৮৪]

প্রসার ঘটায়। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বহু বৌদ্ধ নেড়ানেড়িকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন।[৮৫] চৈতন্যর মৃত্যুর পর বাংলাদেশে এইভাবী বিভিন্ন বৈষ্ণব দল উপদল তৈরি হয়। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিল[৮৬] -

(ক) অদ্বৈতাচর্যের অনুগামী বৈষ্ণবগোষ্ঠী
(খ) নিত্যানন্দের অনুগামী বৈষ্ণবগোষ্ঠী
(গ) শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের 'গৌরনগরবাদী' বৈষ্ণবগোষ্ঠী
(ঘ) গদাধর পণ্ডিতের অনুগামীদের 'গদাই-গৌরাঙ্গ' বৈষ্ণবগোষ্ঠী
(ঙ) চৈতন্যপুজকদের 'গৌরপারম্যবাদী' বৈষ্ণবগোষ্ঠী
(চ) সহজিয়া বৈষ্ণবগোষ্ঠী।

এছাড়াও নবদ্বীপের শ্রীবাস পণ্ডিতের শিষ্যসম্প্রদায়, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের রসরাজ সম্প্রদায় ইত্যাদি উপদলও ছিল। এই রসরাজ সম্প্রদায় বর্ধমানের বাঘনা পাড়ায় প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।[৮৭] কিন্তু বৈষ্ণবগোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যথেষ্ট খারাপ ছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলোকে সংগঠিত করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তখন বংলার কিছু কিছু বৈষ্ণব বৃন্দাবনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নদেবীর সঙ্গে বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের যোগাযোগ ছিল। নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনভাবে নিয়ে শিস্য সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন শীষ্যদের কাছে তিনি ঈশ্বর রূপে পূজিত হন। তিনি নবদ্বীপ ও শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন।

বাংলাদেশে বৃন্দাবনী তত্ত্ব আনার জন্য বাংলার বৈষ্ণবরা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাই জাহ্ন দেবীর নেতৃত্বে গোপাল উদ্ধারণ দত্ত, গৌরীদাস পণ্ডিত এবং পরমেশ্বর দাস, শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ, নরোত্তম দত্ত, রামচন্দ্র (বাঘনাপাড়া) বীরভদ্র, রামচন্দ্র কবিরাজ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন।[৮৮] এদের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য বর্ধমানের যাজিগ্রামে নরোত্তম দত্ত রাজশাহী জেলার খেতুরিতে এবং শ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার ধারোন্দা বাহাদুরপুরের প্রভাবশালী বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য ব্রাহ্মণ, নরোত্তম দাস খেতুর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের পুত্র এবং শ্যামানন্দ জাতিতে সদগোপ ছিলেন। বৃন্দাবনে একটি সভায় আলোচনা করে ঠিক হয় এই তিন বৈষ্ণবদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ষড়-গোস্বামী রচিত পুথি সমূহ নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু পথে বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহান্বির পোষিত দস্যুরা এই পুথি চুরি করেন। শ্রীনিবাসের চেষ্টায় এই পুথি উদ্ধার হয় এবং বীরহাম্বির শ্রীনিবাসের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন।

বৃন্দাবনী তত্ত্ব যাতে বিনা মতভেদে সকলের কাছে গৃহীত হয় এই কারণে বৈষ্ণব সমাজে কতগুলি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে কাটোয়ায় নিত্যানন্দের শিষ্য গদাধরের তিরোধান উপলক্ষ্যে একটি মহোৎসব হয়। কাটোয়ার মহোৎসবে অদ্বৈতাচর্য ও নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর বৈষ্ণবরা যোগ দিয়েছিলেন।[৮৯] এরপর

শ্রীনিবাস আচার্যের উদ্যোগে শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের তিরোধান মহোৎসব পালন করা হয়। এই উৎসবে অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-শ্রীনিবাস আচার্য-জাহ্নবী প্রমুখ বৈষ্ণব নেতৃত্বগণের শিষ্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন।[৯০] শ্রীনিবাসের উদ্যোগে যাজীগ্রামেও একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উৎসবে অদ্বৈতচার্য ও নিত্যানন্দের পুত্রও যোগ দিয়েছিলেন।[৯১] এইসব মহোৎসব থেকে অনুমিত হল বঙ্গের বৈষ্ণবরা একতার জন্যই 'গোস্বামীশাস্ত্র' গ্রহণ করতে আপত্তি করবেন না। আর এই একতা প্রতিষ্ঠার জন্যই রাজশাহীর খেতুরিতে অনুষ্ঠিত হল বৈষ্ণবধর্মের সবচেয়ে বড় খেতুরি মহোৎসব। বিভিন্ন সন্তজীবনীতে পাওয়া তথ্য অনুসারে জানা যায়, পঁচানব্বইজন প্রধান বৈষ্ণব এবং তাঁদের শিষ্যরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সম্ভবত সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।[৯২] নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, খড়দহ-পাণিহাটি ইত্যাদি স্থান থেকে জাহ্নবাদেবী, কবি জ্ঞানদাস, কমলাকর পিল্লাই, মীনকেতন রামদাস, কবি বলরাম দাস, বৃন্দাবন দাস, অচ্যুতানন্দ, বিষ্ণুদাস আচার্য, কবি গোবিন্দদাস, লোচনদাস, মঙ্গল ঠাকুর ব্যাসাচার্য, শ্যামানন্দ, রসিকানন্দ, ঢাকা-বিক্রমপুরের জগন্নাথ, কবি কর্ণপুর, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস প্রমুখ বৈষ্ণবরা এই খেতুরি মহোৎসবে সামিল হন। খেতুরি মহোৎসবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। যথা - চৈতন্যপূজা, কৃষ্ণপূজা, চৈতন্যভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করা প্রাধান্য পেল। 'বল্লভীকান্ত' 'ব্রজমোহন', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'রাধাকান্ত' এবং 'রাধামোহন' পূজনীয় দেবতা রূপে মান্যতা পেলেন।[৯৩] ঐতিহ্যানুসারে খেতুরিতে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা রচিত শাস্ত্র সর্ব বৈষ্ণব গ্রাহ্য হয়েছিল। বাঙালী বৈষ্ণবদের চৈতন্য পূজা ও বৃন্দাবনই গোস্বামীদের কৃষ্ণপূজার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে জানানো হল -

> "কৃষ্ণ গৌর এক হবে ভেদবুদ্ধি যার
> সে যায় নরকে তার নাহিক নিস্তার।।"[৯৪]

অর্থাৎ গৌরপারম্যবাদ পরিত্যক্ত হল। কিন্তু নরহরি সরকারের গৌরনগরবাদ প্রাধান্য পেল। রূপগোস্বামী প্রবর্তিত অষ্টকালীন শ্রীবিগ্রহসেবা গ্রহণ করা হল। বৃন্দাবনী তত্ত্বই গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব রূপে পরিণত হল। অর্থাৎ বৃন্দাবন তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। এই লীলা ছিল মধুর রসাত্মক। অন্যদিকে চৈতন্যদেব দাস্যভাবের কথা বলেছিলেন। তাই 'মধুর' ও 'দাস্য ভাবে মিলিত হয়ে মঞ্জুরী অর্থাৎ 'দাসী' রূপে সাধনা বিচিত্র তত্ত্ব তৈরি হল। অদ্বৈতাচর্য ও নিত্যানন্দপন্থী বৈষ্ণবরা মঞ্জুরী উপাসনার তত্ত্ব গ্রহণ করলেন।[৯৫] কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের মধ্যেই নানা স্ববিরোধ দেখা গেলো। এই স্ববিরোধিতাই 'অচিন্তভেদাভেদতত্ত্ব' নামে পরিচিত। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের একই সঙ্গে 'ভেদ' ও 'অভেদ' কল্পনা করা হল। বৃন্দাবনী তত্ত্বের মনন ও স্মরণ থেকে সৃষ্টি হল বৈষ্ণব পদাবলীর। তবে চৈতন্য তিরোধানের পরে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের ভাবধারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলো। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের অনুকরণে বৈষ্ণব স্মৃতি রচিত হল। জাতি ও কৌলীন্যের ভিত্তিতে বৈষ্ণবরাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। একদিকে জাতিভেদ মানা উচ্চবর্ণের বৈষ্ণব। অন্যদিকে জাতিভেদ না মানা নিম্নবর্ণের বোষ্টম। প্রখ্যাত গবেষক গোলাম মুরশিদ লিখছেন -

> "চৈতন্যদেব ধর্মকে মুক্তি দিয়েছিলেন গ্রন্থ থেকে। কিন্তু তার গোস্বামীরা ধর্মকে কেবল গ্রন্থের ভেতরে বন্দী করেননি, বরং সংস্কৃত ভাষায় দেওয়াল তুলে সে গ্ৰন্থকেও সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে স্থাপন করেন। চৈতন্যদেব জাতিভেদ থেকে ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর গোস্বামীরা বর্ণের বেড়া দিয়ে সমাজকে আবার বিভক্ত করেন। এককথায় চৈতন্যদেবের নামে তাঁরা রুচি, জীবে দয়ার শিক্ষা এবং প্রেম-ভক্তি স্পিরিট নস্যাৎ করেন। অতঃপর শাস্ত্র এবং রক্ষনশীলতার লেবাস পরে বৈষ্ণবধর্ম ব্রাহ্মণদের অনুমোদন লাভ করে।"[৯৬]

লেখক কুমুদনাথ মল্লিকের মতে, চৈতন্যের পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রধানত চার ভাগে ভাগ হয়েছিলেন। প্রথমত, বিষ্ণুর উপাসক, গৌরাঙ্গের কোনো মতামত গ্রাহ্য না করা বৈষ্ণব সপ্রদায়। দ্বিতীয়ত, সম্প্রদায় গৌরাঙ্গের নিরুক্ত মতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। তৃতীয়ত, শ্রীগৌরাঙ্গকেই উপাস্য জ্ঞানে পূজা করা বৈষ্ণব সম্প্রদায়। চতুর্থত, যে সম্প্রদায় নামে বৈষ্ণব হলেও আচারে ব্যবহারে একেবারে ভিন্ন পথালম্বী।[৯৭] এঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণবদের সংখ্যা নদিয়ায় খুব বেশি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা অত্যধিক। নদিয়ায় অদ্বৈত ও চৈতন্য অনুগামী বৈষ্ণবরা মূলত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ উভয়েরই উপাসনা করেন। এঁরা মূলত গোস্বামী পদবাচ্য। গোস্বামী শব্দের অর্থ "গো" অর্থে ইন্দ্রিয়গণের যিনি স্বামী অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী তিনিই গোস্বামী।[৯৮] তবে বর্তমানে গোস্বামী বংশে জন্মগ্রহণ করলেই গোস্বামী পদবাচ্য হওয়া যায়। খেতুরির বৈষ্ণব সম্মলনের মতে, এঁরাই বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়। ভক্তি ও প্রেমই এদের সর্বস্ব, এঁরা মঞ্জরীভাবে সাধনা করেন। নামসংকীর্তন এদের প্রধান সাধনা এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি কামনায় উপবাস, নৃত্য, গীত, রিপুসংযমাদি ইত্যাদি সাধনাও করেন। চৈতন্য পূজার ক্ষেত্রেও শাস্ত্র মতে চৈতন্যের পূজা, স্তব, মন্ত্রোচ্চারণ, শ্রীচৈতন্যের ধ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে উপাসনা করতে থাকেন। এঁরা গৃহী বৈষ্ণব ও শিষ্যদের কৃষ্ণমন্ত্র কখনও বা চৈতন্যমন্ত্র দান করে থাকেন। সাধারণ মানুষকেও দীক্ষা দেন। চতুর্থ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রধান সহজিয়া, নেড়ানেড়ি, কর্তাভজা, বাউল, আউল, সাহেবধনী, বলরামভজা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের সংখ্যা নদিয়ায় অসংখ্য।

নদিয়ার বৈষ্ণব পাটবাড়িগুলি যথা শান্তিপুর, নবদ্বীপ, যশড়া, কুলিয়া ইত্যাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতে বিশ্বাসী। শ্রীপাটগুলি নিজেদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা সমগ্র নদিয়াবাসীর মধ্যে ভক্তির ফল্গু স্রোত বইয়ে নিয়ে চলে। শ্রীপাটগুলো নিজস্ব উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এক আঙ্গিনায় হাজির করে। শান্তিপুর ও নবদ্বীপের পাটবাড়িগুলির ব্যক্তিগত রাসোৎসব বর্তমানে সমস্ত নদিয়া বাসীর রাসোৎসবে পরিণত হয়েছে। শান্তিপুরে অদ্বৈতচর্যের বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীপাটগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শান্তিপুর প্রায় একুশটি বিগ্রহবাড়ি প্রতিষ্ঠা হয়েছে।[৯৯] এরা মোটামুটি মূল পাটবাড়িগুলির রীতিনীতি মেনে চলার চেষ্টা করে। নদিয়ার শ্রীপাটগুলির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল ধর্মের ভেদাভেদের উর্ধে গিয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করা। অদ্বৈতাচার্য নিজের ব্রাহ্মণ্য চোখরাঙ্গানিকে তোয়াক্কা না করে মুসলিম হরিদাসকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে একাসনে বসে আহারও করেছিলেন। সেই চূড়ান্ত বিপ্লবের ঐতিহ্যানুসারে বর্তমানেও শান্তিপুরের শ্রীপাটগুলি বিভিন্ন কাজে মুসলিমরা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। মণ্ডনির্মাণ, উৎসবের প্রস্তুতি ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করেন মুসলমান বৈষ্ণব ভক্তরা। এখন সমাজের সমস্ত বর্ণের ও সমস্ত ধর্মের মানুষেরা বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণ করে নিজেদের মতো পালন ও লালন করেছে।

নদিয়ার শ্রীপাটগুলোর অন্যতম ঐতিহ্য রাসোৎসব। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের রাসোৎসব সমস্ত বৈষ্ণবদের কাছে এক মহাসম্মেলন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এমনকি বিদেশ থেকেও বহু মানুষ এই রাস উৎসবে যোগ দিতে আসেন। তবে আলোচনা সাপেক্ষ; কেন রাসোৎসব জগৎবিখ্যাত, কি এই রাসোৎসব এবং কিভাবে শুরু হল রাসের শোভাযাত্রা? চৈতন্য সমকালে বা পূর্বকালে যে রাসোৎসব পালন করা হত খুব সাধারণভাবে হঠাৎ পরবর্তীকালে এসে এই উৎসব কিভাবে বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্মে জোয়ার বইয়ে দিল।

রাস হল রসের পূর্ণতা। রসরাজ কৃষ্ণ হলেন প্রেম আর রাধারানী হলেন প্রেমের পূর্ণতা। অনেক নর্তক ও নর্তকী যুক্ত নৃত্য বিশেষকেই রাস বলা হয়। অনেক নট ও নটীর পরস্পর হাত ধরে মণ্ডলাকারে নৃত্যকলাই হল রাস। নৃত্য, গীত, চুম্বন ও আলিঙ্গন এই রসসমূহই রাসের উপাদান।

রাস দুই প্রকার - নৃত্য রাস ও মহারাস। 'আদিপুরাণ'-এ নৃত্যরাস এবং 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ মহারাসের কথা আছে। শারদ ও বাসন্ত ভেদেও রাসের দ্বৈবিধ্য আছে।[১০০] 'বিষ্ণুপুরাণ' ও 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ শারদরাসের এবং

'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' ও 'গীতগোবিন্দ'-এ বাসন্ত রসের বর্ণনা আছে। 'পদ্মপুরাণ'-এ শারদ ও বাসন্ত উভয় রাসের কথাই পাওয়া যায়। 'হরিবংশপুরাণ'-এর, বিষ্ণুপর্বে কুড়ি অধ্যায়ে হল্লীষকের কথা আছে। অনেক নর্তকীকে নিয়ে একজন নটের মণ্ডলাকারে নৃত্যকে হল্লীষক বলে। এই নৃত্য যদি বিশুদ্ধ তালযুক্ত এবং বিবিধ গতিভেদে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় তাকেই রাস বলা হয়।[১০১]

'শ্রীমদ্ভাগবত' এ কৃষ্ণলীলার একটি ক্রমপর্যায় আছে। তাই 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ আলোচিত মহারাস ও শারদরাসের কথা আমার আলোচনার বিষয়। এছাড়া শান্তিপুরে যে রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেটি মহারাস বা শারদরাস। পৌর্ণমাসী বা পূর্ণিমা রাত্রে মহারাস লীলা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণ চন্দ্রোদয়েই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সঙ্গে রাস ক্রীড়ার ইচ্ছা জেগেছিল। মহারাসে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তাঁদেরকে পরিহার করার উপায় কৃষ্ণের ছিল না। এঁদের মধ্যে কাত্যায়নী ব্রতপরায়ণা (কৃষ্ণের বেণুগীত শুনে ব্রজগোপীরা হেমন্তের প্রথম মাসে হবিষ্যান্ন ভোজন করে নন্দ-নন্দনকে পতিরূপে পাবার কামনায় কাত্যায়নী ব্রতচারণ করেছিলেন।) ব্রজনারীরা আছেন। এঁরাই শ্রুতিচরী, ঋষিচরী ও দেবীচরী গোপী। আর এঁদের পথপ্রদর্শিকা রূপে আছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গিনী যূথ-পরিবৃতা শ্রীরাধা। দণ্ডকারণ্যনিবাসী মহর্ষিগণ ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে তাঁকে উপভোগের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। পুরুষদেহে তা অসম্ভব জেনে জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলে এঁরা ব্রজগোপীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁরাই ঋষিচরী গোপী। 'সর্বোপনিষদ'এর সারতত্ত্ব গীতা। এই উপনিষদগুলির মধ্যে যে সমস্ত উপনিষদ ব্রহ্মকে মধু, রস ও আনন্দ বলে অনুভব করেছিলেন, তাঁরাও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়ার জন্য ব্রজগোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁরাই শ্রুতিচরী গোপী। দেবীগণ কৃষ্ণের প্রিয় কার্যসাধন করার জন্য গোপীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদেরকে দেবীচরী গোপী বলে। ঋষিপূর্বা, শ্রুতিপূর্বা ও দেবীপূর্বা এঁরা সকলেই সাধনসিদ্ধা গোপী আর শ্রীরাধা হলেন নৃত্যসিদ্ধা নারী। শ্রীরাধার বস্ত্রহরণ-এর দিনেই এই গোপীদেরও বস্ত্র অপহৃত হয়েছিল। আসলে সর্বধর্ম পরিত্যাগ না করলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না। সংসারধর্ম, সমাজধর্ম, ইন্দ্রিয়ধর্ম ইত্যাদি সর্বধর্মের পর্যায়ভুক্ত। আর নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ লজ্জা। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির জন্য গোপীগণ সর্বধর্মই পরিত্যাগ করেছিলেন। আর এই বস্ত্রহরনের দিনেই শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আগামী রাত্রিগুলিতে ভগবান কৃষ্ণ তাদের কামনা পূর্ণ করবেন, শারদ পূর্ণিমার রাত্রি ছিল সেই প্রতিশ্রুতির রাত্রি। এইভাবে শুরু হল মহারাসলীলা। দুই-দুই গোপী, এক-এক কৃষ্ণ, এক-এক কৃষ্ণ দুই-দুই গোপী এই রীতিতে রাস মণ্ডল সজ্জিত হল। মহাযোগেশ্বর সনাতন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই এটা সম্ভব। আরম্ভ হল রাস নৃত্য যা তালবদ্ধ ও গতিবৈচিত্র্য সমৃদ্ধ।[১০২]

শান্তিপুরের অদ্বৈতপ্রভুর পুত্রের বর্তমান বংশধর সত্যনারায়ণ গোস্বামী রাস সম্পর্কে বলেছেন -

> "রাস হল রসের উৎসব। আর বৃন্দাবনে এই রাস বা রস তো নিত্যদিনের। তবে কার্ত্তিক পূর্ণিমায় রসের মাধুর্যই আলাদা। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে এই রসস্বাদন করেছিলেন। শতকোটি গোপিনীর সঙ্গে। সেখানে তিনি ব্যতীত অন্য পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেবের একবার ইচ্ছা হল সেই রাস দর্শন করার। ... তাই এই রাসে মধুকরী গ্রহণ করতে মহাদেব ছদ্মবেশে একবার কুঞ্জবনের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণও তো জগদীশ্বর। অন্য পুরুষের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তা উপলব্ধি করতে পারলেন এবং তৎক্ষণাৎ লজ্জায় রাস মণ্ডল ছেড়ে চলে গেলেন। এর ফলে রাসের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য দুই নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গোপিনীরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁরা এর কারণ সন্ধানে সচেষ্ট হলেন শেষে যোগমায়ার কাছে ধরা পড়ে গেলেন মহাদেব। গোপিনীদের চাপে মহাদেব সেখান থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে কুঞ্জবন ছাড়ার সময় মহাদেব নাকি বলে

গিয়েছিলেন এখন রাসলীলা দর্শন করতে না পারলেও কলিতে ধরায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি নিজে রাস দর্শন করবেন এবং ভক্তদেরও করাবেন।"[১০৩]

বলাই বাহুল্য, কলির লাউর গ্রামবাসী শান্তিপুরনাথ বৈষ্ণব চূড়ামণি অদ্বৈত আচার্যই সেই সদাশিব মহাবিষ্ণুর অবতার।

"চতুর্ভুজ শখ পদ্ম চক্র গদাধর।
শুক্ল বর্ণ মহাবিষ্ণু দেব অগোচর।।"[১০৪]

পূর্বজন্মে অদ্বৈতাচার্য যে ছদ্দবেশে কৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'অদ্বৈতমঙ্গল'-এ -

"রাস ছাড়ি রাধা লৈয়া কৃষ্ণ অন্তর্ধান।
রাধা রাধা বলিয়া প্রভু ঊর্ধ্ব নয়ান।।
অন্তর্দশায় প্রভু রহেন কতক্ষণ।
কুঞ্জবিহার তথি করএ দরশন।।
রাধা লৈয়া কুঞ্জে বিহার করে কৃষ্ণচন্দ্র।
সেবন করএ প্রভু লইয়া সখীবৃন্দ।।"[১০৫]

এই অদ্বৈতাচার্যই মর্তে প্রথম নদিয়ার শান্তিপুরে রাস উৎসবের সূচনা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে চৈতন্যপূর্বকালে গৌড়বঙ্গে রাস হত না। শান্তিপুরে এই রাস ভাঙা রাসে পর্যবসিত হল। দ্বাপরে কৃষ্ণের ভেঙে যাওয়া রাস কলিতে তিনি আবার শুরু করলেন তাই শান্তিপুরের এই রাসের নাম ভাঙারাস। তবে অদ্বৈত আচার্যের সৃষ্ট রাসের কোন আড়ম্বর ছিল না। পরবর্তীকালে তাঁরই পৌত্র মথুরেশ গোস্বামীর সময় থেকেই এই রাস উৎসবের আকার ধারণ করল। আর আজ বৃন্দাবনের ঝুলন, ঢাকার জন্মাষ্টমী এবং শান্তিপুরের ভাঙারাস এই তিন উৎসব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাস প্রসিদ্ধ উৎসব হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

কথিত আছে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মানসিংহ যখন বাংলা আক্রমণ করেন তখন, যশোরের বারো ভূঁইয়া পরিবারের সেবিত বিগ্রহ কষ্টিপাথরের কৃষ্ণমুর্তির পবিত্রতা বিনষ্টিকরণের আশঙ্কায় তাঁরা তাঁদের গুরুদেব অদ্বৈত পুত্র মথুরেশ গোস্বামীর হাতে বিগ্রহ সমর্পণ করেন। মথুরেশ গোস্বামী পরম শ্রদ্ধায় শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি নিজের বাড়ি অর্থাৎ শান্তিপুরে বড় গোস্বামী বাড়িতে শ্রীরাধারমণ নামে প্রতিষ্ঠা করেন। বড়গোস্বামী বাড়ির মন্দিরের বেদিতে উৎকীর্ণ লিপি থেকে আরও জানা যায়, বিগ্রহটি প্রথমে উড়িষ্যারাজ ইন্দ্রদুম্ন পুরীধামে 'দোলগোবিন্দ' নামে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে যশোররাজ প্রতাপাদিত্য পুরী থেকে বিগ্রহটি নিয়ে এসে যশোরে প্রতিষ্ঠা করেন। বড়গোস্বামী বাড়িতে রাধারমণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু পরেই রাধারমণের পাশে অষ্টধাতুর রাধিকা মূর্তি মহাসমারহে। প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই দিনটিও ছিল এক শারদ পূর্ণিমা তিথি। রাধাকৃষ্ণের এই যুগল মিলন অনুষ্ঠানে ঐদিন শান্তিপুরের অন্যান্য গোস্বামীরাও (অদ্বৈত আচার্যের অন্য পুত্র ও প্রপৌত্রদের বাড়ি যেমন - ঘনশ্যাম গোস্বামীর হাটখোলা গোস্বামী বাড়ি, যাদবেন্দ্র গোস্বামীর মদনগোপাল গোস্বামী বাড়ি, রামেশ্বর গোস্বামীর চাকফেরা গোস্বামী বাড়ি ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। তাঁদের বিগ্রহ মুর্তিসহ বড়গোস্বামী বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেই দিনই শান্তিপুরে খাঁ চৌধুরী পরিবারের নেতৃত্বে সকল গোস্বামী বাড়ির বিগ্রহ সহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শান্তিপুরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমায় বের হয়। এই শোভাযাত্রাই ভাঙারাস নামে পরিচিত।

শান্তিপুরে প্রথম রাসের শোভাযাত্রা চালু করেন ধনাঢ্য তাঁতি পরিবার খাঁ চৌধুরী বংশ। খাঁ। চৌধুরীদের ব্যবসার ভিত্তি ছিল বিদেশ থেকে রেশম আমদানি করা আর বাংলাদেশের মসলিন ও তাঁতের কাপড় রপ্তানি করা। ১৭২৬ সালে এই পরিবারের অন্যতম সদস্য রামগোপাল খাঁ চৌধুরী মহাশয় প্রায় দুলক্ষ টাকা ব্যয়

করে শান্তিপুরে আটচালা রীতিতে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি আনুমানিক ৫২ ফুট দৈর্ঘ্য, ৩৬ ফুট প্রস্থ ও ৭০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন যথা শিব মন্দির ও পোড়ামাটির পদ্ম, চূড়াদেশে ত্রিশূল ও ধাতু নির্মিত পতাকা আছে। মন্দিরে তাদের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ হল শ্যামচাঁদ জিউ বা গোপীকান্তদেব এই মন্দিরের কথা বিনয় ঘোষ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন -

> "পুরাকৃর্তিরূপে গণ্য হবার যোগ্য কয়েকটি মন্দির ও মসজিদ আছে শান্তিপুরে। ... শ্যামচাঁদ পাড়ায় শ্যামচাঁদের মন্দিরটি আকারে বেশ বড়। আটচালা বাংলা মন্দির, ১৬৪৮ শকাব্দে (১৭২৬ খ্রিঃ) স্থাপিত। পোড়া মাটির কারুকার্য বিশেষ নেই, মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তন্তুবায় সম্প্রদায়ের রামগোপাল খাঁ চৌধুরী শোনা যায় মন্দির নির্মাণে প্রায় দু-লক্ষ টাকার মত খরচ হয়েছে। কষ্টিপাথরের কৃষ্ণমূর্তি শ্যামচাঁদ নিত্য পূজিত"[১০৬]

মন্দির প্রতিষ্ঠার পরের বছর খাঁ চৌধুরীরা গৃহদেবতা 'গোপীকান্তদেব'কে নিয়ে রাসের শোভাযাত্রা সূচনা করেন। খাঁ চৌধুরীরা মথুরেশ গোস্বামী বা বড় গোস্বামীর বংশধরদের শিষ্য ছিলেন তাই রাসের শোভাযাত্রায় বড় গোস্বামী বাড়ির রাধারমণ ও শ্রীরাধিকা সর্বাগ্রে থাকতেন। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখছেন -

> "প্রায় ২৫০ বছর পূর্বে শান্তিপুরের রামগোপাল, রামজীবন, রামচরণ, রামভদ্র 'গোপীকান্তদেব'কে লইয়া রাসোৎসব বা মেলার প্রবর্তন করেন। পূর্বে হিন্দুর নিয়মরক্ষা হিসাবে রাসপর্বের সমাধা হইত। যাহা হোক ১০/১৫ বৎসর মধ্যে ১৬৪৮ শকে তাঁহার শ্যামচাঁদের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তৎপর বৎসর হইতে রাসের শোভাযাত্রা বহির্গমনের ব্যবস্থা করেন। তাহারা ক্রমে বড়গোস্বামী মহাশয়দ্বিগকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদ্বিগকে পুরভাগে রাখিয়া নিজেরা তাহাদ্বিগকে অনুগমন করেন।"[১০৭]

এই নগর পরিক্রমা পরবর্তীকালে ভাঙারাসের শোভাযাত্রা নামে খ্যাতি লাভ করে। ক্রমেই এই রাস উৎসব হয়ে উঠলো ইতিহাস প্রসিদ্ধ উৎসব। 'নদিয়ার ইতিহাস' (প্রথম পর্ব) গ্রন্থে শান্তিপুরের রাসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে -

> "শান্তিপুরের অধিকাংশ পালাপার্বণ বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। তবে এখানকার রাসের উৎসবই দেশ বিখ্যাত। শান্তিপুরে ভাঙারাসের শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য বাংলার নানা স্থান এমনকি সুদূর ত্রিপুরা ও মণিপুর হইতেও বহুযাত্রীর সমাগম হয়। রাস উৎসবের শেষদিন গোস্বামীগণের গৃহস্থিত বিগ্রহগণকে চতুর্দোলার উপর স্থাপন করিয়া একসঙ্গে শোভাযাত্রা সহকারে নগর প্রদক্ষিন করানো হয়। ইহারই নাম ভাঙারাস।"[১০৮]

লোকায়ত সাধকরা তিনরকমের রাসের কথা বলেন। সহস্রারে নিত্যরাস, অনাহতচক্রে ভক্তিরাস আর মূলাধারচক্রে ভাঙারাস অর্থাৎ সহস্রারে বৈকুণ্ঠ বা বৃন্দাবনধাম, অনাহতচক্রে নবদ্বীপ আর মূলাধারচক্রের শান্তিপুরের রাসের কথা বলা হয়েছে।[১০৯] শান্তিপুরের রাস জগদ্বিখ্যাত হলেও পূর্বের রাস উৎসবের সঙ্গে বর্তমান রাস উৎসবের বিস্তর পার্থক্য আছে। পূর্বের রাস ছিল মূলত বৈষ্ণবদেরই উৎসব। রাস উপলক্ষে সমস্ত বৈষ্ণব সমাজ একত্রিত হতেন নদিয়ার নবদ্বীপ এবং শান্তিপুরে। রাধাকৃষ্ণের নামগান, সাজসজ্জা ও ভোগপূজা ইত্যাদির আন্তরিক আয়োজনে রাস উৎসব হয়ে উঠত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক বার্ষিক মিলন উৎসবের মত। বর্তমানে এই রাস উৎসব বিগ্রহ বাড়িগুলিতে চারদিন ধরে পালিত হয়। প্রথম দুদিন নিজস্ব রাসমঞ্চেই অনুষ্ঠিত হয় রাস উৎসব - যাকে বলে ঘরের রাস বা বসা রাস। শান্তিপুরে প্রতিটি বিগ্রহবাড়িতে মন্দির ছাড়াও রাস উৎসবের জন্য আলাদা রাসমঞ্চ আছে। রাসের আগে রাসমঞ্চে বর্ণ লেপন করা হয় এবং বিগ্রহের অঙ্গরাগ করানো হয়। রাসমঞ্চ ও সংলগ্ন এলাকা নানা উপকরণে যেমন চন্দ্রাতপ, বেলোয়ারি ঝাড়বাতি, মোমের আলো, সুসজ্জিত হাওদা, মখমলের পর্দা, বেলহাড়ি, ফানুস, নানা ধর্মীয় ছবি ও ফুলমালা

দিয়ে সাজানো হয়। পাটবাড়িগুলি নিজের বিগ্রহদের বিভিন্ন প্রসাধন ও অলংকারে সাজিয়ে নবসজ্জিত রাসমঞ্চে বসান। প্রতিটি হাওদায় বিগ্রহদের ব্যবহারের জন্য রূপোর আতরদানি, পিকদানি, পুষ্পদানি, খড়ম ইত্যাদি থাকে। সেবাইতদের বিশ্বাস তাদের ইষ্টদেবতা রাসলীলার ফাঁকে এইসব উপকরণগুলি ব্যবহার করবেন। বহু রত্নালঙ্কারে আবৃত রাধা-কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ যখন মোমবাতি ও বেলোয়ারি কাঁচের ফানুসে সুসজ্জিত হাওদায় এসে বসেন তখন। গোটা রাসমঞ্চ জুড়ে এক অনির্বচনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তখন সত্যি মনে হয় রূপ যেন অরূপের মাঝে সীমাহীন হয়ে গেছে। ভক্তরা সারারাত ধরে সেই নয়নাভিরাম ভগবানের রূপ দর্শন করে পরম প্রশান্তি লাভ করেন।

রাসের সূচনায় বেজে ওঠে নহবতের সুর। সারাদিন ধরে চলে মঙ্গলারতি, পুজাপাঠ, ভোগরাগ, শয়ন, উত্থান, বৈকালি, সন্ধ্যারতি, রাত্রিকালীন ভোগ, রাত্রিকালীন শয়ন। রাতে শাস্ত্রমতে হয় রাসপূজা। দর্শনার্থীদের সামনে বিগ্রহগুলি উন্মোচিত রাখা হয়। দুদিন ধরে পর্যায়ক্রমে এই পূজার্চনা ও আরতি চলে রাসমঞ্চের সামনে। অস্থায়ী নাট মন্দিরে সারাক্ষণ নাম-সংকীর্তন চলে। পূর্বরাগ, অভিসার, মান, আক্ষেপানুরাগ, ভাবোল্লাস প্রভৃতি পর্যায়ের লীলাকীর্তন ও নামগান চলে। এছাড়া যাত্রা নাটক ও বাংলা গান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে। রাসের সময়ে বিগ্রহকে ছত্রিশটি পদের ভোগ নিবেদন করা হয়। এই ভোগের মধ্যে থাকে পুষ্পান্ন, পোলাও, দই-ভাত, লেবু ভাত, দই চাপাটি, ডাল পুরী, লুচি, কলাপুরী, মোহনপুরী, মিষ্টি ডাল, পালং ডাল, বিভিন্ন ধরনের শাক, শুক্ত, ছানা পালং, কোপ্তা, আলু পনির কোপ্তা, মোচার কোপ্তা, মোচার ঘন্ট, আলুর দম, দই বেগুন, লাউয়ের পায়েস, ছানার রসা, কাঁচা আম-পেঁপে-আমড়া-চালতা-জলপাই নারকেলের চাটনি, গোপালভোগ, লবঙ্গলতিকা, অমৃতকেলিকা, নানারকম সন্দেশ, নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু, ক্ষীর, রাবড়ি, রসগোল্লা, কালাকাঁদ, মালপোয়া, পরমান্ন, ছানার পায়েস, এবং নানা ফলমূল ইত্যাদি থাকে। লক্ষ করার বিষয় ভোগ পাত্রের মধ্যে বিগ্রহের বিশেষ স্বাদগ্রহণের জন্য আদার টুকরো দেওয়া থাকে।

রাসের প্রাচীন ঐতিহ্য বর্তমানে অনেকাংশে অবলুপ্ত হলেও সাবেককালের ঝাড়বাতির অতুলনীয় রোশনাই, শোভাযাত্রার হাওয়াদার দারুতক্ষণের কারুকাজ আর সবচেয়ে মনোহারী রাধারমণ মূর্তির সৌন্দর্য আজও অমলিন। দুইদিন ঘরের রাসের পরে তৃতীয়দিন রাসের শোভাযাত্রা বের হয়। সন্ধ্যায় গোস্বামীবাড়ি বা পাটবাড়িগুলি তাদের বিগ্রহগুলি অনেক অলংকারে সাজিয়ে বেলোয়ারী কাঁচ ও মোমবাতিতে সজ্জিত দাওয়ায় তোলে পথ পরিক্রমার জন্য। এই রাসের শোভাযাত্রার পুরভাগে থাকে বড় গোস্বামী বাড়ির বিগ্রহরা (রাধারমণ রাধিকা, গোপাল রায় শ্রীমতী, রাধাবল্লভ শ্রীমতী)। বিগ্রহেরও প্রথমে থাকে গোস্বামীদের আভিজাত্যের প্রতীক একশো আটটি ঢাকের নাচ। যদিও নানা কারণে এখন শোভাযাত্রার শুরুতে ঢাকের সংখ্যা কমেছে। এরপর থাকে ময়ূরপঙ্খীর গান। ময়ূরাকৃতির একটি চতুর্দোলার উপরে উঠে দুটি পুরুষ বোষ্টম আর বোষ্টমীর বেশে নৃত্য সহ গান করতে থাকে। এই গানগুলি রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক। উল্লেখ্য যে ময়ূরপঙ্খীর গান শান্তিপুরের একটি প্রাচীন লোকসংস্কৃতির উদাহরণ। তারপর শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের মূর্তি এবং একে একে 'রামায়ণ' 'মহাভারত'এর কাহিনী অবলম্বনে মাটির সঙ, রাসলীলার দৃশ্য, গরুর গাড়ির উপর চতুর্দোলায় রাধাকৃষ্ণবেশী দুটি বালক-বালিকার নাচ, ইত্যাদি থাকে। এছাড়াও বর্তমান কালে রাসের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ রাইরাজা থাকে (রাইরাজা সম্পর্কে পরে আলোচনা করছি)। তারপরেই থাকে গোস্বামীদের সেবিত বিগ্রহ। এই সারি বিন্যাসেই সমস্ত গোস্বামী বাড়িগুলির শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো ছাড়াও রাসের শোভাযাত্রায় বৈদ্যুতিক আলো, ইংরেজি বাজনা বৈদ্যুতিক বাদ্যযন্ত্র, পরিবেশ সচেতনতার নানা সঙ, নীতিকথা মূলক বার্তা, মহাপুরুষদের বাণী, দেশবিদেশের নানা পর্যটন স্থানের বৈদ্যুতিন চিত্র ইত্যাদি থাকে। শান্তিপুরের রাসে বিগ্রহ বাড়িগুলি ছাড়াও থাকে অনেক বারোয়ারি ও বনেদি বাড়িগুলির রাসের শোভাযাত্রা।

শান্তিপুরের রাসে রাইরাজা হল একটি অতীত ঐতিহ্য। এই রাইরাজার কোন পৌরাণিক ভিত্তি নেই তবে বিগ্রহ বাড়ির বংশধরদের অভিমত বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ যখন শতকোটি গোপিনীর সঙ্গে রাসলীলা করছিলেন তখন রাসকুঞ্জে ছদ্মবেশী মহাদেবের প্রবেশে তা ভঙ্গ হয়। সেই মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণের রাস অঙ্গন ত্যাগ করার পর কৃষ্ণপাগল গোপিনীরা ভাঙ্গারাসে প্রাণ আনতে ক্ষণেকের জন্য রাইকে রাজ আসনে বসিয়ে ছিলেন। আবার অন্যমতে বলা হয়, বৃন্দাবনে ঝুলন পূর্ণিমার পরের দিন রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের আসনে বসে সখীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। এইদিন সখীরা শ্রীরাধার চরণ স্পর্শ করে পরম ভগবানের আবেশ পেয়েছিলেন। শান্তিপুরের প্রবীণ বাসিন্দা অশোক দত্ত রাইরাজা সম্পর্কে জানিয়েছেন– "একবার শ্রীকৃষ্ণের বাসনা হল শ্রীমতীকে রাজা সাজানোর। শ্রীমতীও অনুরূপ বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন। তার সখীদের কাছে। সেই মত গোপিনীরা নানা আভরণে ও প্রসাধনে রাধিকাকে রাজবেশে সাজিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়েছিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারিবেশে দ্বার পাহারার কাজে নিযুক্ত হলেন।"[১১০] এই ঘটনার অনুসরণে শান্তিপুরের রাইরাজা প্রদর্শিত হয়। ব্রাহ্মণ কিশোরীকে রাজ বেশে সাজিয়ে সিংহাসনে বসানো হয়। পাঠবাড়িগুলি রাইরাজার ক্ষেত্রে কতকগুলি নিয়ম পালন করেন। মেয়েটিকে ব্রাহ্মণ হতে হবে। বয়স হবে বারো বছরের মধ্যে, অরজস্বলা, অবিবাহিতা ও অনিন্দ্য সুন্দরী হবে। একই কিশোরী দ্বিতীয় বার রাইরাজা হতে পারেনা। যথেষ্ট নিষ্ঠাভরে ও সাত্ত্বিকভাবে বিভিন্ন নিয়ম পালন করা হয়। রাইরাজার পরনে থাকে নীল রঙের বেনারসি। পায়ে মল, কোমরে ঝাপটা বিছে, বুকে কাপড়ের কুঁচিতে ময়ূরাকৃতি জড়োয়া ব্রোচ, হাতের পাঞ্জায় পাঁচ আঙুলে আংটি দেওয়া রতনচূড়, কব্জিতে বালা, মানতাসা, ওপরে বাজু, অনন্ত চূড়, গলায় চিক, সাতনরি হার, গজমতি হার, সীতা হার, পুষ্প হার, কানে কানঝুমকো, নাকে নাকটানা, নথ, নলক, কপালে টিকলি, টায়রা, মাথায় রত্নখচিত মুকুট এই সমস্ত প্রকার আভরণে সুসজ্জিত করা হয় রাইরাজাকে। শুধু তাই নয় কৃষ্ণের প্রিয় কদম ফুলের অথবা রজনীগন্ধার মালা পরানো হয় এই জীবন্ত প্রতিমাকে। এই সুসজ্জিত অবস্থায় রাইরাজাকে সাত-আট ঘণ্টা নিশ্চল ভাবে বসে থাকতে হয়। রক্তমাংসের মানবীকে ভগবান হতে হবে তাই রাইরাজার মানসিক প্রস্তুতির জন্য শোভাযাত্রা শুরুর আগে তাঁকে নিয়ে আসা হয় সালংকারা রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের সামনে। কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর রাইরাজাকে তোলা হয় মোমবাতি দেওয়া বেলোয়ারি কাচের ফানুস আর ভেলভেটের পর্দায় সাজানো বাহারি হাওদায়।

ভাঙ্গারাসের শোভাযাত্রা শুরুর সময় এই রাইরাজা ছিল না। শান্তিপুরের বৈষ্ণবীয় রাসের খ্যতি সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার জন্য দূর থেকে দর্শনার্থীরা শান্তিপুরের রাস দেখতে আসতেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় নবদ্বীপে শাক্তরাস শুরু হয়। বড় বড় শক্তি পূজা ও পূজার জাঁকজমকের কারণে শান্তিপুরের রাসে কিছুটা লোকের ভিড় কমতে থাকে। তাই শান্তিপুরে সেইসময় রাসের শোভা বর্ধনের জন্য রাইরাজা সংযুক্ত হয়। বড়গোস্বামীর বাড়ির গোঁসাইরা বলেন আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে বড়গোস্বামী বাড়িতেই প্রথম রাইরাজার প্রচলন শুরু হয়। এইভাবে সমভিব্যাহারে সারারাত রাসের শোভাযাত্রা চলার পর শেষরাতে বিগ্রহরা নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসেন।

রাস তো মিটল, এবার এলো রাসকুঞ্জ ভাঙার পালা। পরদিন সকালে রাসমঞ্চের সামনে। বাউল, পালাকীর্তন, তরজা বা কবিগানের আসর ইত্যদি চলে। এরপর দুপুরবেলা ঢাক বাজিয়ে গোস্বামী বাড়ির উত্তরপুরুষরা বিগ্রহ নিয়ে নির্দিষ্ট ছন্দে ও তালে নাচতে নাচতে মূল মন্দিরে ফিরিয়ে আনেন। এই ঠাকুর নাচ দেখতে বহু লোকের ভিড় জমে। যুগল বিগ্রহের নৃত্য দেখে ভক্তদের আবেগাশ্রু গলিত হয়। এইদিন উপবাসী নারীরা বিগ্রহকে চামরদান করেন এবং বিগ্রহ স্পর্শ করে স্বর্গসুখ লাভ করেন। এইভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে রাসোৎসবের।

শান্তিপুরের রাসের পাশাপাশি নদিয়া জেলার অন্যতম বৈষ্ণব পীঠস্থান নবদ্বীপেও রাসে খুব জাঁক হয়। শান্তিপুরে হয় বৈষ্ণব রাস আর নবদ্বীপে শাক্ত রাস। নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে শাক্ত হওয়ায় নবদ্বীপের রাসে

শক্তি পূজার প্রচলন বেশি। তিনিই রাসে শক্তি পূজা শুরু করেন। কিন্তু দুএকটি শক্তি পূজা ছাড়া শান্তিপুরের রাসোৎসব মূলত ভক্তিরাস। শান্তিপুরের রাসের দুদিন বিভিন্ন মন্দির গুলিতে রাধাকৃষ্ণকে রাসের বেশে সাজানো হয় এবং মন্দির গুলিও আলোতে শান্তিপুরের রাসের উৎসবের আচার, আচারণ, সাজসজ্জা, শোভাযাত্রা সবকিছুতেই বৈষ্ণবীয় ছাপ স্পষ্ট। এই ছাপ নবদ্বীপের রাসে অনেকটা বিরল। নবদ্বীপে শক্তি পূজার অনেকটা ছিল কালী পূজা যেমন নৃত্যকালী, কৃষ্ণকালী, মুক্তকেশীকালী, ভদ্রকালী প্রভৃতি। তাই এখনকার রাস পূর্ণিমাকে পট পূর্ণিমা বলা হয়। তবে শক্তি পূজা ছাড়াও নবদ্বীপের বিভিন্ন মঠ মন্দির গুলিতে বৈষ্ণবীয় প্রথায় রাস অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিগ্রহ বাড়িগুলি যেমন, রাধারমণ বাগ সমাজবাড়ি, ধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির, সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীবাস অঙ্গন, মহাপ্রভুর জন্মস্থান ইত্যাদি শ্রীপাটে মহাসমারোহে বৈষ্ণবীয় মতে রাস পালিত হয়। নবদ্বীপে রাসের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে মূলত এই শ্রীপাট গুলিকে কেন্দ্র করেই। শ্রীপাটে রাসের সময় বিগ্রহের অঙ্গরাগ, মূল মন্দিরের মার্জনা করা; ফুল, নানা উপকরণ, বেলোয়ারী কাঁচ, মোমের আলো, প্রদীপের আলো ইত্যাদি দিয়ে সাজানো: শান্তিপুরের মতো এখানেও বিভিন্ন পর্যায়ে পালাকীর্তন, নামগান ইত্যাদি হয়। রাসে শ্রীপাট গুলির ভোগে বিশেষ বৈচিত্র্য দেখা যায় (বিশেষত গৌড়ীয় মঠগুলিতে মূলত ইসকনে)। এই ভোগের বেশিরভাগটাই চৈতন্যের পছন্দের। বাসুদেব সার্বভৌম চৈতন্যদেবকে নানা পদ দিয়ে ভোগ নিবেদন করেছিলেন। তার মধ্যে ছিল, হলুদ সুগন্ধি ঘিয়ে সিক্ত তিন তণ্ডুল ভাত, দশরকম শাক, নিমতিতা, শুক্তো, ঝোল, লঙ্কা দিয়ে ছানার বড়ার ঝোল, দুধ দিয়ে লাউ, দুধ দিয়ে কুমড়ো, বেশারী, লাবড়া, মোচাঘণ্ট, মোচা-পটল-কুমড়ো-ফুলবড়ি-মানকচু ভাজা, কুমড়ো বড়ির ঝোল, অমৃত গুটিকা, আমেরখণ্ড, চন্দ্রপুলি, চন্দৰকান্তি, এছাড়া -

> "মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
> ক্ষীরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট।।
> কাঁজিবড়া দুগ্ধচিতা দুগ্ধলকলকী।
> আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি।।
> ঘৃত সিক্ত পরমান্ন মৃৎ কুণ্ডিকা ভরি।
> চাঁপাকলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাহা ধরি।।
>
> রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।"[১১১]

এই ভোগগুলি রাসের সময় নিবেদন করা হয়। রাসের দিন রাত্রিতে বিভিন্ন মিষ্টি ও ফল নানা শুকনো জিনিস দিয়ে পাখী ভোগ দেওয়া হয়। সকল ভক্ত এই ভোগের প্রসাদ পান। রাসের সময় এখানে দেশ-বিদেশের নানা ভক্ত আসেন। শ্রীপাটগুলোতে সেই ভক্তদের থাকা ও খাওয়ার যথেষ্ট সুব্যবস্থা আছে এবং সেই ব্যবস্থা নিরাপত্তার চাদরে মোড়া। রাসের দিনগুলিতে বিভিন্ন শ্রীপাটে এবং গোটা নবদ্বীপ শহরে প্রশাসনিক নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা থাকে। এক্ষেত্রে পাটবাড়ির সদস্যদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপের রাসের শোভাযাত্রায় শান্তিপুরের মতো বৈচিত্র নেই। বৈদুতিক আলো ও আধুনিক বাজনা সহযোগে রাসের শোভাযাত্রা হয়। সব মিলিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনস্রোতে উৎসব খুশি আনন্দ ও গতির ঢেউ বয়ে নিয়ে আসে। রাসোৎসব শান্তিপুর তথা নদিয়াবাসীর জীবনে খুশির জোয়ার নিয়ে আসে। চারদিন পরে আবার একবছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষা। হয়তো প্রতীক্ষা নয় একটু একটু করে আবার প্রস্তুতি নেওয়া। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রস বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্ব। তাদের মতে রসই সর্বপ্রধান। যার মনে রসের অনুরাগ জন্মাবে তাঁর দেহমন কৃষ্ণপ্রেমে স্বতঃসিদ্ধ হবে। শান্তিপুরের বৈষ্ণব পাটবাড়িগুলি পঞ্চরস সাধনার দ্বারা বিগ্রহের সেবা করেন। যার স্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায় রাসোৎসবের দিনগুলিতে। তাদের কাছে জগৎ ঈশ্বরময় কার্যকারণ সবই ঈশ্বর তথা শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই ঘটে। শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশধররা দ্বার পরিগ্রহণে বিশ্বাসী কারণ অদ্বৈত প্রভুও বিবাহ

করেছিলেন। তাঁরা যুগল সাধনার দ্বারা বিগ্রহসেবা করেন। শ্রীপাট গুলিতে একটু লক্ষ করলেই দেখা যায়, সেবাইতরা বিগ্রহকে নিজেদের পরিবারের একজন সদস্য ভেবে সেবা-পূজা করেন। এই আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা দেখে মনে হয় এখানে ভক্ত ও ভগবান মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আর এই ভালোবাসার জোয়ার রাসোৎসবে শান্তিপুরে আগত সমস্ত মানুষকে ছুঁয়ে যায়। মনে রাখতে হবে পাটবাড়ি গুলি দীর্ঘদিন ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করলেও ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে তাঁরা একটা বৃহত্তর সমাজের মানুষের কাছে পৌঁছে গেছেন। আর সেই সমাজে হিন্দু-মুসলিম, ব্রাহ্মণশূদ্র-এর কোনো ভেদাভেদ নেই।

রাসের সময় নদিয়া হয়ে ওঠে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মিলনক্ষেত্র। নবদ্বীপের মত শান্তিপুরের বড়গোস্বামী বাড়িও বহিরাগত ভক্তদের জন্য আশ্রয় ও খাদ্যের সুব্যবস্থা করেন। এই সময় নবদ্বীপে শান্তিপুরে অনেক সাধুসন্তদের আনাগোনা হয়। নানা স্থানের সাত্বিক বৈষ্ণবরা রাসে এখানে হাজির হন। সামগ্রিকভাবে নদিয়া বাসীদের সঙ্গে দেশবিদেশের বিভিন্ন মানুষের একটা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। রাসকে কেন্দ্র করে দুই জায়গায় বিরাট মেলা বসে। যা মানুষের রুটি রুজির জায়গা। বিভিন্ন জায়গা থেকে পসরা সাজিয়ে মানুষ এখানে আসে। আর তাঁরা এখান থেকে তাঁতের শাড়ি ও অন্যান্য জিনিষ নিয়ে যায়। রাসে শান্তিপুরের গণিকাপল্লীর জমজমাটি আরও বেড়ে যায়। চন্দননগর, চুঁচুড়া, গুপ্তিপাড়া, কালনা, কৃষ্ণনগর থেকে অনেক গণিকা আসে কিছু অর্থ উপার্জনের আশায়। শুধু তাই নয় এর সঙ্গে মদমত্ততাও চলে। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য রাসের সঙ্গে লাম্পট্যের যোগাযোগের কথা বলেছেন।[১১২]

শুধু উৎসব আনন্দ নয় নদিয়ার পাটবাড়িগুলো বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। শান্তিপুরে বড়গোস্বামী বাড়ির বর্তমান বংশধর সত্যনারায়ণ গোস্বামী সমাজের প্রতিচ্ছবি (১৯৮৪ সালে প্রথম প্রকাশ) নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি কাগজে বিভিন্ন সমাজের ছবি তুলে ধরেন। এছাড়া এখানে পাটবাড়ি ও বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে নানা লেখালেখি হয়। সমাজের প্রতিচ্ছবিতে রাজনৈতিক দুর্নীতি, সামাজিক বৈষম্য, মানুষের বঞ্চনার ছবি, শান্তিপুর ও তার আশেপাশের অঞ্চলের মানুষের সুখ দুঃখের নানা কথা জনসমক্ষে এনে জনসচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে। এখানে নানা সৃজনশীল লেখা স্থান পায় আবার অজানা অনেক প্রতিভা প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। এই পাটবাড়ির অন্য এক সদস্য রামকৃষ্ণ গোস্বামী 'চিত্রভানু' (১৯৫৬ সালে প্রথম প্রকাশিত) নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এখানেও সমাজের নান সমস্যা ও বৈষ্ণব ধর্মের আলোচনা করে প্রবন্ধ লেখা হত। 'চিত্রভানু' বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে। সমাজের প্রতিচ্ছবি রাস, দোল, রাজনীতি ও পরিবেশ নিয়ে বিশেষ বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করে। সত্যনারায়ণ গোস্বামী সাংবাদিকতা সূত্রে বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেন। যেমন – পরিবেশ দূষণ, প্রকৃতির বিপন্নতা, রাজনীতির কদর্যতা, ধর্মের নামে কদাচার প্রভৃতি। এই শ্রীপাটে দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে। রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়। এটি সম্পূর্ণভাবেই সত্যনারায়ণ বাবুর উদ্যোগে। কলকাতা ও অন্যান্য নানা জায়গা হতে অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ এসে যোগ দেন এই অনুষ্ঠানে। নানা প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এখানে। রক্তদান শিবির, শান্তিপুর ও তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের খুঁজে বের করে তাঁদের আর্থিক সাহায্য ও বইপত্র দিয়ে উৎসাহী করা; খেলাধুলায় ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করা প্রভৃতি সামাজিক কাজে মুখ্য ভূমিকা নেন সত্যনারায়ণ গোস্বামী। শান্তিপুরের অন্য এক শ্রীপাটে চাকফের গোস্বামী বাড়ির বর্তমান বংশধররা রাসে অন্তত পাঁচশোজন দরিদ্র মানুষকে খাওয়ান ও বস্ত্র দান করেন এবং প্রায় একশজন ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনার সামগ্রী দান করেন। শান্তিপুরের শ্রীপাটগুলির যে শিষ্যসম্প্রদায় আছে সেখানেও পাটবাড়ির প্রভাব যথেষ্ট। এই শিষ্যরা ব্রাহ্মণকায়স্থ-মাহিষ্য-শূদ্র-তন্তুবায় বিভিন্ন শ্রেণীর। দীক্ষা গ্রহণের পর অনেকের মধ্যে মানবিক পরিবর্তন দেখা যায়।[১১৩]

সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে নবদ্বীপের পাটবাড়ির অবদান অবিস্মরণীয়। নবদ্বীপ ছিল প্রাচীন ভারতের পাঠশালা। ন্যায়দর্শন, জ্যোতিষশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, তন্ত্র, সংস্কৃত ইত্যাদি চর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র। শুধু তাই নয় এই নবদ্বীপের কারণেই বঙ্গভাষার সৃষ্টি ও পুষ্টি নদিয়ায়। নবদ্বীপরাজের সভাপণ্ডিত সুচাগ্রবুদ্ধি ব্রজনাথ বিদ্যারত্নই নবদ্বীপে নটুয়া গৌরের প্রতিষ্ঠা করেন। তর্কশাস্ত্রে যার হদিশ মেলে না দোর্দণ্ডপ্রতাপ পণ্ডিত ব্রজনাথ তারই সন্ধান পেয়েছিলেন ভক্তিতে। নবদ্বীপে হরিবোল কুঠিরের অন্যতম বংশধর শ্রী হরিদাস দাস ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব। বৈষ্ণব সাহিত্য জগতে তার অবদান অনস্বীকার্য। তার রচিত গ্রন্থগুলি হল; চারখণ্ডে 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন', 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য', 'শ্রীশ্রীনিবাসচর্য-গ্রন্থমালা', 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-তীর্থ' বা 'শ্রীপাট-বিবরণী' প্রভৃতি। তিনি অনেক বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করেন, তার মধ্যে 'উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ', 'হরিভক্তবিলাসসার', 'বৈষ্ণবানন্দিনী', 'ভাবনাসারসংগ্রহ', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'গোবিন্দ-বল্লভ-নাটক', 'শীর্ষবোধ-ব্যকরণ', 'আর্যশতক' ইত্যাদি। 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান' বৈষ্ণব জগতের অভিধানরূপে স্বীকৃত। 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন'এ সমস্ত মহান বৈষ্ণবদের জীবনী বিবৃত হয়েছে। এছাড়া সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের মৌলিক আলোচনা ভারতের নানা স্থানের শ্রীপাট ও তীর্থের বিবরণ তিনি নিজের গ্রন্থে সুচারু ভাবে করেছেন। হরিদাসের বর্তমান বংশধরেরা এই গ্রন্থগুলিকে এখন আগ্রহী পাঠকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছেন।[১১৪]

প্রাচীন মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীপাটে অন্যতম সেবাইত শ্রীমহাপ্রভু দাস বাবাজী 'শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঠিক জন্মস্থান' নামে একটি বই লিখেছেন। তিনি নরহরি চক্রবর্তীর 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের সহমতে বলেছেন প্রাচীন মায়াপুরেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান। কিন্তু প্রখ্যাত গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী যথাযথ প্রমাণ দিয়ে বলেছেন নবদ্বীপই চৈতন্যের আসল জন্মস্থান।[১১৫] এই শ্রীপাট থেকে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণগ্রন্থ বিক্রি করা হয়। রাধারমণ বাগ সমাজবাড়ি, সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির প্রভৃতি শ্রীপাটের নিজেস্ব গ্রন্থমন্দির আছে। সেখানে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'চৈতন্যভাগবত', 'গীতগোবিন্দ' ছাড়াও 'শ্রীশ্রীজগদীশ চরিত্র বিজয়, 'বৈষ্ণব-দিগদশনি'র মতো অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও পাওয়া যায়। এইসব শ্রীপাটের শিষ্যবর্গরা দীক্ষা গ্রহণের পর বৈষ্ণব প্রভাবে সৎ জীবন যাপন করেতে সচেষ্ট হয়েছে। কেউ কেউ সাংসারিক জীবনে সুখ সমৃদ্ধি, কেই ব্যবসায় উন্নতি ইত্যাদি কারণে দীক্ষা নিলেও তাঁরা মোটামুটিভাবে বৈষ্ণববাচিত জীবনযাপন করার সুযোগ পান। এই শ্রীপাট গুলিতে সামান্য অর্থের বিনিময়ে নিত্য অন্ন প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনেক দুঃস্থ অসহায় মানুষ শ্রীপাটগুলিতে থেকে ও খেয়ে নিয়মিত জীবনযাপন করেন। এছাড়া শ্রীপাটগুলির স্নিগ্ধ নির্জনতা চরম পরিতৃপ্তির আস্বাদ দেয়।

তথ্যসূত্র :

১। 'অদ্বৈতমঙ্গল'; হরিচরণ দাস; সম্পাদনা- রবীন্দ্রনাথ মাইতি; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়; বর্ধমান; প্রথম প্রকাশ ২৫ এ বৈশাখ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ৮৭-৮৮।

২। 'নদিয়ার ইতিহাস' (প্রথম পর্ব): কুমুদনাথ মল্লিক, সৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফী, হরিদাস নন্দী; সংগ্রহ ও সম্পাদনা - কমল চৌধুরী; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩; পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৫ সাল; পৃষ্ঠা -৫০১ [অতঃপর বইটি নদিয়ার ইতিহাস (প্রথম পর্ব) নামে উল্লিখিত হবে।]

৩। 'যশোর-খুলনার ইতিহাস' (১ম খণ্ড); সতীশচন্দ্র মিত্র; চক্রবর্তী চাটার্জী এন্ড কোং, কলিকাতা; ১৩২১ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা- ১৪৩-১৪৪।

৪। 'শান্তিপুর পরিচয়' (২য় ভাগ); কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য; ১/১৪, রূপচাঁদ মুখার্জী লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা; ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা ২ [অতঃপর বইটি 'শান্তিপুর পরিচয়' (২য় ভাগ) নামে উল্লিখিত হবে।]

৫। 'নদিয়ার ইতিহাস' (প্রথম পর্ব); পৃষ্ঠা-৫০২।

৬। 'শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ': ঈশান নাগর; সম্পাদনা - সতীশচন্দ্র মিত্র; নবায়িত মানসী সংস্করণের সম্পাদনা - শ্যামাপদ মণ্ডল; মানসী, কলিকাতা - ১২; সংস্করণ পৌষ ১৪২১ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ৪৫ - ৪৬ [অতঃপর বইটি শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ নামে উল্লিখিত হবে।]

৭। 'নদিয়ার ইতিহাস' (প্রথম পর্ব): পৃষ্ঠা- ৫০৩।

৮। 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা অষ্টাদশ ভাগ' (ত্রৈমাসিক); সম্পাদক – নগেন্দ্রনাথ বসু; প্রবন্ধ – 'পাটপর্যটন ও শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয়'; অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী; বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ-মন্দির, কলকাতা- ৭; ১৩১৮ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা- ১০৭।

৯। 'BENGAL PAST & PRESENT' (VOL - III): Journal of The Calcutta Historical Society; A Short History of Old Fort William in Bengal; C.R. Wilson; January-June, 1938, Page - 143.

১০। 'হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম': দীনেশচন্দ্র সেন; নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ; দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৫ সাল; পৃষ্ঠা- ৪৩ [অতঃপর বইটি হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম নামে উল্লিখিত হবে।]

১১। 'দশদিশি'; বিষয় : শ্রীচৈতন্য (২০০৯); সম্পাদনা - অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়; পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০১৬ সাল; প্রবন্ধ - চৈতন্য আবাহন ও বিসর্জন: প্রাবন্ধিক- পূর্ণেন্দুনাথ নাথ; কলকাতা ৭; পৃষ্ঠা- ১২১ - ১২২।

১২। 'শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ': পৃষ্ঠা- ৫৫।

১৩। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', কৃষ্ণদাস কবিরাজ; সম্পাদনা - সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রণ; চৈত্র ১৪১৯ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা- ১৪ [অতঃপর বইটি 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' নামে উল্লিখিত হবে।]

১৪। 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম' রমাকান্ত চক্রবর্তী; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৩; পৃষ্ঠা- ৭৫ [অতঃপর বইটি 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম' নামে উল্লিখিত হবে।]

১৫। 'শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ' পৃষ্ঠা - ২৪।

১৬। 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম' পৃষ্ঠা - ৭৫।

১৭। 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান'; বিমানবিহারী মজুমদার; সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ৬ জানুয়ারি ২০০৬ সাল; পৃষ্ঠা- ৪০২-৪৩৫।

১৮। 'শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ' পৃষ্ঠা - ২৪।

১৯। তদেব: পৃষ্ঠা – ১০১।

২০। 'ইতিহাস অনুসন্ধান' (২৫ খণ্ড); প্রবন্ধ- বাঙালির অন্য ইতিহাস : সিতাগুণকদম্ব (সীতাগুণদ) সীতাচরিত্র; প্রাবন্ধিক- অপর্ণা রায়; পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা ২০; ২০১১; পৃষ্ঠা- ৭৮১।

২১। 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন'; হরিদাস দাস; নিবেদন - মিহিরকুমার রায়; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা- ৬; প্রথম সংস্করণ ১৪১২ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ১৩৬ [অতঃপর বইটি শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন নামে উল্লিখিত হবে।]

২২। 'সীতাচরিত্র'; লোকনাথ সংখ্যা; পুথিকৰম - ৯৮২, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, কলকাতা।

২৩। 'শ্রীশ্রী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন': পৃষ্ঠা - ১৩৬।

২৪। তদেব; পৃষ্ঠা - ১৩৭।

২৫। তদেব: পৃষ্ঠা - ১৬৯।

২৬। 'শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ' পৃষ্ঠা - ২১৭ - ২১৮

২৭। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', পৃষ্ঠা- ৭৫।

২৮। 'সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম'; পরিতোষ দাস; ফার্মা কে, এল, এম, প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা; ১৯৭৮ সাল; পৃষ্ঠা- ৪৭-৪৯।

২৯। 'শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ' পৃষ্ঠা - ৫৬ - ৬৮।

৩০। 'বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি', ষষ্ঠিচরণ ভট্টাচার্য, পুনশ্চ, কলকাতা ৯; বইমেলা, ২০০১; পৃষ্ঠা - ৩৭৭। [অতঃপর বইটি 'বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি' নামে উল্লিখিত হবে।]

৩১। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৭৮।

৩২। 'শান্তিপুর পরিচয়' (২য় ভাগ); পৃষ্ঠা - ৬৭২।

৩৩। 'পায়ে পায়ে নদিয়া' জেলা ভ্রমণ গ্রন্থমালা/(৫); রত্না ভট্টাচার্য, শক্তিপদ ভট্টাচার্য, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা - ৭৩; মাঘ ১৪২০ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ৬৬ - ৬৭ [অতঃপর বইটি 'পায়ে পায়ে নদিয়া' নামে উল্লিখিত হবে।]

৩৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৯।

৩৫। তদেব; পৃষ্ঠা - ৭৩।

৩৬। 'শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ': পৃষ্ঠা - ২৮৯ - ২৯০।

৩৭। 'পায়ে পায়ে নদিয়া': পৃষ্ঠা - ৬৯ - ৭০।

৩৮। 'নদিয়ার ইতিহাস' (দ্বিতীয় পর্ব): দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, নবীনচন্দ্র সেন; সংগ্রহ ও সম্পাদনা - কমল চৌধুরী; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৭৩; এপ্রিল ২০১২; পৃষ্ঠা – ৪২৯ [অতঃপর বইটি 'নদিয়ার ইতিহাস' (দ্বিতীয় পর্ব) নামে উল্লিখিত হবে।] ৩৯। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (দৈনিক); সম্পাদক – অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়; ১৫ জুন, ২০১৬ সাল প্রবন্ধ – রাজার দান প্রত্যাখ্যান করলেন কুমুদানন্দ, প্রাবন্ধিক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়; ১৫ জুন, ২০১৬ সাল, কলকাতা - ১ [অতঃপর পত্রিকাটি আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক); নামে উল্লিখিত হবে।]

৪০। তদেব

৪১। 'নদিয়ার ইতিহাস' (প্রথম পর্ব)পৃষ্ঠা: - ২৭৩

৪২। 'IMPERIAL GAZETTEER OF INDIA' (Vol - XVIII): Journal of The Calcutta Historical Society; A Short History Of Old Fort William In Bengal.C.R.Wilson, calautta, 1938, page- 273.

৪৩। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও সমকালীন নবদ্বীপ'; যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী; নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নদীয়া; সেপ্টেম্বর ২০০৪ সাল; পৃষ্ঠা - ২ [অতঃপর বইটি শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব ও সমকালীন নবদ্বীপ নামে উল্লিখিত হবে।]

৪৪। 'নদিয়ার ইতিহাস' (প্রথম পর্ব): পৃষ্ঠা - ২৭৪ - ২৭৫।

৪৫। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও সমকালীন নবদ্বীপ'; পৃষ্ঠা - ১৩।

৪৬। 'হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম'; পৃষ্ঠা - ১৩।

৪৭। তদেব: পৃষ্ঠা - ৩০।

৪৮। 'চৈতন্যভাগবত', বৃন্দাবন দাস; সম্পাদনা - সুকুমার সেন; সাহিত্য আকাদেমি, কলকাতা – ২৫; চতুর্থ মুদ্রণ ২০১১; পৃষ্ঠা- ৪০ [অতঃপর বইটি চৈতন্যভাগবত নামে উল্লিখিত হবে]

৪৯। ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’, পৃষ্ঠা- ৯২।

৫০। ‘চৈতন্যভাগবত’ ; পৃষ্ঠা - ২৩১-২৩২।

৫১। ‘হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম’ ; পৃষ্ঠা - ১৬।

৫২। ‘চৈতন্যভাগবত’ ; পৃষ্ঠা- ২৯০।

৫৩। ‘অবতার থেকে মানুষ’ ; নিরঞ্জন ধর ; রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭৩ ; জুন ২০১৩ ; পৃষ্ঠা- ২২।

৫৪। ‘চৈতন্যমঙ্গল’ ; জয়ানন্দ ; সম্পাদক- সুখময় মুখোপাধ্যায়, সুমঙ্গল রাণা ; গবেষক প্রকাশন বিভাগ বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ; সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সাল ; পৃষ্ঠা- ৭৭।

৫৫। ‘বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি’ : পৃষ্ঠা- ৩৮৮-৩৮৯।

৫৬। ‘চৈতন্যভাগবত’ ; পৃষ্ঠা- ৪৮

৫৭। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ (দৈনিক) ; ১১ জুন ২০১৬ ; প্রবন্ধ – জামাতা মহাপ্রভুর বরণে বাজল ঢাক ; দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৮। ‘বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি’ : পৃষ্ঠা - ৩৯৫।

৫৯। ‘পায়ে পায়ে নদিয়া’ : পৃষ্ঠা - ৮৩।

৬০। ‘শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ বা শ্রীপাট-বিবরণী’ : হরিদাস দাস ; হরিবোল কুঠীর, নবদ্বীপ ; দ্বিতীয় সংস্করণ, ৫০১ গৌরাব্দ ; পৃষ্ঠা- ২৩ [অতঃপর বইটি শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-তীর্থ বা শ্রীপাট-বিবরণী নামে উল্লিখিত হবে।]

৬১। ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ ; পৃষ্ঠা- ৯৯।

৬২। ‘শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন’ ; পৃষ্ঠা- ২৬৬

৬৩। ‘শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত’ ; পৃষ্ঠা-২৬৭।

৬৪। ‘চৈতন্যভাগবত’ ; পৃষ্ঠা-২৩৮।

৬৫। ‘শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন’ ; পৃষ্ঠা - ১৫৯।

৬৬। ‘গৌরাঙ্গ পরিজন’ ; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ; কলকাতা - ৭৩ ; ষষ্ঠ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২০ বঙ্গাব্দ ; পৃষ্ঠা- ১২৮ [অতঃপর বইটি গৌরাঙ্গ পরিজন নামে উল্লিখিত হবে।]

৬৭। ‘চৈতন্যভাগবত’ ; পৃষ্ঠা- ১৭৮।

৬৮। ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ ; পৃষ্ঠা- ৬৫।

৬৯। ‘চৈতন্যভাগবত’ ; পৃষ্ঠা- ২৪২।

৭০। ‘নদিয়ার ইতিহাস’ (দ্বিতীয় পর্ব) ; পৃষ্ঠা - ১৭৭–১৮০।

৭১। তদেব ; পৃষ্ঠা- ৪৩২

৭২। ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ (তৃতীয় খণ্ড) ; বিনয় ঘোষ প্রকাশ ভবন, কলকাতা - ৭৩ ; ষষ্ঠ মুদ্রণ ; সেপ্টেম্বর ২০১৩ সাল, পৃষ্ঠা- ১১৮।

৭৩। ‘নদিয়ার ইতিহাস’ (প্রথম পর্ব) : পৃষ্ঠা- ৫২২।

৭৪। তদেব ; পৃষ্ঠা – ৫৪৬ - ৫৪৭।

৭৫। ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ ; পৃষ্ঠা- ৭১।

৭৬। ‘শ্রীজগদীশ চরিত্রবিজয়’ ; আনন্দ দাস ; সম্পাদনা - কিশোরী দাস বাবাজী, চৈতন্যডোবা উত্তর ২৪ পরগণা ; প্রথম সংস্করণ, ১লা মাঘ ১৪০২ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা-৬-৭

৭৭। ‘গৌরাঙ্গ পরিজন’ ; পৃষ্ঠা- ২৯১।

৭৮। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', পৃষ্ঠা- ৪২১ - ৪২২।

৭৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ৭১।

৮০। 'চৈতন্যভাগবত'; পৃষ্ঠা - ৭।

৮১। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০

৮২। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', পৃষ্ঠা - ৬৫।

৮৩। 'চৈতন্যভাগবত'; পৃষ্ঠা - ১১৫।

৮৪। 'চৈতন্যপরিকর'; রবীন্দ্রনাথ মাইতি; বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা; ১৯৬২ সাল; পৃষ্ঠা - ৪৪০

৮৫। 'বাঙালির ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি'; রমাকান্ত চক্রবর্তী; সুবর্ণরেখা, কলকাতা-৯; প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০২; পৃষ্ঠা- ৪৬-৪৭ [অতঃপর বইটি বাঙালির ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি নামে উল্লিখিত হবে।]

৮৬। 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম'; পৃষ্ঠা-৮৩।

৮৭। 'Vaisnavism in Bengal'(1486-1900);Ramakanta Chakravarti; Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta- 6; First Published, October, 1985. Page – 257 - 274.

৮৮। 'বাঙালির ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি'; পৃষ্ঠা – ৪৮-৪৯।

৮৯। 'শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ'; জীমূতবাহন রায়, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি, শান্তিনিকেতন; জুলাই ১৯৮৪; পৃষ্ঠা ২১৫-২২৫।

৯০। 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব'; গৌরগুণানন্দ ঠাকুর; শ্রীযশোদানন্দ ঠাকুর, শ্রীখণ্ড (বর্ধমান); দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৪শে কার্তিক ১৩৬১ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ১৭৯-১৯৪।

৯১। 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর'; নরহরি চক্রবর্তী; সম্পাদক - নন্দলাল বিদ্যাসাগর; গৌড়ীয় মিশন, কলিকাতা – ৬; ২১ ডিসেম্বর ১৯৬০, পৃষ্ঠা – ৪০৭-৪০৮।

৯২। 'Vaisnavism in Bengal' (1486-1900); পৃষ্ঠা -23ff

৯৩। 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম' পৃষ্ঠা – ৮৮।

৯৪। 'প্রেমবিলাস'; নিত্যানন্দ দাস; প্রকাশক - রামদেব মিশ্র; বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা – ৩১৪।

৯৫। 'বাঙালির ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি'; পৃষ্ঠা – ৫৩।

৯৬। 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি'; গোলাম মুরশিদ; অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা - ১১০০; সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৪; পৃষ্ঠা –৮২-৮৩।

৯৭। 'নদিয়ার ইতিহাস' (প্রথম পর্ব); পৃষ্ঠা – ৪৩৮।

৯৮। তদেব: পৃষ্ঠা - ৪৪০।

৯৯। ক্ষেত্রসমীক্ষা: সাক্ষাৎকার দাতা - সত্যনারায়ণ গোস্বামী; বয়স- ৪০; শিক্ষাগত যোগ্যতা– গ্র্যাজুয়েট; ঠিকানা-শান্তিপুর বড় গোস্বামী বাড়ি, নদিয়া; তারিখ ১৫.০২. ২০১৪; সাক্ষাৎকার গ্রহিতা - গবেষক নিজে।

১০০। 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান', হরিদাস দাস; সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা-০৭; পুনর্মুদ্রণ ১লা বৈশাখ ১৪২১ সাল; পৃষ্ঠা- ৬৫৭।

১০১। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, কলকাতা- ১৩; দ্বিতীয় মুদ্রন জুন ২০১১; পৃষ্ঠা- ১৪৮।

১০২। তদেব: পৃষ্ঠা- ১৮৩-১৮৭।

১০৩। ‘ওভারল্যান্ড’; সম্পাদক- অজিত কুমার ভাওয়াল; ৩১ অক্টোবর ১৯৯০; প্রবন্ধ-শক্তি ও ভক্তি এক মহা মিলনোৎসব নদীয়ার রাস সত্যনারায়ণ গোস্বামী; ১৫ লোয়ার রেঞ্জ, কলকাতা ১৭।

১০৪। ‘শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ’ ঈশান নাগর; সম্পাদনা : সতীশচন্দ্র মিত্র; নবায়িত মানসী সম্পাদনা শ্যামপদ মণ্ডল; মানসী, কলকাতা ১২; প্রথম মানসী সংস্করণ পৌষ ১৪২১ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা-৩৩।

১০৫। ‘অদ্বৈতমঙ্গল’ হরিচরণ দাস; সম্পাদনা- রবীন্দ্রনাথ মাইতি; বর্ধমান বিশ্ব বিদ্যালয়, বর্ধমান; প্রথম প্রকাশ ২৫এ বৈশাখ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা- ২০।

১০৬। ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’(তৃতীয় খণ্ড), বিনয় ঘোষ; প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩; ষষ্ঠ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১৩; পৃষ্ঠা- ১০৭।

১০৭। ‘শান্তিপুর পরিচয়’ (দ্বিতীয় ভাগ) কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য; কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২৫২-২৭৬।

১০৮। ‘নদীয়ার ইতিহাস’ (দ্বিতীয় পর্ব) দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় ও নবীন চন্দ্র সেন; সংগ্রহ ও সম্পাদনা- কমল চৌধুরী; দে’জ পাবলিশিং কলকাতা ৭৩; প্রথম দে’জ প্রকাশ, এপ্রিল ২০১২ সাল; পৃষ্ঠা-৪২৮।

১০৯। ‘উৎসব মেলার ইতিহাস’; সুধীর চক্রবর্তী; পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯; অক্টোবর ২০০৪; পৃষ্ঠা-১৩৩।

১১০। ক্ষেত্রসমীক্ষা: সাক্ষাৎকার দাতা - অশোক দত্ত; বয়স- ৭৪; শিক্ষাগত যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট; ঠিকানা- শান্তিপুর, নদিয়া; তারিখ -০৩.১২.২০১৪; সাক্ষাৎকার গ্রহিতা – গবেষক নিজে।

১১১। ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ কৃষ্ণদাস কবিরাজ; সম্পাদনা- সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯; দশম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৯ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা ২২৫।

১১২। ‘শান্তিপুর পরিচয়’ (১ম ভাগ); কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য; ১/১৪, রূপচাঁদ মুখার্জী লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা; ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ২৪৯।

১১৩। ‘নদিয়ার ইতিহাস’ (প্রথম পর্ব); পৃষ্ঠা – ৩৮৩।

১১৪। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ (দৈনিক); প্রবন্ধ - নাটুয়া গৌরের দেড়শো বছর; প্রাবন্ধিক দেবাশিস বন্দোপাধ্যায়; ৫ই জুন, ২০১৬।

১১৫। ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও সমকালীন নবদ্বীপ’; পৃষ্ঠা - ১৯।

তৃতীয় অধ্যায়

বর্ধমান জেলার পাটবাড়ি

রাঢ়দেশের মণিখণ্ড হল বর্ধমান জেলা। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত আজকের বর্ধমান জেলা অতীতে শুধু একটি জেলা ছিল না। অতীতে বৃহৎ পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক খণ্ড ছিল বর্ধমান। সুকুমার সেন লিখেছেন –

> "... ৪০০ খ্রিস্টাব্দ দিকে বাঙলাদেশ দুটি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত ছিল- উত্তর ও দক্ষিণ। খণ্ড দুটির মধ্যেকার ভেদ রেখা ছিল ভাগীরথী। উত্তর প্রদেশের প্রধান নগর পুণ্ড্রবর্ধন থেকে সেখানকার প্রশাসনিক নাম রাখা হয়েছিল বর্ধমান-ভুক্তি। (এ নগর এখনকার বর্ধমান নয়) ইতিহাস গ্রাহ্য দলিল পত্রে এই বর্ধমান ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া গেল প্রথম ষষ্ঠ শতাব্দের একটি ভুমিদান পত্রে।"[১]

শুধু তাই নয়, দ্বাদশ শতাব্দীতে আরও দুটি ভুক্তির কথা জানা যায়। যথা- কঙ্কগ্রাম ভুক্তি ও দণ্ড ভুক্তি। আগে প্রদেশকে ভুক্তি বলা হত। গুপ্ত রাজাদের আমলে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে চোদ্দোটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটি ছিল বর্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজা গোপচন্দ্রের মগ্নসারুল লিপি, দশম শতাব্দীর ইর্দা লিপি বা ইর্দা তাম্রশাসন এবং বল্লাল সেনের নৈহাটি ও গোবিন্দপুর তাম্রশাসন-এ এই বর্ধমান ভুক্তির কথা পাওয়া যায়।[২]

রাঢ় অনেক প্রাচীন জনপদ। প্রখ্যাত গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী লিখেছেন –

> "শিলালিপি, তাম্রশাসন, পৌরাণিক সাহিত্য, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, বৌদ্ধ-জৈন গ্রন্থ ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উল্লিখিত রাঢ় জনপদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যালোচনার দ্বারা এতদঞ্চলের মানব সমাজের বসতি ইতিহাসের প্রাচীনত্বের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।"[৩]

প্রাকৃত ভাষার 'রাল' বা 'লাল' শব্দ থেকে সংস্কৃত 'রাঢ়' শব্দটি এসেছে। বাংলা ভাষায় 'রাঢ়' শব্দের প্রকৃত কোনো অর্থ নেই।[৪] উড়িয়া ভাষায় 'রাঢ়' মানে বর্বর ও নিষ্ঠুর।[৫] ভৌগোলিক সীমানা অনুযায়ী রাঢ় অঞ্চলের পরিধি সুবৃহৎ। বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি, সিংভূম, মানভূম, হাজারিবাগ, ধানবাদ, সাঁওতাল পরগণাসহ, ভাগলপুর, রাঁচি, পালামৌ জেলার পূর্বাংশ এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চল নিয়ে এই রাঢ় জনপদ গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীনতম জৈন ধর্মশাস্ত্র আয়ারঙ্গ সুত্ত বা আচারঙ্গ সূত্র এ প্রাচীন রাঢ় জনপদের উল্লেখ আছে। ২৪ তম জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর শিষ্যসহ দুর্গম রাঢ় জনপদে ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু এই অঞ্চলের নিষ্ঠুর ও রূঢ় প্রকৃতির লোকেরা তাঁদের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন –

> "আচারঙ্গ সূত্রে' রাঢ়া-জনপদের দুইটি বিভাগ : বজ্জ বা বজ্রভূমি, সুম্ভ বা সুম্ভভূমি। বজ্জ ভূমিতে জৈন সন্ন্যাসীদের অপরিষ্কৃত নিকৃষ্ট খাদ্য খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল।"[৬]

এই সুভূমির অন্তর্গত হল বর্ধমান। খ্রিস্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে রাঢ়দেশ উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এইসময় উৎকীর্ণ রাজা রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালাই লিপিতে উত্তম লাঢ়ম (উত্তর রাঢ়)

ও তক্রণ লাড়ম (দক্ষিণ রাঢ়) এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭] নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, বর্ধমানের দক্ষিণাংশের অধিকাংশ অঞ্চলই এই দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত।[৮]

রাঢ় অঞ্চলের মধ্যমণি বর্ধমানের নামকরণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। সেগুলো যথাক্রমে –

প্রথমত:- অনেকের মতে, প্রাক বৌদ্ধযুগে একসময় বর্ধমানের নাম ছিল 'অস্বিন নগর'। সংস্কৃত 'আস্তিকনগর'-এর পালি ভাষায় পরিবর্তিত রূপ হল অস্বিন নগর। অনুমান করা হয়, দ্বাপর যুগের আস্তিক মুনির সাধনাস্থল ছিল এই অঞ্চল। বর্ধমান মহাবীর ধর্মপ্রচার করতে এসে অস্বিননগরে কিছু ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। মহাবীরের সেই শিষ্যরাই সর্বপ্রথম অস্বিননগরের নাম পরিবর্তন করে বর্ধমান রাখেন।[৯]

দ্বিতীয়ত:- কারো মতে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আগে বর্ধমানের নাম ছিল 'ঈশ্বরপুর। তারপর পঞ্চম শতাব্দীতে তঙ্কালীন রাজা জৈন ধর্মের প্রচারক বর্ধমান মহাবীরের ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত হয়ে নিজের রাজ্যের নাম রাখেন বর্ধমান'।[১০]

তৃতীয়ত:- কেউ কেউ মনে করেন, হিন্দু রাজত্বকালে দক্ষিণ রাঢ়ের রাজধানী ছিল বর্ধমান। তখন বর্ধমানের নাম ছিল কাঞ্চননগর। অতীতে ছুরি, কাঁচির জন্য কাঞ্চন। নগর খুব বিখ্যাত ছিল।[১১]

চতুর্থত:- 'বর্ধমান' কথার অর্থ হল- 'ক্রম বর্ধিত' বা 'ক্রমেই বেড়ে চলা'। বর্ধমানের ভৌগোলিক সীমানার সঙ্গে এই নাম খুবই অর্থবহ। মোঘল আমলে এই বর্ধমান নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়ছিল। তখন বর্ধমানের নাম পাল্টে রাখা হয় 'শরিফাবাদ'।এর অর্থ হল অভিজাতের বাসস্থান।[১২]

পঞ্চমত:- মোঘল আমলে তুর্কি শাসক আলিকুলি ইসতাজুল বা শের আফকানের (শের আফকান তাঁর উপাধি ছিল। এর অর্থ হল 'ব্যাঘ্র উৎক্ষেপক'। অনেকে বলেন, আলিকুলির উপাধি শের আফগান। কিন্তু এই কথাটি ঠিক নয়। কারণ শের আফগান কথার অর্থ, আফগানদের শের।) জায়গির ছিল বর্ধমান শহর। শের আফকানের জগৎ বিখ্যাত সুন্দরী স্ত্রী হলেন মিহর-উন-নিসা। যার অর্থ 'নারীদের সূর্য' (বিপরীতে তাঁর বহুল প্রচলিত নাম 'মেহের-উন-নিসা'-র অর্থ হল, নারীদের অনুগ্রহ)। বর্ধমানে তাঁর বসবাসকারী মহলের নাম ছিল 'মির মহল'। বর্তমানে যার অপভ্রংশ রূপ হল 'ময়ূর মহল'।[১৩] সম্রাট জাহাঙ্গীর শের আফকানকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে বর্ধমান শহর দখল করেন এবং শেরের সুন্দরী স্ত্রী মিহরকে বিয়ে করে নুরজাহান (জগতের আলো) নাম দেন। তখন তিনি বর্ধমানের 'শরিফাবাদ' নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন 'বাঢ়-ই দেওয়ান' বা 'বাঢ়-এ দেওয়ান'। যার অর্থ হল 'পরগণার সদর দপ্তর'।"[১৪]

ষষ্ঠত:- এরপর ইংরেজ আমলে ইংরেজরা 'বাঢ়-এ দেওয়ান' নাম পাল্টে নিজেদের হরফে বর্ধমানের নাম রাখেন 'বর্ধওয়ান' বা 'BURDWAN'।"[১৫]

রাঢ় অঞ্চল তথা বর্ধমান ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় সুদূর অতীতে বন্য শিকারিরা বাস করত। দুর্গাপুর অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে এই বন্য শিকারিদের ব্যবহৃত নানা অস্ত্র পাওয়া গেছে। বিনয় ঘোষ লিখেছেন –

> "এই বন্য শিকারীরাই পরে পশুপালন এবং চাষবাস করতে শিখেছে। হয়তো একদল পশুপালন করেছে, এবং আর একদল কৃষিকাজে মন দিয়েছে। বর্ধমান জেলার বর্তমান গোপদের আদিপুরুষ তারাই যারা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রথম পশুপালন করে স্থায়ী উন্নত সভ্যতার স্তরে অগ্রসর হয়েছিল। কৃষির পত্তন করেছিল যারা, তারাই বর্তমান সোদ্‌গোপদের আদিপুরুষ। আর বর্ধমান জেলার এই অঞ্চলের নাম আজও তো পরগণা গোপভূম। পশুপালন ও কৃষিকাজ দুই-ই খাদ্য-উৎপাদন (flood production)। ... যাই হোক, গোপ ও সগোপরাই পশ্চিমবাংলার পশুপালন ও কৃষিসভ্যতার অন্যতম ধারকবাহক বলে মনে হয়।"[১৬]

শুধু সভ্যতাই নয় বাংলাদেশের সংস্কৃতিতেও বর্ধমানের দান অনবদ্য। মুসলমান রাজত্বকালে বাংলার ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে বর্ধমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। আর এর মধ্যে অন্যতম ছিল বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃতির দান। বর্ধমান জেলার অসংখ্য শ্রীপাট যথা; শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, কুলীনগ্রাম, যাজিগ্রাম, অগ্রদ্বীপ, দেড়, ঝামটপুর, বাঘনাপাড়া, কালনা, আকাইহাট, কাঁদরা, কঞ্চননগর, শীতলগ্রাম এবং বর্ধমানে মহান বৈষ্ণবদের যেমন; নরহরি সরকার, গদাধর দাস, কেশবভারতী, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, বৃন্দাবন দাস, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মালাধর বসু, রামানন্দ বসু, শ্রীনিবাস আচার্য, গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর, গৌরীদাস-সূর্যদাস সরখেল প্রমুখদের পদচারণায় তার মূল প্রমাণ। তাই আমরা বঙ্গদেশের অন্যতম সংস্কৃতি অর্থাৎ বৈষ্ণব সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি বর্ধমানের কয়েকটি বৈষ্ণব শ্রীপাট সম্পর্কে আলোচনা করব। সেই শ্রীপাটগুলি যথাক্রমে- শ্রীপাট কাটোয়া, শ্রীপাট শ্রীখণ্ড, শ্রীপাট যাজিগ্রাম, শ্রীপাট কুলীনগ্রাম, শ্রীপাট অগ্রদ্বীপ এবং অম্বিকা কালনা।

শ্রীপাট কাটোয়া :

বৈষ্ণবদের পাঁচটি ধামের মধ্যে অন্যতম শ্রীধাম কাটোয়া

"কাটোয়া প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয়।।"[১৭]

ভাগীরথী ও অজয় নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কাটোয়া একটি ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধশালী প্রাচীন নগর। বিশ্বরূপ, বিশম্ভর, কেশবভারতী, গদাধর দাস, যদুনন্দন শ্রীনিবাস আচার্য প্রমুখ বৈষ্ণবদের স্পর্শে পুণ্য এই ঐশীভূমি। নিবারণ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন –

> "খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের গ্রিক ঐতিহাসিক অরিয়ানের রচনায় উল্লেখ রয়েছে, মেরিডিওনলিস জনপদের মধ্যে অনুমোটিস নদ এবং কটদুপার পাশে প্রবাহিত হয়েছে অম্যসটিস নদ। সেন্টমার্টিন, উইলফোর্ড প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে অম্যসটিস হল অজয় নদ এবং কটদুপা বর্তমানে কাটোয়া।"[১৮]

এছাড়াও অর্বাচীনকালে রচিত ভবিষ্যৎ ব্রহ্মখণ্ড নামক পৌরাণিক বিবরণে গৌড় জনপদের অন্তর্গত 'কণ্টকপত্তন'-এর নাম জানা যায়। অনেকের মতে, এই কণ্টকপত্তনই কাটোয়া।[১৯]

কারো কারো মতে, কাটোয়ার প্রাচীন নাম ছিল 'চম্পকনগর'। কিন্তু এখানে এসে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করায় ব্যথিত শচীদেবী অভিসম্পাত দিয়ে চম্পকনগরকে 'কণ্টকনগর' বলেন। যদিও এর কোন শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।[২০] আবার এই কণ্টকনগর থেকে 'কাটোয়া' হওয়ার একটা ইতিহাস আছে। গৌড়দেশে মুসলমান রাজত্বের সময় অনেক হিন্দুস্থানীরা বসবাস করতেন। হিন্দুস্থানীরা নামের শেষভাগে একটা 'বা' যোগ করে থাকেন। এই 'বা'-এর উচ্চারণ অন্তঃস্থ 'ব' হওয়াতে 'ওয়া' উচ্চারিত হয়। সুতরাং 'কণ্টক' শব্দের অপভ্রংশ 'কাঁট'। এই 'কাঁট' শব্দে 'বা' যোগ হয়ে কাটোয়া বা বানান 'কাঁটওয়া' নাম প্রবর্তিত হয়েছে। আবার ইংরাজি 'Cutwa' হওয়ার জন্য 'কাটোয়া'-র চন্দ্রবিন্দু লোপ পেয়ে হয়েছে 'কাটোয়া'। বৈষ্ণব কবিরা আগে 'কাটঙা' লিখতেন। এখন তাঁরাও 'উ', 'য়া', চন্দ্রবিন্দুর পরিচয় করে 'কাটোয়া' লেখেন।[২১] এছাড়া কাটোয়াকে আগে কণ্টদ্বীপ, কাঁটাদ্বীপ ইত্যাদিও বলা হত। কাটোয়া ছিল ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্ভুক্ত। কিংবদন্তী আছে, ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী দেবর্ষি নারদের পরামর্শে বাসকে পতি রূপে পাবার জন্য গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থলে তপস্যা করছিলেন। সেই থেকে এই প্রয়াগতুল্য তীর্থস্থানের নাম হয়েছে ইন্দ্রাণী। একসময় এখানে পাথরের তৈরি বিশাল ইন্দ্রেশ্বরের মন্দির ছিল। তবে কেশব ভারতীর সময় তার অস্তিত্ব না থাকলেও এই স্থানের তীর্থ খ্যাতি ছিল। হয়তো এই কারণেই কেশব ভারতী এই স্থানকে নিজের সাধনক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন –[২২]

"ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোঙা নামে গ্রাম।

তথা আছেন কেশবভারতী শুদ্ধ নাম।।"[২৩]

শুধু তাই নয়, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডী' (১৫৭৭ খ্রিঃ), কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'[২৪] এবং বিজয়রাম সেনের 'তীর্থঙ্গল'এ (১৭৭০-৭১ সালে রচিত) ইন্দ্রাণী পরগণা ও কাটোয়ার কথা আছে।[২৫] এছাড়া ভারতের ইতিহাসের কুখ্যাত বর্গি হামলার চূড়ান্ত স্বীকার হয়েছিল কাটোয়া। যাই হোক নানা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বর্ধমান জেলার একটি অন্যতম প্রাচীন শহর হল কাটোয়া।

বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান হিসেবে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে কাটোয়া চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এছাড়া কাটোয়ার চৈতন্য পার্ষদ গদাধর দাস ও চৈতন্যের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর শ্রীপাট আছে। প্রাচীনকাল থেকেই কাটোয়ায় দুই ধরনের সংস্কৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এক; চৈতন্যপূর্ব মিশ্র সংস্কৃতি ও দুই; চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব সংস্কৃতি। আগেই বলেছি মুসলিম আমলে কাটোয়ায় মুসলিম আধিপত্য ছিল। মুসলিম ব্যতীত সমাজের প্রান্তীয় সীমানায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, ধর্মঠাকুরের উপাসক ইত্যাদি শ্রেণির লোক ছিল। মদ্য-মাংস দিয়ে দেবী পূজার প্রচলনও সমাজে যথেষ্ট ছিল। আর পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে বৈষ্ণব সংস্কৃতি শুরু হতে থাকে। ক্রমাগত বিরোধের কারণেই এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা অনুভব করেন দূরদর্শী সমাজ নেতারা। আমরা জানি, চৈতন্যের জন্মের কিছু পর থেকেই নবদ্বীপে এই সমন্বয়ের প্রচেষ্টা শুরু হয়। ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ এই ধর্ম সমন্বয় ও সংস্কারকেই চৈতন্যের কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, ধর্মের আচারের নামে সমাজে যে ব্যভিচার চলছিল চৈতন্য তার প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। বাসুদেব সার্বভৌম, বিদ্যানন্দ আগমবাগীশ প্রমুখ বৈদান্তিক তান্ত্রিক আচার্যরা নবদ্বীপের মানসিক পরিবেশ এমন করে তুলেছিলেন যেখানে কীর্তনের মাধ্যমে গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম প্রচার বড় বেমানান হচ্ছিল। টোলের পড়ুয়ারাও কীর্তনীয়ার নিন্দা করত। এই বিরোধিতা দূর করার জন্যই বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।[২৬]

কেশব ভারতী ছিলেন, মহীশূরে শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ভারতী সম্প্রদায়ের এক সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। এই দশনামী সম্প্রদায় যথা- (ক) সাগর (খ) নদী (গ) বন (ঘ) অরণ্য (ঙ) সরস্বতী (চ) পর্বত (ছ) গিরি (জ) পুরী (ঝ) ভারতী (ঞ) তীর্থ।[২৭] কেশব ভারতীর পূর্বপরিচয় পাওয়া যায় 'প্রেমবিলাস'-এর ১৩ বিলাসে। যথা –

"বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিল কালীনাথ আচার্য্য।
কুলীয়াবাসী বিপ্র সর্বগুণে বর্যা।
মাধবেন্দ্র শিষ্য হঞা করিলা সন্ন্যাস।
কেশব ভারতী নামে জগতে প্রকাশ।।"[২৮]

সুশীল কুমার দে এই মতের সমর্থনে বলেছেন –

"He is said to have belonged to the village of Denud, in the district of Burdwan and born of Bengali Brahmin ancestry. According to the Prema-Vilasa (ch. xiii) Kesava's former name was Kalinatha Acarya, and his native place was Kuliya in Navadvipa. But he appears to have resides chiefly at Katwa (kantaka-nagara)।"[২৯]

শৈশবে কেশব কিছুদিন মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেড় গ্রামে ছিলেন। শ্রীপাট পরিক্রমায় পাওয়া যায় –

"বাল্যকালে কেশবের দেন্দুরাতে স্থিতি।
বৃন্দাবন দাসের হয়ে যেথায় বসতি।।"[৩০]

দেনুড়ে বর্তমানে 'ভারতী গড়ে' নামক একটি পুকুরের ধারে কেশবের ভজনস্থলের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে কেশব ভারতীর নামে একটি শ্রীপাট আছে। তবে যায় হোক, এই কেশব ভারতীই চৈতন্যকে সন্ন্যাস মন্ত্র দান করেন। সেদিন নিমাইয়ের সন্ন্যাস উপলক্ষে শত শত নরনারী কেশবের বাড়িতে এসে হাজির হন। সকলেই ননী-দুধ-দই-মিষ্টি-পান-কাপড়-ফুলচন্দন-তুলসী-কাঠ-ধূপ নানা উপকরণ নিয়ে আসেন। নিমাই বিষ্ণুদাস নাপিতের কাছে ক্ষীর করে গঙ্গাস্নান করেন। অনেকের মতে মধু প্রামাণিক নামের এক নাপিত গৌরাঙ্গের ক্ষৌরকর্ম করেন। কারণ কাটোয়ার গৌরাঙ্গ বাড়িতে এখনো মধু প্রামাণিকের সমাধি আছে। কিন্তু–"কাটোয়ার সখি আখড়ায় একটি বৌদ্ধধ্যানী মূর্তিকে বিষ্ণুদাস নামে পূজা করা হয়।"[৩১] গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস নেওয়ার ব্যাপারে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন -

"চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।

তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।।"[৩২]

অর্থাৎ ১৫১০ সালে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নেন। সন্নাসের পর কেশব গৌরাঙ্গ নাম দিলেন –

"এতেক তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

সর্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য।।"[৩৩]

সন্ন্যাস নেওয়ার পর চৈতন্য কাটোয়ায় একরাত্রি কাটান এবং সারারাত ধরে কীর্তন করেন।

নিত্যানন্দের নির্দেশে চৈতন্য পার্ষদ গঙ্গাধর দাস শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মৃত্যুর পর চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান কাটোয়ায় স্থায়ীভাবে শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করে বসবাস করতে শুরু করেন। খেতুরি মহোৎসবে বঙ্গের বৈষ্ণবদের চৈতন্য পূজা মান্যতা পায়। কিন্তু অনেক আগে থেকেই নরহরি চক্রবর্তী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী চৈতন্যের মূর্তি নির্মাণ করে পূজা শুরু করেন। রামগোপাল দাসের শাখা নির্ণয় গ্রন্থ থেকে জানা যায় মূলত নরহরির উদ্যোগে ও প্রেরণায় তাঁর ভক্ত কুলাই গ্রামে কায়স্থ বংশীয় দৈত্যারি ঘোষ ও কংসারি ঘোষ মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশে নিমকাঠ দিয়ে 'গৌরাঙ্গ'-এর তিনটি নদিয়ানাগর মূর্তি তৈরি করেন। এই তিনটি মূর্তির মধ্যে বড় মূর্তিটি গদাধর দাসের এক শিষ্য বিদ্যানন্দ পণ্ডিতকে দিয়ে কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন। রামগোপাল দাস জানিয়েছেন –

"ছোট ঠাকুর রাখিলেন শ্রীখণ্ডের বাটীতে।
মধ্যম ঠাকুর গঙ্গানগর পাঠাইলেন সেবাতে।।
বড় ঠাকুর বড় রূপ কহা নাহি যায়।
যাঁর আকর্ষণে তিন ভুবন ভুলায়।।
বিদ্যানন্দ পণ্ডিত নাম পণ্ডিত অকিঞ্চন।
গদাধর ঠাকুর হন কৃপার ভাজন।।
কণ্টক নগর হয় মহাপ্রভুর স্থান।

তোমার সেবায় তুষ্ট হবেন গৌর ভগবান।।"[৩৪]

গদাধর দাসের জন্মস্থান দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার এড়িয়াদহে। সেখানে তার নিজেস্ব শ্রীপাট আছে। অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ বয়সে তিনি শিষ্য বিদ্যানন্দ ও যদুনন্দনের সঙ্গে কাটোয়ায় বসবাস শুরু করেন। আদিতে 'গৌরাঙ্গ' মূর্তি ছাড়া আর কোন বিগ্রহ ছিল না। কিন্তু কাটোয়ায় নিত্যানন্দের প্রভাব বেশি হওয়ায় হয়তো পরবর্তীকালে বলদেব আবেশের নিত্যানন্দ'-এর একটি বিগ্রহ এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বিষয়ে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী লিখেছেন – "পরবর্তীকালে যদুনন্দনের বংশধরগণ গৌর বিগ্রহের পাশে নিত্যানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।"[৩৫] এছাড়া সেখানে একটি 'জগন্নাথ' বিগ্রহও প্রতিষ্ঠিত হয়। শোনা যায় শাখাই গ্রামের কোনো এক গৃহস্থের পূজিত বিগ্রহ সেবা দিতে না পারার জন্য এখানে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।[৩৬] কাটোয়ার গৌরাঙ্গ

বাড়িতে এই বিগ্রহগুলি ছাড়াও শ্রীচৈতন্যের মস্তক মুণ্ডন স্থান, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম প্রকাশের ও সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান, মধু প্রামাণিকের সমাধি, কেশবভারতীর সমাধি, চৈতন্যের দীক্ষার আসন, চৈতন্য ও কেশবভারতীর পদচিহ্ন এবং গৌরাঙ্গ বাড়ির সেবাইতদের সমাধি আছে। গদাধর দাসের মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় শিষ্য যদুনন্দনই কাটোয়ায় গৌরাঙ্গ সেবার ভার নেন। এই যদুনন্দন ঠাকুরের বংশধর রাঢ়ীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণরাই কাটোয়ার গৌরাঙ্গ বাড়ির বর্তমান সেবাইত।[৩৭] তবে বর্তমানে আমরা যে গৌরাঙ্গ বাড়িটি দেখতে পাচ্ছি, সেটা বিগত শতকের শেষ ভাগে কাটোয়া নিবাসী নিরঞ্জন মল্লিকের জামাই তৈরি করেন। প্রতিষ্ঠা লিপি থেকে যায় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে দুটি দালান মন্দির তৈরি করেন তিনি। এই মন্দির দুটিই বর্তমান গৌরাঙ্গ বাড়ি। প্রাচীন গৌরাঙ্গ বাড়ি ও কেশবভারতীর আশ্রম গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।"[৩৮] গৌরাঙ্গ বাড়ির অনতিদূরেই গঙ্গার ধারে গৌরাঙ্গ ঘাট নামে একটি ঘাট আছে, এটিও আসল ঘাট নয়, আদি গৌরাঙ্গ ঘাট নদীতে ভেসে গেছে।

গৌরাঙ্গ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মূর্তিটির উচ্চতা চার ফুট পাঁচ ইঞ্চি। নিত্যানন্দ ও জগন্নাথ-এর বিগ্রহ দুটি দারু। প্রতি তিন বছর অন্তর বিগ্রহের অঙ্গরাগ হয়। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করে এইসময় সেবাপূজা চলে। ভোর ৪-৩০ থেকে ৫-৩০ এর মধ্যে মঙ্গলারতি, প্রভাতি ভোগ, প্রভাতি কীর্তন সহযোগে মন্দির পরিক্রমা করা হয়। সকাল ৮-৩০ থেকে ৯টার মধ্যে স্নান, বস্ত্র, শৃঙ্গার, আরতি, বাল্যভোগ নিবেদন। দুপুর ১২টা থেকে ১টার মধ্যে পঞ্চব্যঞ্জন সহ অন্নভোগ শয়ন, শয়ন কীর্তন। বিকেল ৪-৩০ থেকে ৫টার মধ্যে গাত্রোত্থান, বৈকালিক ভোগ নিবেদন, বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ, উপস্থিত ভক্ত সমক্ষে বৈষ্ণব শাস্ত্রচর্চা। সন্ধ্যা ৮টায় সন্ধ্যারতি, নাম-সংকীর্তন, রাত ৯টায় শীতলি ভোগ শয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে বিগ্রহ কেশবভারতী, গদাধর দাস, যদুনন্দন প্রমুখ সমাধির নিত্যসেবা হয় প্রভাতি ভোগ, ফল মিষ্টি; বাল্য ভোগে খিচুড়ি দুপুরের ভোগে আতপ চালের অন্ন, ভাজা, শাক, শুক্তো, অম্বল, পরমান্ন, দই; বৈকালিক ভোগে মিষ্টি, দুধ এবং রাতে রুটি, ভাজা, নানা ব্যঞ্জন, দুধ, ছানা, মিষ্টি ইত্যাদি থাকে। লক্ষ্য করার বিষয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আদিলগ্নে বিদ্যানন্দ থাকলেও গৌরাঙ্গ বাড়িতে বিদ্যানন্দের কোন সমাধি নেই। বিদ্যানন্দ খুব গরীব ও প্রচারবিমুখ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি অতি কষ্টে ভিক্ষা করে, শাক-ভাত খেয়ে এবং ছোটো একটা চুপড়ির মধ্যে থেকে বিগ্রহের সেবা করতেন। শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী থেকে জানা যায় বীরভদ্রের আশীর্বাদে এরপর শ্রীপটের অবস্থা ভালো হয়।[৩৯] এই শ্রীপাটে দোল, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, রথ, রাস ইত্যাদি উৎসব হয়। এছাড়া চৈতন্যের সন্ন্যাস স্মরণ উৎসব ও গদাধর দাসের তিরোভাব তিথি মহাসমারোহে পালন করা হয়। এখানে বিভিন্ন উৎসবের দিন 'গৌরাঙ্গ' বিগ্রহকে বিভিন্ন সাজে সাজানো হয়। যেমন, রাধাষ্টমীর দিন রাধার বেশ পরানো হয়, জন্মাষ্টমীর দিন কৃষ্ণের বেশ পরানো হয়, রথের দিন জগন্নাথের সাজে সাজানো হয়, ঝুলনে নানা অলঙ্কারের আভরণে কৃষ্ণ বেশ করানো হয় এবং রাসে রাসলীলার বেশ পরানো হয়। মূল মন্দিরে 'গৌরাঙ্গ'-এর পাশে বলদেবের আবেশে যে 'নিত্যানন্দ' মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত, তা বছরে একবার অর্থাৎ দোল পূর্ণিমার আগের দিন বহ্নি উৎসব বা চাঁচর উপলক্ষ্যে সারা শহর পরিক্রমা করানো হয়। এই পরিক্রমণের সময় শহরবাসীর হাতে পথের ধারে নিত্যানন্দ জলপান করেন। এইসময় নিত্যানন্দকে জল খাওয়াতে পারলে অনেকে নিজেকে বহু পুণ্যের অধিকারী মনে করে। নিত্যানন্দের প্রবল প্রভাবের কারণেই হয়তো এই প্রথা চালু হয়েছে। আর প্রতি বছর ১লা মাঘ থেকে ৩ রা মাঘ পর্যন্ত চৈতন্যের স্মরণ উৎসব পালিত হয়।

এই উৎসবের প্রথমদিন 'গৌরাঙ্গ' বিগ্রহকে কৌপীন, ডোর, গেরুয়া বস্ত্র, হাতে কমণ্ডুল ও দণ্ড দিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে সাজানো হয়। সারাদিন অখণ্ড নামগান, কীর্তন, গ্রন্থপাঠ, বৈষ্ণব সমাগমে শাস্ত্রচর্চা, বিভিন্ন শিল্পীদের পালাকীর্তন নিবেদন, গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ গাওয়া হয়। এই দিন 'গৌরাঙ্গ' বিগ্রহের ভোগে থাকে চিড়ে, দই, দুধ, ছানা, সন্দেশ, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি। উৎসবের তৃতীয় দিন নগর সংকীর্তন ও অন্ন মহোৎসব হয়। এই অন্ন মহোৎসবে হাজার হাজার মানুষ যোগদান করেন।

কার্তিকের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে কাটোয়ায় গদাধর দাস ও কেশবভারতীর শ্রীপাটে গদাধর দাসের তিরোভাব তিথি পালন করা হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বৃন্দাবনবাসী বাঙালী নরহরি চক্রবর্তী শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রীনিবাস প্রভুর মাহাত্ম্য বর্ণনা। আমরা আগেই দেখেছি চৈতন্য তিরোধানের পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের প্রভাবশালী বৈষ্ণব ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। এই শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থটি চৈতন্য তিরভাবের প্রায় ২১০ বছর পর রচিত হয়েছিল। তাই সেইসময়ের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য নয়। ক্ষুদিরাম দাস, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ গবেষকগণ এই মতে বিশ্বাসী।[৪০] তবে যাই হোক 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর' এ গদাধর দাসের তিরোভাব নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তিনি লিখেছেন –

"শ্রী যদুনন্দ চক্রবর্তী বিজ্ঞবর।
যাঁর ইস্টদেব প্রভু দাস গদাধর।।
...
কি বর্ণিব-কার্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী-দিনে।
মোর প্রভু অদর্শন হৈলা এইখানে।।"[৪১]

'গৌরপদতরঙ্গিণী', 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান', 'গৌড়ের ইতিহাস' (২য় খণ্ড) প্রভৃতি গ্রন্থ মতে গদাধর দাস ও নরহরি সরকারের তিরোভাব তিথি যথাক্রমে ১৫৩৬ ও ১৫৪০ সাল।[৪২] কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকর' ও বিভিন্ন বৈষ্ণব মহান্তদের মতামত অনুযায়ী গদাধর দাস ও নরহরি সরকারের। তিরোধান তিথির ব্যবধান একপক্ষ কাল বা ১৫ দিন। আবার অনেকে যথাযোগ্য তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন শ্রীনিবাস আচার্য ১৫১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[৪৩] 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ থেকে জানতে পারি গদাধর দাসের তিরোভাব উৎসবে শ্রীনিবাস আচার্য বঙ্গের বিভিন্ন বৈষ্ণবদের কাটোয়ায় সমবেত করে অনুষ্ঠানের গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাঁর পক্ষে এত দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তাই গবেষক রমাকান্ত চক্রবর্তীর মতের যথাযথ প্রামাণ্যতা স্বীকার করে বলা যায় ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে খেতুরি উৎসবের কিছু আগেই গদাধর দাস ও নরহরি সরকারের তিরোভাব তিথি অনুষ্ঠিত হয়।[৪৪] এই তিরোভাব উৎসবে শ্রীনিবাস আচার্য, বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বির, রঘুনন্দন, শ্রীপতি, শ্রীনিধি, বিদ্যানন্দ, চৈতন্য দাস, বিষ্ণুদাস, রঘুনাথ বৈদ্য, বলরাম দাস, গোপাল দাস, মুরারি চৈতন্যদাস, পুরুষোত্তম, সঞ্জয়, চন্দ্রশেখর, রামচন্দ্র কবিরাজ, মাধবাচার্য, অদ্বৈতপুত্র-কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল, নিত্যানন্দপুত্র- বীরভদ্র প্রমুখ বৈষ্ণবরা যোগদান করেন।[৪৫] উৎসবের বর্ণনা দিয়ে নরহরি চক্রবর্তী লিখেছেন –

"কিবা কার্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি তায়।
মহামহোৎসব যৈছে কেবা অন্ত পায়।।
যৈছে সঙ্কীর্তনারম্ভ গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গনে।
তাহার উপমা-স্থান নাহি ত্রিভুবনে।।
মহান্তগণের যৈছে শোভা সঙ্কীর্তনে।
যৈছে প্রেম কৃষ্ণমিশ্র-গোপাল নর্তনে।
প্রভু বীরভদ্রের যে অদ্ভুত নর্তন।
সে সব বর্ণিব সুখে ভাগ্যবন্তগণ।।"[৪৬]

বর্তমানেও গদাধর দাসের তিরোভাব তিথি তিন দিন মহা সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। এই উৎসবে ৬৪ মহান্তের উদ্দেশ্যে মালসা ভোগ, অখণ্ড নামগান, নগর সঙ্কীর্তন, পালাকীর্তন, ভাগবত পাঠ, অন্ন মহোৎসব

ইত্যাদি হয়। দলে দলে ভক্তরা এসে সমাধি স্থল ও বিগ্রহের সামনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মহোৎসবে আগত বৈষ্ণব ভক্তদের বেশিরভাগই মালা তিলক ধারণকারী। এই উৎসবে নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, কলকাতা, মেদিনীপুর, মালদহ, হুগলী, হাওড়া চব্বিশ পরগনা ইত্যাদি জেলার পাটবাড়ি থেকে বহু বৈষ্ণবরা এই উৎসবে যোগ দিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেন।

গদাধর দাসের তিরোভাব উৎসবের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। চৈতন্য তিরোভাবের পর বাংলার বৈষ্ণবদের মধ্যে নানা ভাগ ও উপভাগ তৈরি হয়েছিল। যার ফলে নানা মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের পরামর্শে বাংলার বৈষ্ণবদের মধ্যে বৃন্দাবনী গোস্বামী শাস্ত্র ও বৃন্দাবনী তত্ত্ব প্রচার ও গ্রহণ করানোর জন্য বাংলার বৈষ্ণবদের একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাই বৃন্দাবনের গোস্বামী ও বঙ্গের কিছু নেতৃস্থানীয় বৈষ্ণবদের যৌথ আলোচনায় বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের সংগঠিত করার প্রথম বৈষ্ণব সম্মেলন ছিল গদাধর দাসের তিরোভাব তিথি। গদাধর দাস ছিলেন গদাই-গৌরাঙ্গ ভাব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সেই ভাবেই 'গৌরাঙ্গ' বিগ্রহের সেবা করতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বৈষ্ণব ধর্মের সবচেয়ে বড় মহাসম্মেলন খেতুরি মহোৎসবে তাঁর সেই ভাব সম্প্রদায়কে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে মান্যতা। দেওয়া হল না। বর্তমানে এই শ্রীপাটের সেবাইতরা গদাধর দাসের শিষ্য যদুনন্দনের বংশধর। তবে তাঁরা নিত্যানন্দের বংশীয় বৈষ্ণব বলে নিজেদের মনে করেন। তাঁদের জপ মন্ত্র হল বত্রিশ অক্ষর যোল নাম। যথা – 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।' এখানকার সেবাইতরা বটপত্র ও বাঁশ পাতার তিলক ধারণ করেন। শ্রীপাটে পুরোহিত ও রাঁধুনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মালম্বী। মন্দিরের পরিচ্ছনতা ও ভোগ রান্নার কাজে মহিলারা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। সেবাইতরা অর্থ দান ছাড়া আর কোন গুরু দায়িত্ব পালন করেন না। এই মন্দিরের দৈনিক খরচ প্রায় চার হাজার টাকা। ভক্তদের দান ও সেবাইতদের দ্বারা এই খরচ চলে, কোনো দেবোত্তর সম্পত্তি নেই। সেবাইতদের বৃহৎ শিষ্যবর্গের মধ্যে উঁচু-নিচু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকেই দেখা যায়। শিষ্যদের মধ্যে চাকুরিজীবী, শিক্ষক, ব্যবসাদার, চাষি, তাঁতি, জেলে, মুচি ইত্যাদি অনেক শ্রেণিই দীক্ষা নেন। পাটবাড়ির সঙ্গে সংযোগ হওয়ার পর। অনেকের জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এই শ্রীপাট থেকে কোনো বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব ধর্মের পত্রিকা প্রকাশিত হয় না। গৌরাঙ্গ বাড়ির অনতিদূরে 'ষড়ভূজ গৌরাঙ্গ' মূর্তি ও 'রাধাকান্ত দেব'-এর মন্দির ইত্যাদি বৈষ্ণবদের কাছে বড় পবিত্র স্থান। তবে কাটোয়া শুধুমাত্র বৈষ্ণবদের তীর্থস্থানই নয়। সংসার যখন বিষ্ণুভক্তিশূন্য তখন ভক্তির বন্যায় ব্যভিচারের আবর্জনা ভাসিয়ে দেবার সংকল্প গ্রহণ করেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর সেই সংকল্প গ্রহণের ঐতিহাসিক স্থান হল কাটোয়া।

শ্রীপাট শ্রীখণ্ড :

কাটোয়া শহর থেকে ৬ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত রাঢ়বঙ্গের অন্তর্গত পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির অন্যতম স্থান শ্রীখণ্ড। নৈবেদ্যের উপর স্থাপিত মিষ্টিকে বলা হয় খণ্ড। অনুরূপভাবে এই অঞ্চলের খণ্ডগুলির মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ হওয়ায় এই গ্রামের নাম হয় শ্রীখণ্ড। আবার এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী প্রাচীন শাক্ত দেবী 'খণ্ডেশ্বরী'। গ্রাম দেবী 'খণ্ডেশ্বরী'-র নামেও গ্রামের নাম শ্রীখণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। অপরদিকে শ্রীখণ্ডকে বৈদ্যখণ্ড বলে পরিচয় দিতেন বৈষ্ণবরা। উত্তর রাঢ় অঞ্চলের (অর্থাৎ শ্রীখণ্ডের) বৈদ্যরা যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। বিদ্যায় বুদ্ধিতে বৈদ্যরা সমাজে অগ্রগণ্য ছিল।[৪৭]

শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। প্রায় দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে পন্থদাস ও রাঘব সেন নামে বৈদ্য বংশের দুই কৃতি বংশধর শ্রীখণ্ডে এসে বসবাস শুরু করেন। বল্লাল সেনের প্রধান সেনাপতি পন্থদাস ও তাঁর উত্তর পুরুষরা (বধুদাস, নারায়ণ, মুকুন্দ, নরহরি প্রমুখ) ছিলেন পরম বৈষ্ণব। আর রাঘব সেনের বংশধর দামোদর সেন ছিলেন প্রসিদ্ধ শাক্ত। দামোদর সেনও পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। অনেকে মনে

করেন রাজ কর্মচারী ও প্রসিদ্ধ পদকর্তা দামোদর সেন এবং যশোররাজ খান একই ব্যক্তি।[৪৮] তিনিই গৌড়ের রাজ দরবার থেকে যশোরাজ খান উপাধি পেয়েছিলেন এবং স্বরচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যে সম্রাট হুসেন শাহের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর উত্তরপুরুষ বসন্ত সেন রায়চৌধুরী উপাধি পান।[৪৯] তাই শ্রীখণ্ডে এখনো রায়, সরকার ও ঠাকুর পদবিধারী বৈদ্যরা বেশ প্রভাবশালী। দামোদর সেনের অন্যতম উত্তরপুরুষ চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস ঠাকুর প্রথম জীবনে শাক্ত মতাবলম্বী হলেও পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্য ও বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজের প্রভাবে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রামগোপাল দাসের রসকল্পবল্লী ও ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা (১৬৭৫) নাটকে শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধির কথা জানা যায়। –

"শ্রীখণ্ড নাম নগরী রাঢ়ে বঙ্গেষু বিশ্রুতা।
সর্বর্ষামেব বৈদ্যনামাশ্রয়ে যত্র বিদ্যতে।"[৫০]

বৈষ্ণব সংস্কৃতির মহাকেন্দ্র শ্রীখণ্ডের অন্যতম ঐতিহ্য হল বৈষ্ণব জগতের পঞ্চশাখার বৈষ্ণবের লীলাভূমি। কৃষ্ণরাজ কবিরাজ এই পঞ্চশখার উল্লেখ করে লিখেছেন –

"খণ্ডবাসী শ্রীমুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি চিরঞ্জীব আর সুলোচন।।
এই সব মহাশাখা গৌর কৃপাধাম।
প্রেম ফল ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান।।"[৫১]

মহম্মদ শাহী বংশের সুলতান গৌড়েশ্বর রকুনুদ্দীন বারবক শাহের চিকিৎসক আয়ুর্বেদাচার্য পণ্ডিত ছিলেন নারায়ণ দাস বা নবনারায়ণ সরকার। তিনি পন্থদাসের উত্তরপুরুষ ছিলেন।[৫২] গৌড়েশ্বরের সভাকবি কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর কাব্যে রাজদরবারের অন্য সভাসদদের সঙ্গে নারায়ণ সরকারেরও নাম উল্লেখ করে লিখেছেন –

"রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগানন্দ।
তার পাছে বস্যা আছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ।।
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন।।"[৫৩]

নারায়ণের তিন পুত্র ছিল, বড় ছিলেন মুকুন্দ দাস, মধ্যম মাধব (শৈশবেই পরলোকগত) ও কনিষ্ঠ পুত্র নরহরি সরকার। সুপণ্ডিত, ভক্তিশাস্ত্রবিদ ও সুচিকিৎসক মুকুন্দ দাস গৌড়রাজ হুসেন শাহের রাজবৈদ্য ছিলেন। অকালে পিতৃবিয়োগের কারণে তিনি সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আজীবন ব্রহ্মচারী থেকে গৌরাঙ্গের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে চাইলে মহাপ্রভুই তাঁকে বাধা দিয়ে সংসার জীবন পালন করতে বলেন। মুকুন্দের কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে চৈতন্য বলেন –

"ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম।
নির্মল নিগুঢ় প্রেম যেন শুদ্ধ হেম।।
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইহোঁ করে রাজ সেবা।
অন্তরে কৃষ্ণ প্রেম ইহা জানিবেক কেবা।।"[৫৪]

বৈবাহিক জীবন গ্রহণ করার পরও তিনি একনিষ্ঠ হয়ে কৃষ্ণের সাধন ভজন করতেন। শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙ্গা গ্রামে তাঁর সাধনবেদী ছিল। শেষ বয়সে তিনি মহাপ্রভুর আদেশে নীলাচলে বসবাস করতেন। আর মুকুন্দপুত্র রঘুনন্দন ও নরহরি শ্রীখণ্ডে থেকেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটান। 'অনন্তসংহিতা', 'শ্রীভক্তমাল', 'বৈষ্ণবাচার দর্পণ', 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে জানা যায় মুকুন্দ দাস ব্রজধামে 'শ্রীবৃন্দাদেবী'

হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই কারণে তার ভজনস্থান বড়ডাঙ্গাকে শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবরা দ্বিতীয় বৃন্দাবন বলেন।[৫৫] তিনি শ্রীখণ্ডেই দেহত্যাগ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পরিকর 'গৌরনগরবাদী ভাব'এর প্রবর্তক নরহরি সরকার ছিলেন শ্রীপাট শ্রীখণ্ডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। গৌরাঙ্গের নদিয়া লীলায় গদাধর ও নিত্যানন্দের সঙ্গে নরহরিও ছিলেন নিত্যসঙ্গী। পূর্বলীলায় তিনি ব্রজের মধুমতী সখী ছিলেন। 'পদ্মপুরাণ' মতে, শ্রীকৃষ্ণের গোপিনীদের অন্যতমা ছিলেন মধুমতী সখী। গীত-বাদ্যে পারদর্শিনী, মধুরালাপ চাতুরা জিতেন্দ্রিয় শিরোমণি এই মধুমতী পুষ্পচয়ন, চামরদান, মধুদান, প্রসাধন বীজন প্রভৃতির দ্বারা নানা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের যুগলসেবা করতেন।[৫৬] নরহরিও গৌরাঙ্গকে নাগর ভেবে মধুমতীর মতো গৌরাঙ্গের পদসেবা করতেন। নরহরির এই মধুমতীতত্ত্ব ও ভক্তির মহিমা প্রকাশ করানোর জন্য নিত্যানন্দ প্রভু সপার্ষদ শ্রীখণ্ডে এসে নরহরির কাছে মধুপানের ইচ্ছা প্রকশ করেন। নরহরি গৃহ নিকটস্থ পুকুর থেকে জল এনে দেন কিন্তু নিত্যানন্দ তা মধু রূপে পান করেন সেই থেকে এই পুকুরের নাম হয় মধুমতী পুষ্করিণী। প্রচলিত সাধন ভজনের বিপরীতে নরহরি গৌরনাগরী ভাব সাধনার প্রেম বন্যায় অন্যদের কথা দূরস্থান স্বয়ং গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মোহিত এবং পুলকিত হয়েছিলেন।[৫৭]

রাঢ় দেশের সাধারণ জনগণের স্তরে লৌকিক ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রবল প্রভাব আছে। শ্রীখণ্ড গ্রামেই একসময় তন্ত্রের প্রাধান্য ছিল। শ্রীখণ্ডের চারিদিকে বিখ্যাত সব তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আছে। যথা – ক্ষীরগ্রামের 'যোগ্যদা', কেতুগ্রামের 'বহুলা', অট্টহাস্যে 'ফুল্লরা', মাঝিগ্রাম, উজানি মঙ্গলকোটের 'শাকম্ভরী' ও ভ্রামরীর 'মঙ্গলচণ্ডী'।[৫৮] আর শ্রীখণ্ডের ভিতরেই উত্তরে রয়েছে 'অনাদিলিঙ্গ শিব' এবং পশ্চিমে রয়েছে গ্রাম্য দেবী 'খণ্ডেশ্বরী' কালিকা আর একদিকে মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দনের ভজনস্থান বড়ডাঙ্গা। নরহরি ও রঘুনন্দনের সাধনায় তান্ত্রিক সাধনার প্রভাব কিছুটা হলেও ছিল। এঁদের অনুবর্তী লোকানন্দ ও লোচনানন্দের সাধনায় তান্ত্রিক সহজসাধনার কথা অনেক বেশি স্পষ্ট। নরহরি ও লোচনানন্দ রাগানুগা বা রাগাত্মিকা ভজন পদ্ধতি এবং রাধাভাব ও নাগরভাব-এর কথা প্রচার করেছেন। লোকানন্দ বিধিমার্গে গৌরাঙ্গের উপাসনার কথা প্রকাশ করেন। লোকানন্দ 'ভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থে যে তান্ত্রিক পদ্মমণ্ডলের রচনা করেছিলেন তার ছয় কোণে ছিল চৈতন্যের ছয় জন প্রধান পার্শ্বপরিকর (গদাধর পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর প্রমুখ)।[৫৯] নরহরির বৈষ্ণব পদাবলি রচনায় চণ্ডীদাসের ভাব ও ভাষা প্রবল প্রভাব ছিল।[৬০] 'গৌরনাগর ভাব'এর সাধক নরহরি শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গকে অভিন্ন জেনেও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা গৌরাঙ্গেরই অধিকতর সাধনা করতেন। তিনি অনেক গৌরবিষয়ক পদও লিখেছিলেন। যথা –

"দেখ দেখ অগো ভুবনমোহন গৌরাঙ্গরূপের ছটা।
কিয়ে ধরাধর তেজিয়া ধরণী উপরে বিজুরী ঘট।।
কিয়ে নিরমল মঙ্গর কনক-কমল কালিকারাশি।
কিয়ে অতিশয় মন্দিত বিমল চারু গোরোচনারাশি।।"(১২৯নং পদ)[৬১]

অথবা;

"কি কব স্বপনে কত পরিহাস করে গো
রসিক শেখর মোর গোরা।
কিবা সে নয়ন বাঁকা চাহনি বিষম গো
জীবন-যৌবনধন-চোরা।।"(১৩৯নং পদ)[৬২]

এইভাবে নরহরি তথা শ্রীখণ্ডের অন্যান্য বৈষ্ণব কবিরা পদাবলি সাহিত্যের জগৎকে উৎকর্ষ করেছিলেন। তবে নরহরির তান্ত্রিক প্রভাব সম্পন্ন গৌরনাগরী ভাব-এ অনেকেই বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যান্য বৈষ্ণব

সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের মতভেদ দেখা যায়। আর সেই মতভেদ আরও স্পষ্ট হয় মহাপ্রভুর জীবৎকালে অর্থাৎ ১৯২১ সালের পুরীর রথযাত্রায়। শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞায় অন্যান্য ভক্তবৃন্দরা যখন কৃষ্ণ গুণ-কীর্তন করছিলেন, তখন শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় অন্যত্র গৌরাঙ্গ গুণকীর্তন করেছিলেন –

"খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন।

নরহরি নাচে তাহা শ্রীরঘুনন্দন।।"[৬৩]

রক্ষণশীল নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব সমাজ নরহরি ও তাঁর অনুচরদের চৈতন্য সংক্রান্ত বাড়াবাড়ি ভালো চোখে দেখেননি। তবে বৈষ্ণব ধর্মে কান্তা বা প্রকৃতিভাব-এ ভজন কেবল নরহরিই করেননি, স্বয়ং গৌরসুন্দর নিজেই এই পথের পথিক ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতও রাধাভাব-এ ভাবিত ছিলেন। তাই বঙ্গের বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে নরহরি সম্প্রদায় একটি ব্যতিক্রমী নজির রেখে গেছেন।

শ্রীচৈতন্যের কল্পতরুর পঞ্চশাখার অন্যতম শাখা শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর। মুকুন্দ পুত্র রঘুনন্দন ছিলেন নরহরির গৌরনাগর ভাব-এর যোগ্য উত্তরসূরি। শিশুকালে রঘুনন্দন গৃহদেবতা গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিমাধর্ম ত্যাগ করিয়ে ক্ষীরের নাড়ু খাইয়েছিলেন। শ্রীখণ্ডের পাটবাড়িতে এখানো সেই ক্ষীর খাওয়া গোপীনাথের মূর্তি আছে। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি মহাপ্রভুকে 'গৌর-ভাবামৃত' স্তোত্র দ্বারা বন্দনা করেছিলেন। নরহরির আদর্শ অনুসরণ করে তিনি অষ্টরস সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর খুব প্রিয় পাত্র ছিলেন।[৬৪] রঘুনন্দন, অভিরাম গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। নৃত্য, গীত ও কীর্তনে পারদর্শী ছিলেন রঘুনন্দন। বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ কীর্তনিয়া হিসাবে রঘুনন্দনের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। শ্রীখণ্ডের পঞ্চশাখার আর এক চৈতন্য পরিকর চিরঞ্জীব সেনের আদি নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার তেলিয়াবৃধুরি গ্রামে। কবি দামোদর সেনের কন্যা সুনন্দাকে বিয়ে করে তিনি শ্রীখণ্ডে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ভক্ত চিরঞ্জীব সেন উল্লেখযোগ্য পদকর্তা ছিলেন। সুলোচনের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়। রামগোপাল দাস বলেছেন, চিরঞ্জীব ও সুলোচন দুই ভাই ছিলেন। কারো মতে তারা পূর্বাশ্রমে চন্দ্রিকা এবং চন্দ্রশেখরা নামে পরিচিত ছিলেন। কারো মতে আবার কলকণ্ঠী ও সুলোচনা কলাবতী সখী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।[৬৫]

চৈতন্যের জীবৎকালে নরহরি সরকার নীলাচলে যাবার আগে (আনুমানিক ১৫৩৩ খ্রিঃ, মতান্তর থাকতে পারে) শ্রীখণ্ডে গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই 'গৌরাঙ্গ' বিগ্রহ ছিল কাঠের। এই শ্রীপাটের প্রাচীন কুলদেবতা ছিলেন অষ্টধাতুর 'গোপীনাথ'। এখানে বর্তমানে তিন শরিকের বাড়ি আছে। উত্তর বাড়িতে আছেন মুকুন্দ ঠাকুরের পঞ্চমপুরুষ রতিকান্ত ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল জীউ, রাধারাণী ও শ্যামরায়, অচ্যুতানন্দ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত (মুকুন্দ ঠাকুরের নবমপুরুষ) লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-গোবিন্দ, শ্রীধর, গোপাল বিগ্রহ এবং রঘুনন্দনের সুতিকা গৃহের একটি প্রতীকী গৃহ আছে। মাঝের বাড়ির মন্দির নরহরি ঠাকুরের ভজনগৃহ হিসেবে পরিচিত। এখানে বৃন্দাবন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন ও রাধারাণী বিগ্রহ আছে। এই বাড়িতে সমতল ছাদ বিশিষ্ট নাটমন্দিরের পাশে নরহরির ভজন কুঠি, তাঁর ব্যবহৃত শয্যা একটি বেদীরূপ আসন ইত্যাদি আছে। মাঝের বাড়ির মদনমোহন ও রাধারাণী উত্তরবাড়ির মদনগোপাল-এর সমসসাময়িক বলে মনে করা হয়। দক্ষিণ বাড়ির মন্দির গোবিন্দ জীউ-র মন্দির হিসাবে খ্যাত। এখানে গোবিন্দ জীউ, শ্যামসুন্দর ও রাধারাণী, আড়াই ফুট উচ্চতার নদিয়ানাগর গৌরাঙ্গ মূর্তি ও বিষ্ণুপ্রিয়া এবং কাটোয়ার সবচেয়ে প্রাচীন রঘুনাথের ক্ষীরের নাড়ু খাওয়া গোপীনাথ বিগ্রহ আছে। এখন আমরা শ্রীপাটে গেলেই দেখতে পাবো গোপীনাথ'এর হাতে অর্ধভক্ষিত নাড়ুর একটি চিহ্ন আছে। 'গৌরাঙ্গ'-'বিষ্ণুপ্রিয়া'-'গোপীনাথ' ব্যতীত অন্যান্য বিগ্রহগুলি শিলা বা ধাতুর তৈরি। গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া-গোপীনাথ বিগ্রহ তিন বাড়িতে পালা করে সেবা নেয়। এছাড়া দক্ষিণ বাড়ির গায়েই একটি বাঁধানো পুকুর আছে। যেটি মধুমতী পুষ্করিণী হিসেবে পরিচিত। লক্ষণীয় এই যে এখানকার 'গোপীনাথ' বিগ্রহের পাশে কোন রাধারাণী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

শ্রীপাটে নিত্য বিগ্রহের সেবা পূজা হয়। সকালে বিগ্রহের জাগরণ থেকে শুরু করে স্নান, শৃঙ্গার, পূজা, আরতি, তিনবার ভোগরাগ, বিকেলে বৈকালিক ভোগ, গ্রন্থপাঠ, নামগান, কীর্তন সবকিছুই হয়। বাল্যভোগে ফল, মিষ্টি, ছানা; দুপুরে ভাজা, নানা ব্যঞ্জন, পরমান্নসহ অন্ন; বিকেলে ফল, মিষ্টি রাতে লুচি, দুধ, মিষ্টি, ক্ষীর, ছানা ইত্যাদি থাকে। কার্তিক মাসে বিগ্রহের বিশেষ সেবা হয়। এই মাসে পাঁচবার বিগ্রহের ভোগরাগ হয়। এখানে নিত্য সেবা পূজার পাশপাশি দোল, ঝুলন, রথ, রাস, জন্মাষ্টমী এবং মাঘীপঞ্চমী তিথিতে রঘুনন্দনের জন্মতিথি পালন করা হয়। এই শ্রীপাটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উৎসব কার্তিকী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে নরহরি স্মরণ উৎসব বা বড়ডাঙ্গা উৎসব। তিনদিন ধরে এই উৎসব হয়। এই উৎসবটি শ্রীখণ্ড পাটবাড়ির কাছেই বড়ডাঙ্গাতে অনুষ্ঠিত হয়। বড়ডাঙ্গা মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দনের ভজনস্থল ছাড়াও রঘু নন্দন ও অভিরাম গোস্বামীর মিলনস্থল হিসাবেও খ্যাত। এই মিলনের সময় নৃত্যরত রঘুনন্দনের নুপুর ছিটকে যায় কাটোয়ার আকাইহাটে। বড়ডাঙ্গাতেই কোনো একসময় গৌরাঙ্গের সঙ্গে নরহরির মিলন ঘটেছিল। উল্লেখ্য যে, নরহরি বিদ্যার্জনের জন্য নবদ্বীপে গিয়েছিলেন। সেইসময়েই নরহরির সঙ্গে গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ হয়। বড়ডাঙ্গাতেই নরহরি সরকারের তিরোধান ঘটে। নরহরি তিরোধান তিথি নিয়ে নানা মতভেদ আছে। 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর'এ নরহরি তিরোধানের দুটি তিথির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা-

"মার্গশীর্ষমাসে কৃষ্ণা একাদশী-দিনে।
আকস্মাৎ অদর্শন হৈলা এইখানে।"[৬৬]

আবার,

"অগ্রহায়ণে কৃষ্ণা একাদশী সর্বোপরি।
যা'তে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি।।"[৬৭]

নরহরি চক্রবর্তী বলেছেন গদাধর দাসের তিরোধানের কিছুদিন পরে নরহরি মারা যান। ঐতিহাসিকদের মতে, ১৫৪০/১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে নরহরি সরকারের তিরোভাব ঘটে। কারো মতে, নরহরি ১৪৭০ থেকে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[৬৮] কেউ কেউ মনে করেন তিনি ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের কয়েক বছর পরে মারা যান।[৬৯] যাই হোক নরহরির প্রথম তিরোভাব বার্ষিকী উৎসবে শ্রীনবাস আচার্য অধ্যক্ষ করেছিলেন। উৎসব হয়েছিল শ্রীখণ্ডের গৌরাঙ্গ বাড়িতে। এর পরের বছর থেকে আজ পর্যন্ত এই উৎসব বড়ডাঙ্গাতেই অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনিবাস আচার্যের ভাগবত পাঠের মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু হয়। তারপর বীরভদ্র, রঘুনন্দন ও অন্যান্য বিশিষ্ট বৈষ্ণববৃন্দের পরস্পরকে মালা-চন্দন দান, রাত্রিতে রঘুনন্দনসহ অন্যান্যদের সঙ্কীর্তন অনুষ্ঠান। 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর'এ এই মধুর ও আকর্ষণীয় কীর্তনের বিশেষ বর্ণনা আছে। –

"করিয়া আলাপ রাগ প্রকট করয়।
কহিতে কি-রাগের সৌভাগ্য অতিশয়।।
শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূরছনা, তালাদি আর।
গমক প্রভেদ প্রকাশয়ে চমৎকার।
...
সঙ্কীর্তন-সুখের সমুদ্র উথলিল।
পশু-পক্ষী মনুষ্য-দেবাদি মুগ্ধ হৈল।।
সঙ্কীর্তন স্থলেতে লোকের নাই পার।
সবাকার নেত্রে অশ্রুধারা অনিবার।।"[৭০]

শুধু তাই নয় এ কীর্তনে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহার করা হয়েছিল। নরহরি লিখছেন -

"কিবা সে মধুর ঝাঁজ-বাদ্যের চাতুরী।

বাজায় সুছন্দে চারু, খমক, খঞ্জরী।"[৭১]

এই সংকীর্তনে বীরভদ্রের অপূর্ব নৃত্য দেখে অদ্বৈতপুত্র কৃষ্ণমিশ্র ও গোপালসহ সকল বৈষ্ণবগণ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। এইভাবে মহান্তগণের নৃত্য, গীত ও কীর্তনের হিল্লোলের আত্মবিস্মৃতির মধ্যে দিয়ে একাদশী নিশি শেষ হয়। দ্বাদশীর দিন 'গোপীনাথ', 'গৌরাঙ্গ' প্রভু ও নরহরি ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করা হয়। বিগ্রহকে প্রণাম পুস্পার্ঘ দিয়ে সকলেই ভোগ নিবেদন করেন। তারপর উপস্থিত সকল ভক্ত মিলে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্যের মহা উদ্যোগে এই মহোৎসব ছিল বৈষ্ণব ধর্মের দ্বিতীয় মহাসম্মেলন। বঙ্গের বৈষ্ণবদের পারস্পরিক দূরত্ব ও রোষ মেটাতে এটি ছিল অনবদ্য একটি প্রচেষ্টা। আর সেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অব্রাহ্মণ নরহরির তিরোধান মহোৎসবের একাসনে বসে প্রসাদ খাওয়াও একটা বিপ্লবাত্মক ঘটনা। স্মরণীয় যে গদাধর দাসের তিরোধান উৎসবে এই মহাপ্রসাদ গ্রহণের ঘটনাটি ঘটেনি। এই মহোৎসবের পর ভাগবত পাঠ বৈষ্ণব সমাজের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়।

বর্তমানে শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙ্গায় মধুমতী সমিতির উদ্যোগে (নরহরির বর্তমান বংশধরদের দ্বারা গঠিত সমিতি) নরহরির তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভাগবত পাঠ, নাম-সঙ্কীর্তন, পালাকীর্তন, রসকীর্তন, মালসাভোগ নিবেদন, অন্নমহোৎসব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উৎসব অতিবাহিত হয়। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী এই উৎসব সম্পর্কে লিখেছেন – "এই মহোৎসবের বিশেষ আকর্ষণ হল বিভিন্ন স্থান হতে আগত কীর্তনীয়া দল কর্তৃক কীর্তনে অংশগ্রহণ।"[৭২] এই মহোৎসব উপলক্ষে তিনদিন এখানে একটি মেলা বসে। উৎসব উপলক্ষ্যে পাটবাড়ি থেকে বড়ডাঙ্গাতে 'গোপীনাথ' ও 'গৌরাঙ্গ' বিগ্রহকে আনা হয়। প্রভাতি কীর্তন ও নাম যজ্ঞের মাধ্যমে উৎসবের শুভারম্ভ ঘটে। তারপর ভোগরতি, নামকীর্তন, অধিবাস কীর্তন ইত্যাদি হয়। দ্বিতীয় দিন প্রভাতি কীর্তন, মঙ্গলারতি, বিগ্রহকে চিড়ে ভোগ নিবেদন, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, পালাকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। আর তৃতীয় দিন বিগ্রহ ও চৌষট্টি মহান্তের উদ্দেশ্যে মহাভোগ নিবেদন, রসকীর্তন, পালাকীর্তন প্রভৃতি হয়। উৎসবের পর 'গৌরাঙ্গ'-'গোপীনাথ' আবার চতুর্দোলায় চড়ে শ্রীপাটে ফিরে আসেন। এই উৎসবে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, বীরভূম, কাটোয়া, হুগলি, অগ্রদ্বীপ, যাজিগ্রাম বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক বৈষ্ণবগণের সমাগম হয়। বর্তমানে মেলায় বৈষ্ণব ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে বাউল গান ও লোকসঙ্গীতের আসরও বসে। এই উৎসব ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষের আনন্দের ও মিলনের উৎসবে পরিণত হচ্ছে।

শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের বৈষ্ণব ধর্মে ও সাহিত্যে তথা সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব অবদান রয়েছে। যথা –

প্রথম : শ্রীখণ্ডে একাধিক কবি, পদকর্তা ও বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণেতা জন্ম বা আবির্ভাব হয়। তারা হলেন, দামোদর সেন বা যশোরাজ খান, মুকুন্দ সরকার, নরহরি সরকার, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব সেন, সুলোচন সেন, রামচন্দ্ৰ কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, রতিকান্ত ঠাকুর, রামগোপাল ঠাকুর, পীতাম্বর দাস, শচীনন্দন, জগদানন্দ ঠাকুর প্রমুখ।

দ্বিতীয় : বৈষ্ণব ধর্মের জগতে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় নৃত্য, গীত ও কীর্তনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন –

"খণ্ডের মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।

নরহরিদাস মুখ্য এই তিন জন।।"[৭৩]

এই তিনজনই বঙ্গের কীর্তনের ইতিহাসে এক বিশেষ ঘরানার সৃষ্টি করেছিলেন। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, তাঁর 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড) বইয়ে লিখেছেন –

"সরকার পরিবারের তিনজনই নৃত্যগীতবাদ্য কুশল ছিলেন এবং এখানে উচ্চ সঙ্গীত চর্চার প্রচলন থাকায় শ্রীখণ্ডের নিজস্ব ঘরানায় কীর্তন গানের প্রচলন শুরু হয়। বিলম্বিত লয়ের ধীর গম্ভীর ও

মাধুর্যময় শ্রীখণ্ড ঘরানার গান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঐতিহ্যবাহী। ... শ্রীখণ্ড ঘরানার কীর্তন সকলের পক্ষে রসোপলব্ধি না হওয়ায় সরলীকৃত রূপে ও বৈচিত্র্যপূর্ণ তালের সমাবেশে গরাণহাটি, মনোহরশাহী, রেনেটি, মান্দারণী প্রভৃতি ঘরানার সৃষ্টি হয়। শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া হিসাবে শ্রীরঘুনন্দনের খ্যাতি ছিল।"[৭৪]

আবার বিনয় ঘোষ লিখেছেন –>[৭৫]

"বাংলাদেশের কীর্তনগানের বিবিধ ঢঙের মধ্যে 'মনোহরশাহী' ও 'রাণীহাটি' (রেনেটি) ঢঙই প্রসিদ্ধ। মনোহরশাহী বর্ধমান জেলার উত্তরে, রাণীহাটি দক্ষিণে। কুলীনগ্রাম রাণীহাটি পরগণার অন্তর্গত। উত্তর ও দক্ষিণের এই দুই ঢঙের বা রীতির মধ্যে উত্তররাঢ়ের মনোহরশাহী কীর্তনে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের বিশেষ দান আছে।"[৭৬]

ঐতিহাসিক রমাকান্ত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ৫৪টি তাল বিশিষ্ট 'খেয়ালাঙ্গ' মনোহরশাহী কীর্তন ষোড়শ শতকের শেষ দিকে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডে ও কাঁদরাতে এবং বীরভূম জেলার ময়নাডাল ও পায়ের গ্রামে উদ্ভাবিত হয়। শ্রীখণ্ডের এই ঘরানার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন – গোবিন্দদাস কবিরাজ, শ্রীনিবাস আচার্য, রামচন্দ্র কবিরাজ, নরোত্তম দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। শ্রীখণ্ডের কীর্তন ঘরানা বাংলা কীর্তনের ইতিহাসে যুগান্তর ঘটিয়েছে।

তৃতীয় : নরহরি সরকারের অন্যতম কীর্তি বাংলাদেশে 'গৌরাঙ্গ' মূর্তি নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা ও গৌরাঙ্গ পূজা প্রচলন। অনেকে মনে করেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই প্রথম গৌরাঙ্গের পূজা শুরু করেছিলেন। তবে নরহরির গৌরাঙ্গ পূজা সমগ্র বাংলাদেশে অনেক বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নরহরির নির্দেশে যে গৌরাঙ্গ মূর্তি তিনটি তৈরি হয়েছিল তা কাটোয়া, শ্রীখণ্ড ও বীরভূমের একচক্রা গ্রামে আছে। স্মরণীয়, একমাত্র শ্রীখণ্ডেই 'গৌরাঙ্গ' মূর্তির পাশে 'বিষ্ণুপ্রিয়া'-র মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

চতুর্থ : বৈষ্ণব ধর্মের জগতে নরহরি যে গৌরনাগর ভাব-এর প্রচলন ঘটিয়েছিলেন, তা স্মরণীয়। তিনি বৈষ্ণব ধর্মকে রক্ষণশীলতার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মতামতকে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও অন্যান্য গোষ্ঠীর বৈষ্ণবরা না মানতে চাইলেও গৌরনাগরবাদ-এর অনুসারী রঘুনন্দন, লোচনদাস প্রমুখরা অন্যদের মতকে প্রাধান্য জানিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। এখানে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের উদারতা ও সমন্বয়বাদী চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। যার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত শ্রীনিবাস আচার্য ও রঘুনন্দনের উদ্যোগে শুরু হওয়া নরহরি তিরোধান উৎসব।

পঞ্চম : বৈষ্ণব ধর্ম ও প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে গৌরনাগর বাদী-দের অবদান। অনস্বীকার্য। এঁরা বাংলাদেশে বৃন্দাবনী তত্ত্ব প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করলেও বৃন্দাবনী অনুশাসন' মানেননি। তাঁরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটিয়েছেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ পন্থীর বৈষ্ণবদের সমান্তরালে তাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন। অব্রাহ্মণ নরহরি ও রঘুনন্দন চৈতন্য আদর্শানুসারী হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরাই চৈতন্যের জাত-ধর্মহীন বৈষ্ণব আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য নানা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

শ্রীপাট যাজিগ্রাম :

কাটোয়া ও শ্রীখণ্ডের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বর্ধমান জেলার অন্যতম শ্রীপাট যাজিগ্রাম। নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাজিগ্রাম সম্পর্কে জানিয়েছেন –

"অনেকে মনে করেন জাজিগ্রামের ডাঁটার সুমিষ্টতার জন্যই বুঝি জাজিগ্রামের প্রসিদ্ধি লাভের হেতু হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ... চৈতন্যদেবের সময় এবং তৎপরবর্তীকালে এই কাটোয়ায় এবং তৎসন্নিহিত বহু গ্রামে বহু মহারথী বৈষ্ণব মহাত্মাগণের সাধনাস্থল ছিল।"[৭৭]

সত্যিই যাজিগ্রাম ছিল চৈতন্যোত্তর যুগের মহান বৈষ্ণব শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, রামচন্দ্র কবিরাজ, হেমলতা ঠাকুরানি প্রমুখদের লীলাভূমি। যাজিগ্রাম চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হত। ইতিহাসের সঙ্গেও যাজিগ্রামের নাম জড়িয়ে আছে। তৎকালে যাজিগ্রাম খুব সমৃদ্ধশালী ব্রাহ্মণ প্রধান গণ্ড গ্রাম ছিল। তবে বর্গি হামলার ফলে এখানকার অধিবাসীরা পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধর্মের মানুষরা এখানে বসতি স্থাপন করেন।[৭৮] মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় মুসলমানদের হিন্দু বিদ্বেষ চূড়ান্ত হয়েছিল। তাঁদের অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দু মন্দির ও দেবদেবীরা পর্যন্ত নিষ্কৃতি পাচ্ছিল না। যবন অত্যাচারের ভয়ে তখন বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ জয়পুরের রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহের কাছে পাঠানো হয়। দ্বিতীয় জয়সিংহ পরম ধার্মিক ও বৈষ্ণব ধর্মে আস্থাবান ছিলেন। তাঁর সভাকবি ছিলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য। জয়সিংহের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল বৈষ্ণব ধর্মের স্বকীয়া ও পরকীয়া মতের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের একটি বিচারসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাজিগ্রামে। কৃষ্ণদেব শ্রীনিবাসের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্গে স্বকীয়া ও পরকীয়া মতবাদের বিচারে লিপ্ত হন। কিন্তু কৃষ্ণদেব বিচারে পরাজিত হয়ে শর্তানুসারে পরকীয়াবাদকে স্বীকার করে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৭৯] তবে প্রাচীন জনপদ যাজিগ্রাম ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বৈষ্ণব ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে ওঠে।

অগ্রদ্বীপের নিকটবর্তী ভাগীরথীর তীরে নদিয়া জেলাস্থিত চাখুন্দি গ্রাম নিবাসী ছিলেন গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়। তার উপাধি ছিল ভট্টাচার্য।[৮০] তিনি পড়াশুনার কারণে নবদ্বীপে আসেন। অধ্যাপনা শেষ করে তিনি নিজগ্রাম চাখুন্দিতে টোল খুলে জীবিকা নির্বাহ করেন। আর নবদ্বীপের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। এই সময়ে তিনি চৈতন্যের কথা শুনে মুগ্ধ হন। কাটোয়ার সন্নিকটে যাজিগ্রামের বলরাম আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এরপর চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনে গঙ্গাধর শোকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে 'হা-চৈতন্য' বলে ঘুরে বেড়ান। তাঁর এই পাগলপ্রায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এইভাবে –

"ঐছে কত কহি গঙ্গাধর বিবরে।
শ্রীচৈতন্যদাস বলি' ডাকে বারে বারে।।
শ্রীচৈতন্যদাস নাম শুনি আপনার।
করয়ে উত্তর, চিত্তে হর্ষ আনিবার।।
গঙ্গাধর পূর্ব নাম কেহ নাহি কয়।
শ্রীচৈতন্যদাস বলি সকলে ডাকয়।।"[৮১]

এরপর নিঃসন্তান চৈতন্যদাস ও লক্ষ্মীপ্রিয়া চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং পুত্রলাভের কামনায় নীলাচলে যান। চৈতন্যের আশীর্বাদে চাখুন্দিতে বৈশাখী পূর্ণিমার শুভদিনে ও শুভক্ষনে লক্ষ্মীপ্রিয়া একটি পুত্রের জন্ম দেন। তবে এই পুত্রের জন্ম পুর্বেই নির্ধারিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের দ্বারা। তিনি ষড় গোস্বামীর কাছে শ্রীনিবাসের লীলা প্রকাশের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। নিত্যানন্দ দাস সেই ঘটনার কথা বর্ণনা করে লিখেছেন –

"শ্রীনিবাস নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার।
সেই দ্বারে গৌড়ে লীলা করিবেন প্রচার।।
প্রেমরূপে তাঁরে জন্মাইব গৌড় দেশে।
আসিবেন শ্রীনিবাস লীলা অবশেষে।।
...
চৈতন্যদাসের ঘরে লক্ষ্মীপ্রিয়ার উদরে।
জন্মমাত্র রাধাকৃষ্ণ নামের প্রচারে।।

আচাণ্ডাল উদ্ধারিব আনন্দিত মনে।"[৮২]

চৈতন্যদেবের পরিকল্পনা ও ষড় গোস্বামীর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হল সেই শুভদিনে–

"বৈশাখী পূর্ণিমা দিবা রোহিণী-মুহূর্ত।

শুভক্ষনে লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রসবিল পুত্র।"[৮৩]

শ্রীনিবাসের জন্ম ও মৃত্যু সাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা বিতর্ক আছে। যাই হোক ১৫১৭-১৫২০ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীনিবাসের আবির্ভাব ও ১৬০৩-১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক বছরে তার তিরোভাব ঘটে। বাল্য বয়সে শ্রীনিবাস পিতার টোলে শাস্ত্রশিক্ষা এবং মায়ের কাছে নাম-সঙ্কীর্তন শিক্ষা শুরু করেন। অকালে পিতৃবিয়োগের পর ধনঞ্জয় বাচস্পতির টোলে শিক্ষা শেষ করে তিনি মায়ের সঙ্গে সেকালে সংস্কৃত চর্চার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র যাজিগ্রামে মাতুলালয়ে চলে আসেন।

শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে আসার কিছু পরে নরহরির সাক্ষাৎ পান। নরহরির নির্দেশে তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্যে যান। কিন্তু পথেই মহাপ্রভুর মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর আশাভঙ্গ হয়। এরপর তিনি বৃদ্ধা মাতৃদেবীর ইচ্ছায় নরহরি সরকারের নির্দেশে ও রঘুনন্দনের ঘটকালিত্বে যাজিগ্রামের জমিদার গোপাল চক্রবর্তীর কন্যা দ্রৌপদীকে বিয়ে করেন।[৮৪] বিয়ের পর দীক্ষান্তে দ্রৌপদী দেবীর নাম হয় ঈশ্বরী দেবী। শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করেন। সম্ভবত বৃন্দানন থেকে ফিরে আসার পর তাঁর দ্বিতীয় বিবাহটি হয়। বিষ্ণুপুর সংলগ্ন গোপালপুর নিবাসী (মতান্তরে, কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানার গোপালপুরে) রঘুনাথ চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়। পদ্মাবতী শ্রীনিবাসের রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই মনে মনে পতিরূপে বরণ করে নেন। কিছুটা জাহ্নবা দেবীর জোরাজুরির কারণে শ্রীনিবাসকে এই বিয়ে করতে হয়। বিয়ের পর পদ্মাবতী ও রঘুনাথ তাঁর কাছে দীক্ষা নেন। পদ্মাবতীর নাম হয় গৌরাঙ্গপ্রিয়া।[৮৫] প্রথম বিয়ের পর শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনে যান তখন রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী অপ্রকট হয়েছেন। তিনি গোপাল ভট্টের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোপাল ভট্ট মহাপ্রভুর প্রদত্ত ডোর দিয়ে শ্রীনিবাসকে দীক্ষা দেন। আর গোপাল ভট্টের নির্দেশে শ্রীজীব তাঁকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব শেখান।[৮৬] শ্রীনিবাস শিক্ষা শেষ করে বৃন্দাবনেই অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। পরে তিনি 'আচার্য-রত্ন' উপাধি লাভ করেন।[৮৭]

বৃন্দাবনে থাকাকালীন শ্রীনিবাসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বাংলার দুই প্রভাবশালী বৈষ্ণবের। তাঁরা হলেন, খেতুরির নরোত্তম দত্ত ও ধারেন্দার শ্যামানন্দ। নরোত্তম লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। এইসময় বাংলাদেশের বৈষ্ণবদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলাময় অবস্থা চলছিল। এই বিষয়ে আমরা সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। যাই হোক, বৃন্দাবনের গোস্বামী ও বৃন্দাবনে উপস্থিত বঙ্গের বৈষ্ণবদের যৌথ আলোচনায় বৃন্দাবনী শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলা দেশে পাঠানো হয়। শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই তিন পরম বৈষ্ণব কিছু সশস্ত্র প্রহরী ও লাল কাপড়ে বাঁধা পুথি নিয়ে বাংলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথে বিষ্ণুপুরে পুথি চুরি হয়ে যায়। এরপর বিষ্ণুপুরের রাজসভার পণ্ডিত ব্যসাচার্যকে ভাগবতপাঠ ও বিশ্লেষণে পরাস্ত করে শ্রীনিবাস, ব্যাসাচার্য এবং বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। বীরহাম্বিরের বৈষ্ণবীয় নাম হয় চৈতন্যদাস। লুণ্ঠিত পুথিগুলিও তিনি ফিরে পান। সম্ভবত বীরহাম্বিরের লোকজনই এই পুথিগুলি চুরি করে। শ্রীনিবাস শুধু বীরহাম্বিরকেই নয়, তাঁর স্ত্রী রাণী সুলক্ষণা ও রাজপুত্র ধাড়ী হাম্বিরকেও দীক্ষা দেন।[৮৮] শ্রীনিবাস মোট তিনবার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন।[৮৯] কিন্তু এই গ্রন্থ আনা ও গ্রন্থ চুরির ঘটনা কোন বার ঘটেছিল তা নিয়ে নানা মতবিরোধ আছে। আরও বিতর্ক আছে, শ্রীনিবাস বৃন্দাবন থেকে কি কি গ্রন্থ এনেছিলেন সেটা নিয়ে। যাই হোক, বঙ্গের বৈষ্ণবদের মধ্যে বৃন্দাবনী তত্ত্ব প্রয়োগ করার জন্য ১৫৮১ থেকে ১৫৮৪ মতান্তরে ১৬১০ থেকে ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীর খেতুরিতে বৈষ্ণব ধর্মের

সর্ববৃহৎ সম্মেলন খেতুরির মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই মহোৎসবের হোতা ছিলেন নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবী এবং অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। সম্ভবত এই বিরাট সম্মেলনের অর্থ যুগিয়েছিলেন খেতুরির রাজা সন্তোষ দত্ত ও বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বির প্রমুখ ধনী ব্যক্তিগণ। উত্তর বঙ্গে শাক্ত বামাচার প্রভাব অত্যন্ত ব্যপক ছিল। এখানে প্রচলিত দস্যু বৃত্তিধারী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্থানীয় জমিদাররা। তাই বৈষ্ণব ধর্মের সম্প্রসারণের জন্য খেতুরিকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল।[৯০] এই উৎসবেই শ্রীনিবাসের পৃষ্ঠপোষকতায় মনোহরশাহী কীর্তন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শ্রীনিবাসের শিষ্য গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের পদাবলিই ছিল এই মহোৎসবে আয়োজিত কীর্তনের মুখ্য আকর্ষণ।[৯১] খেতুরি সম্মেলনেই বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা রচিত শাস্ত্রসমূহ সর্ব বৈষ্ণব গ্রাহ্য হয়।

বৈষ্ণব ধর্মের খ্যাতনামা ব্যক্তি হওয়ার সত্ত্বেও শ্রীনিবাসের রীতিমতো একটা পারিবারিক জীবন ছিল। শ্রীনিবাসের তিন পুত্র ও চার কন্যা ছিল। পুত্ররা হলেন – বৃন্দাবন, রাধাবলভ ও গতি গোবিন্দ (মতান্তরে গোবিন্দ গতি); কন্যারা হলেন – হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কাঞ্চনলতিকা ও যমুনা দেবী। শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় পত্নী গৌরাঙ্গ প্রিয়ার গর্ভসঞ্চার হয় বীরভদ্রের আশীর্বাদে। তার ফলে জন্ম হয় গতি গোবিন্দের। সম্ভবত শ্রীনিবাসের প্রথম পত্নীর দুই পুত্র বৃন্দাবন ও রাধাবল্লভ মারা যাবার পর তিনি বংশরক্ষার্থে দ্বিতীয় বিয়ে করেন।[৯২] পরবর্তীকালে গতি গোবিন্দ যাজিগ্রাম শ্রীপাটের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। শ্রীনিবাসের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে গতি গোবিন্দ ও হেমলতা ঠাকুরানি বিশিষ্ট ছিলেন। গতি গোবিন্দ নিত্যানন্দ বিষয়ক দুটি পদ ও রাধাবিরহ বিষয়ক একটি পদ রচনা করেছিলেন। গতি গোবিন্দ ও তাঁর স্ত্রী চন্দ্রমুখীর পাঁচটি পুত্র ছিল। যথা কৃষ্ণপ্রসাদ, সুন্দরানন্দ, শ্রীহরি, সুবল ও রাধামাধব। কৃষ্ণপ্রসাদের দুই পুত্র ছিল, জগদানন্দ ও মধুসূদন।[৯৩] শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাঞ্চনলতিকাকে দীক্ষা দেন। হেমলতা ঠাকুরানি বৈষ্ণব ধর্মের এক স্বনামধন্যা সাধিকা ছিলেন। মণিপুর নিবাসী রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীবল্লভ চট্টরাজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। জনশ্রুতি আছে, গোপীবল্লভ বিয়ের সময় নিজের পদবি ত্যাগ করে শ্বশুর প্রদত্ত চট্টরাজ পদবী গ্রহণ করেন। সেই থেকে আজও শ্রীনিবাসের দৌহিত্রের বংশধররা চট্টরাজ পদবি ব্যবহার করেন। অন্যদিকে শ্রীনিবাসের পুত্রের বংশধররা আচার্য পদবির পরিবর্তে ঠাকুর পদবি ব্যবহার করেন। নারী হওয়া সত্ত্বেও হেমলতা দেবী পিতার ন্যায় ধর্মপ্রচারের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। শিষ্যবর্গের কাছে তিনি গুরুমা হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার সৈদাবাদ শহরের পার্শ্ববর্তী ভাগীরথীর অপর তীরে বুধুই পাড়া গ্রামে তাঁর শ্রীপাট আছে। হেমলতা দেবীর শিষ্যবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন 'কর্ণানন্দ' রচয়িতা যদুনন্দন দাস, গতিগোবিন্দের পুত্র সুবলচন্দ্র ঠাকুর প্রমুখ। যদুনন্দন হেমলতা সম্পর্কে লিখেছেন –

> "ঠাকুরাণীর গুণ ব্যাখ্যা করিব বা কত।
>
> যাহার ভজন রীত জগতে বিখ্যাত।"[৯৪]

অপর্ণা রায় লিখেছেন –

> "খেতুরী মহোৎসবের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীনিবাস আচার্য, তাঁর স্ত্রী দ্রৌপদী ও গৌরাঙ্গপ্রিয়া এবং কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর মান্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। গৌরাঙ্গপ্রিয়ার আদেশে গুরুচরণ দাস লেখেন, 'প্রেমামৃত'। তবে বঙ্গীয় জন মানসে দ্রৌপদী তথা ঈশ্বরী কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীরও সম্মান ছিল জাহ্নবার সমতুল্য। তিনি ছিলেন একাধারে মন্ত্রদাত্রী, ধর্ম প্রচারিকা, বৈষ্ণব ধর্ম শিক্ষয়িত্রী। স্পষ্টবাদী, তেজময়ী এই নারীরই আহ্বানে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা' গ্রন্থের রূপ কবিরাজকৃত, 'রাগানুগাবিবৃতি'র প্রতিবাদ করেন। শিষ্য যদুনন্দন দাস তাঁর 'কর্নানন্দ' গ্রন্থে হেমলতার জীবন নিয়ে প্রশস্তি রচনা করেন। মধ্যযুগের পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক অবকাঠামোয় নারীর এই সম্মান অর্জন নিতান্ত সহজ কথা ছিল না।"[৯৫]

গতি গোবিন্দের প্রপৌত্র (জগদানন্দের পুত্র) বৈষ্ণবকুলের গৌরব রাধামোহন ঠাকুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। শ্রীনিবাস জীবদ্দশায় যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন পুত্র ও প্রপৌত্র পরম্পরায় রাধামোহন ঠাকুর তাঁর পূর্ণতা দিয়েছিলেন। তিনিই জয়পুর রাজার সভাপণ্ডিতকে স্বকীয়া ও পরকীয়ার তত্ত্বে হারিয়ে দিয়েছিলেন এবং সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেবকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর অনবদ্য দান হল, অসংখ্য পদের সংকলন গ্রন্থ 'পদামৃত-সমুদ্র' এর সংকলন করা। রাধামোহন ঠাকুর তাঁর পরম পূর্ব পুরুষ শ্রীনিবাস আচার্যের মতো সুবিখ্যাত ভাগবত পাঠক ছিলেন। এটিই শ্রীনিবাসের মূল জীবিকা ছিল। শ্রীনিবাস অসাধারণ কবিত্ব শক্তির বলে ষড় গোস্বামী অষ্টক কিছু প্রার্থনা সঙ্গীত ও পাঁচটি পদ রচনা করেছিলেন।[৯৬] শ্রীনিবাসের একটি বড় শিষ্য পরিমণ্ডল ছিল। তাঁর শিষ্য শাখায় অনেক বৈষ্ণব ভাগবত ও পদকর্তার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর শিষ্যগণ ছিলেন– ছয় চক্রবর্তী, আট কবিরাজ, ছয় ঠাকুর ও এক রাজা।[৯৭] এই ছয় চক্রবর্তীরা হলেন – ক) শ্রীদাস চক্রবর্তী খ) শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্তী গ) শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্তী ঘ) শ্রীব্যাস চক্রবর্তী ঙ) শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী (বোরাকুলি নিবাসী পদকর্তা) চ) শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী মতান্তরে রামচরণ চক্রবর্তী। আট কবিরাজ হলেন – ক) রামচন্দ্র কবিরাজ খ) গোবিন্দদাস কবিরাজ গ) কর্ণপুর কবিরাজ ঘ) নৃসিংহ কবিরাজ ঙ) ভগবান কবিরাজ চ) বল্লবীকান্ত কবিরাজ ছ) গোপীরমণ কবিরাজ জ) গোকুল কবিরাজ। ছয় ঠাকুর হলেন – ক) রামকৃষ্ণ চট্টরাজ খ) কুমুদ চট্টরাজ গ)রাধাবল্লভ মণ্ডল ঘ) জয়রাম চক্রবর্তী ঙ) রূপ ঘটক চ) ঠাকুরদাস ঠাকুর। আর এক রাজা হলেন – বীরহাম্বির। এছাড়াও আরও অনেক পরম বৈষ্ণব তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

বর্ধিষ্ণু গ্রাম যাজিগ্রামের বৈষ্ণব শ্রীপাটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। এই শ্রীপাটে শ্রীনিবাস আচার্যের আদি আশ্রম, তমাল তলায় হেমলতা ঠাকুরানির স্থান, তমাল তলায় নরোত্তম দত্তের আসন, আচার্য প্রভু ও রামচন্দ্র কবিরাজের মিলনস্থল, ডাল-ঢালা পুকুর ইত্যাদি আছে। এই শ্রীপাটে 'গৌর-নিতাই'-এর ছোটো-বড়ো দুটি দারু মূর্তি, 'রাধারাণী'র দারু মূর্তি, হেমলতা দেবীর সেবিত কষ্টিপাথরের 'গোপাল' মূর্তি, বর্তমান সেবাইতদের কুলদেবতা 'রাধানাথ' ও 'রাধারাণী' বিগ্রহ, গোপাল ভট্টের থেকে পাওয়া শ্রীনিবাস সেবিত 'বংশীবদন শিলা', 'গিরিধারী মূর্তি', 'ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ', 'বিষ্ণু মূর্তি', গতিগোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত 'মদনগোপাল' বিগ্রহ এবং 'শালগ্রাম শিলা'। এখানে অন্যান্য শ্রীপাটের মতোই সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নানা সময়ে। বিগ্রহের আরতি, পূজা, কীর্তন, নামগান ও ভোগ সেবা হয়। দোল, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, কার্তিকের গোষ্ঠাষ্টমী তিথিতে শ্রীনিবাসের তিরোভাব উৎসব পালিত হয়। তিরোভাব তিথি উপলক্ষ্যে এখানে নামকীর্তন, পালাকীর্তন, মালসাভোগ, অন্নমহোৎসব ইত্যাদি হয়। বর্তমানে সেবাইতরা শ্রীপাটের সেবা পূজার ভার গ্রহণ করেছেন। সামান্য কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি ও ভক্তদের দানে এখানে বিগ্রহ সেবা চলে। বর্তমানে বিগ্রহ মন্দিরের অবস্থা খুবই খারাপ হওয়ার কারণে ইস্কন এখানে একটি নতুন মন্দির তৈরি করছেন। এই শ্রীপাটের নানা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যোগদান করেন। এমনকি মুসলিমরাও শ্রীনিবাসের তিরোধান তিথির অন্নমহোৎসবে যোগদান করেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে এখানে একটি মেলাও বসে। শ্রীপাটের উৎসবে পাশাপাশি অবস্থানকারী শাক্ত ধর্মালম্বী মানুষরাও নানা কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। কখনও অনুষ্ঠানের নাম কীর্তন বা পালাকীর্তনের আসরে শ্রোতার স্থানও গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের জগতে যাজিগ্রাম শ্রীপাটের অনেক অবদান আছে। যথা-

প্রথমত : সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র ও শ্রীনিবাস কর্তৃক চতুষ্পাঠী তৈরির ফলে বিদ্যা চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে যাজিগ্রামের খ্যাতি ছিল। তবে খেতুরি মহোৎসবের পর থেকেই শ্রীনিবাসের শ্রীপাট রূপে যাজিগ্রাম একটি শক্তিশালী বৈষ্ণব কেন্দ্রে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত : যাজিগ্রাম শ্রীপাটে অনেক বৈষ্ণব মহান্তের পদধূলি পড়েছে। জাহ্নবা দেবী, বীরভদ্র, রঘুনন্দন ঠাকুর, রামচন্দ্র কবিরাজ, অদ্বৈত আচার্যের পুত্রগণ, নরোত্তম ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই শ্রীপাটে কিছু সময় যাপন করে, তাঁদের প্রতিভা দ্বারা শ্রীপাটের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

তৃতীয়ত : বৈষ্ণব ধর্মের ঝঞ্ঝাযুক্ত অবস্থায় শ্রীনিবাস আচার্য শক্ত হাতে প্রতিরোধের রশি টেনে ধরেছিলেন। তৎকালীন সময়ে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব কেন্দ্র ছিল বা এমন কোনো বৈষ্ণব অনুষ্ঠান ছিল না, যেখানে শ্রীনিবাস আচার্যের আগমন ঘটেনি। বা তাঁর মতামত গৃহীত হয়নি। এইরকমই একটি উৎসব বা বৈষ্ণব সম্মেলনের যজ্ঞভূমি ছিল যাজিগ্রাম। শ্রীখণ্ড, কাটোয়া ও খেতুরিতে বৈষ্ণব সম্মেলন হওয়ার সময় শ্রীনিবাসের উদ্যোগে যাজিগ্রামেও একটি মহোৎসব হয়েছিল। এই মহোৎসবে নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র, অদ্বৈতপুত্র কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল এবং অন্যান্য বৈষ্ণবরা যোগদান করেছিলেন।

"মহা মহোৎসব হৈল আচার্য ভবনে।

সবে মহামত্ত হইলেন সঙ্কীর্তনে।।"[৯৮]

তিনি এরপর কাঞ্চন গড়িয়াতে মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে দ্বিজ হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব উদ্যাপিত করেন। তাঁর উদ্যোগে ও পরিকল্পনায় বোরাকুলি গ্রামে তাঁর[৯৯] প্রিয় শিষ্য শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কারণে মহোৎসব হয়েছিল। এই মহোৎসবে শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ থেকে বহু বৈষ্ণব এসেছিলেন।[১০০]

চতুর্থত : বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে শ্রীনিবাস আচার্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হল শাক্ত গোবিন্দদাস কবিরাজ ও

নিম্ন শ্রেণীর দস্যু জাতীয় রাজা বীরহাম্বিরকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করা। মহাপ্রভুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একটি বৃহৎ ক্ষেত্রের মানুকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য যে সমস্ত ভূমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – ক) মল্লভূম-বিষ্ণুপুর খ) মানভূম গ) সিংহভূম-চাইবাসা ঘ) ভট্টভূম-রামগড় ঙ) সামন্তভূম চ) বরাহভূম ছ) তুঙ্গভূম জ) ব্রাহ্মণভূম ঝ) শীরভূম ঞ) ধলভূম ট) ধনভূম ঠ) নাগভূম ড) বীরভূম এবং ঢ) শবরভূম-মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ।[১০১]

তবে তিনি মুলত রাঢ়দেশের বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক ছিলেন। বঙ্গদেশে বৃন্দাবনী তত্ত্ব প্রচারের মাধ্যমে চৈতন্যের আদর্শকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীনিবাস আচার্যের নিরন্তর প্রয়াস ছিল। বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের দলাদলি রোধের সক্রিয় প্রচেষ্টা করা এবং চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব আন্দোলনকে গতিশীল করে তোলার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য ও যাজিগ্রাম শ্রীপাটের অবদান অনস্বীকার্য।

শ্রীপাট কুলীনগ্রাম :

চৈতন্যদেবের অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশের একটি অন্যতম বৈষ্ণব শ্রীপাট ছিল কুলীনগ্রাম। দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত কুলীনগ্রাম চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ রামানন্দ বসুর শ্রীপাট এবং প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র হিসাবে খ্যাত। শুধু রামানন্দ বসুই নয়, কুলীনগ্রাম মালাধর বসু, সত্যরাজ খান ও হরিদাস ঠাকুরেরও লীলাক্ষেত্র। বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনে জৌগ্রাম ষ্টেশন ও মেইন লাইনে মেমারি স্টেশনে নেমে টোটো বা বাসে করে কুলীনগ্রাম শ্রীপাট। এখন দেখার বিষয় গ্রামের এমন বিচিত্র নাম কেন? জানা যায় কুলীন অর্থাৎ শীলযুক্ত বর্ধিষ্ণু লোকের বসবাসের জন্য গ্রামটি কুলীনগ্রাম নামে পরিচিত লাভ করেছিল।[১০২] আবার কেউ কেউ বলেন আগে এই অঞ্চলে কুলের বন থাকায় গ্রামের নাম কুলীন হয়েছে।[১০৩] নাম যাই হোক এই নামের স্থান মাহাত্ম প্রচুর। কুলীনগ্রামে সম্ভবত মাধবেন্দ্র পুরীর পায়ের ধুলো পড়েছিল। পরম বৈষ্ণব হরিদাস

ঠাকুরের আখড়া, দৈনিক একলক্ষ নাম জপকারী জগদানন্দের নিবাস, স্বকীয় ধর্মের উপাসক আত্মারাম ঠাকুরের জন্মস্থান[১০৪] এবং বিখ্যাত বসুবংশের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের জন্মভূমি ছিল কুলীনগ্রাম। কুলীনগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। এই গ্রামের উপর দিয়ে এককালে প্রবাহিত ছিল কংস নদী।[১০৫] বর্তমানে নদী লুপ্ত হলেও নদীর চিহ্ন গ্রামের বিভিন্ন স্থানে এখনও লক্ষ করা যায়। অনেকে মনে করেন পূর্বে কুলীনগ্রামে গড় ও খাত ছিল। কুলীনগ্রামের অন্তর্ভুক্ত চৈতন্যপুরে এইরকম একটি গড়ের নামানুসারে বসু রামানন্দের গড়বাড়ি আছে। শুধু তাই নয় স্বয়ং চৈতন্যদেব এই গ্রামের প্রশস্তি করে বলেছিলেন –

"প্রভু কহে কুলীন গ্রামে যে হয় কুকুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর।।
কুলীন গ্রামির ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়।।"[১০৬]

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকে বাংলাদেশে প্রথম কৃষ্ণকথার ঢেউ উঠেছিল বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে। এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ লিখছেন –

"নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য যখন জন্মাননি, তাঁর আগে বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে গুনরাজ খান বা মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য লিখে ভাগবত-ভক্তির স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। যবন হরিদাসের সিদ্ধির স্থানও কুলীনগাঁ।"[১০৭]

কুলজী পঞ্জিকা মতে, আদিশূর কন্যাকুজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচজন কায়স্তকেও এদেশে এনেছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন দশরথ বসু। দশরথ বসুই কুলীনগ্রামের বসু বংশের প্রথম পুরুষ। দশরথ দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মাইনগর থেকে কুলীনগ্রামে আসেন।[১০৮] দশরথের উত্তরপুরুষরা ছিলেন মালাধর বসু, সত্যরাজ খান, রামানন্দ বসু প্রমুখ। মালাধর বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্বপুরুষরা অতীতে একই বংশের সন্তান ছিলেন।[১০৯] কুলীনগ্রামের খ্যাতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ পরিবার বা বসু বংশের অন্যতম কৃতিপুরুষ বা সুপণ্ডিত মালাধর বসুর নাম। কুলীনগ্রামের মাহীনগর সমাজভুক্ত এই কুলীন কায়স্থ পরিবার সমাজে খুব ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তাঁরা বংশানুক্রমে মোটামুটিভাবে গৌড়ের রাজসভার নানা পদাধিকারী ছিলেন। মালাধর ছিলেন গৌড়ের সুলতান রুকুনুদ্দিন বারবক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) সভাসদ। মালাধর বসু আত্মপরিচয় দিয়ে লিখেছেন –

"বাপ ভগিরথ মোর মা ইন্দুমতি।
জার পুর্ণে হৈল মোর নারাঅনে মতি।।
সর্ব্বজনে পরিহার করিঞা বিনয়।
মালাধর বসু বলে গোবিন্দ সদয়।।"[১১০]

তিনি আরও লিখেছেন –

"গুণ নাহি, অধম মুঞি, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম – গুণরাজ খান।"[১১১]

কৃষ্ণের মহিমা প্রচারের উদ্দশ্যে মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য লেখেন চতুর্দশ শকাব্দে। তিনি সংস্কৃতের জটাজাল থেকে মুক্ত করে কৃষ্ণকথার সুধাভাণ্ডকে বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। 'শ্রীমদ্ভাগবত' (দশম ও একাদশ খণ্ড) ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অবলম্বনে মালাধর বসু বাংলাভাষায় এই বৈষ্ণব কাব্যটি রচনা করেন। মালাধর নিজের কাব্যের 'গোবিন্দবিজয়', 'গোবিন্দমঙ্গল' ইত্যাদি নামকরণ করছেন। কবি তাঁর কাব্য রচনাকাল সম্পর্কে জানিয়েছেন –

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।

চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।"[১১২]

অর্থাৎ চৈতন্যের আবির্ভাবের অনেক আগেই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য লেখা হয়। ভক্ত কবি মালাধর শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রাণনাথ বলে চৈতন্যদেবের মন জিতে নিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন –

"গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

তাহাঁ এক বাক্য তার আছে প্রেমময়।।

শ্রীনন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।

এই বাক্যে বিকাইলু তাঁর বংশের হাথ।।"[১১৩]

মধ্যযুগের অনুবাদ কাব্য হিসাবে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বৈষ্ণব সমাজে বহু সমাদৃতা একটি গ্রন্থ।

কুলীনগ্রামের কুলজী পঞ্জিকানুসারে মালাধর বসুর দুই পুত্র ছিলেন, কাশীনাথ ও লক্ষ্মীকান্ত বা সত্যরাজ খান। কাশীনাথের উত্তরপুরুষরাই বর্তমান বসু পরিবারের সদস্য। কারণ সত্যরাজ খানের পুত্র রামানন্দ বসু ছিলেন অকৃতদার বৈষ্ণব। এই বংশের প্রথম পুরুষ দশরথ, ত্রয়োদশ পুরুষ মালাধর বসু, চতুর্দশ পুরুষ সত্যরাজ খান ও পঞ্চদশ পুরুষ রামানন্দ বসু। সম্ভবত সত্যরাজ খানও গৌড়েশ্বরের অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন। কারণ 'সত্যরাজ খান' কোনো ব্যক্তি নাম নয় এটি সুলতান প্রদত্ত একটি উপাধি। অনেকে মনে করেন সত্যরাজ ও রামানন্দ একই ব্যক্তি। কিন্তু কৃষ্ণদাসের কাব্যে সেই সন্দেহের অবসান ঘটে। যথা –

"তরে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান।

প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন।।"[১১৪]

এছাড়া কুলীনগ্রামে সত্যরাজ প্রতিষ্ঠিত 'গোপেশ্বর শিব মন্দিরের গায়ের ফলকের লেখা থেকে জানা যায় – "বেত্রপাল শ্রীসত্যরাজ খাঁ তস্য পুত্র শ্রীরামানন্দ বসু ঠাকুরের গড়বাড়ি।" সত্যরাজ খাঁয়ের প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। প্রতিষ্ঠা লিপিসহ ইঁটের তৈরি এই শিব মন্দির অভিবক্ত বাংলাদেশে স্থাপিত একটি প্রাচীনতম মূর্তি। মন্দির চত্বরে একটি কালো শিলার ষাঁড়মূর্তি আছে। ষাঁড়মূর্তির গলকম্বলে একটি শ্লোক আছে। শ্লোকটি হল –

"শকে বিংশতি বেদৈকে মুক্ত্যর্থং শিব সন্নিধৌ।

খান শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোয়ং শিলাবৃয়ঃ।।"

গবেষকরা লিপির সঠিক পাঠোদ্ধার করে জানিয়েছেন ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে সত্যরাজ এই বৃষমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন।[১১৫] লোকশ্রুতি আছে সত্যরাজ খানের সময়েই হরিদাস ঠাকুর এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। যাই হোক, মালাধর পুত্র সত্যরাজ খান কুলীনগ্রামের এক প্রৌজ্জ্বল ব্যক্তি।

কুলীনগ্রাম ও চৈতন্যপুরের সীমান্ত অঞ্চলে রামানন্দের গড়বাড়ি অর্থাৎ কাছারি বাড়ির ভগ্নাবশেষ আজও রয়েছে। একটি শিব মন্দির ছাড়া কুলীনগ্রামে রামানন্দের স্মৃতি বিজড়িত আর কিছু নেই। আদতে তিনি ছিলেন এক মহান বৈষ্ণব। দক্ষিণ রাঢ়ের প্রভাবশালী বৈষ্ণব ব্যক্তিত্ব রামানন্দ বসু অকৃতদ্বার ছিলেন। রামানন্দ চৈতন্যদেবের অষ্ট পার্ষদের অন্যতম এক পার্ষদ ছিলেন। রামানন্দের পার্ষদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মধু পণ্ডিত, মকরধ্বজ কর, দ্বিজ রঘুনাথ, বিষ্ণুদাস, পুরন্দর মিশ্র, গোবিন্দাচার্য, পরমানন্দ গুপ্ত ও বলরাম দাস।[১১৬] চৈতন্যলীলা প্রতক্ষ্যদর্শী রামানন্দ, একজন সুকবি ও পদকর্তা ছিলেন। তিনি বাল্যলীলা, পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, মান, গোষ্ঠলীলা, আক্ষেপানুরাগ, মাথুর প্রভৃতি পর্যায়ের পদ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ পদই হারিয়ে গেছে। 'শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী', 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি পদ সংকলনে তাঁর কয়েকটি মাত্র পদের সন্ধান পাওয়া যায়।[১১৭] এই রামানন্দ বসুকেই চৈতন্যদেব রথযাত্রার। পট্টডোরি কুলীনগ্রাম থেকে নীলাচলে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস লিখছেন –

“কুলীন এমিরে কহে সম্মান করি।

প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রার পট্টডোরী লৈঞা।।”[১১৮]

চৈতন্যদেব নীলাচলে অবস্থানকালে পাণ্ডুবিজয় উৎসবে জগন্নাথ দেবের পটুডৌরী ছিড়ে যায়। তখন চৈতন্যদেব সেখানে উপস্থিত রামানন্দ ও সত্যরাজকে নির্দেশ দেন –

“কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিঞা সম্মান।।
এই পট্ট ডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতি বর্ষ আনিবে ডোরি করিঞা নির্মাণ।।
এত বলি দিল তাঁরে ছিণ্ডা পট্ট ডোরি।
ইহা দেখি করিবে ডোরি অতি দৃঢ় করি।
এই পট্টে ডডারিতে হয় শেষ অধিষ্ঠান।
দশ মূর্তি ধরি যিহোঁ সেবে ভগবান।।”[১১৯]

‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ থেকে আরও জানা যায়, মহাপ্রভুর পুরীতে অবস্থানের তৃতীয় বছর অর্থাৎ ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক থেকে কুলীনগ্রাম হতে এই পট্টডৌরী পাঠানো হত।

বিজয়রাম স্বামীর মতে, রেশম বস্ত্রকে ‘পট্টদাই’ বলা হত। দক্ষিণ ভারতীয় পটুদাই বাংলায় ‘পট্টডোরী’ রূপে উল্লিখিত হয়েছে। এটি সাধারণ কোনো দড়ি নয়। ভিতরে তুলো ভরে উপরে নানা রঙের রেশম সুতো দিয়ে অতি সুন্দরভাবে পাকানো এক বন্ধনী। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রথে তোলার সময় এবং রথ থেকে বিগ্রহ পড়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় রথের মধ্যে খুঁটির সঙ্গে শ্রীমন্দিরের রত্নবেদীতে অধিষ্ঠিত হলে এই ডোর দিয়ে বিগ্রহগুলির গলায় মালার ন্যায় সাজিয়ে রাখা হত। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থায় ছেদ পড়ে এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নির্দেশে তাঁর শিষ্য হরিদাস বসু এই পট্টডৌরী পাঠানোর দায়িত্ব নেয়। হরিদাস বসু বাঁকুড়া থেকে শিল্পী এনে পট্টডৌরী তৈরি করে নীলাচলে পাঠাতেন। তারপর হরিদাস ও তাঁর পুত্ররা এই ব্যবস্থা চালু রাখেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কাশীর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকিরণচন্দ্র দরবেজ মহারাজের আদেশে এই পট্টডৌরী প্রেরণের দায়িত্ব বিজয়কৃষ্ণ মঠের উপরে বর্তায়।[১২০]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের প্রেক্ষিতে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ভক্তগোষ্ঠী কীর্তন গানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের প্রভাবেই কুলীনগ্রামে এক ‘কীর্তনিয়া’ সমাজ গড়ে উঠেছিল। ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’এ এর উল্লেখ পাওয়া যায় –

“কুলীন গ্রামীর এক কীর্তনীয়া সমাজ।

তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ।।”[১২১]

রামানন্দ বসুর পরবর্তীতে কুলীনগ্রামে একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব ঘরানা গড়ে উঠেছিল। সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে কুলীনগ্রামের নিকটবর্তী দেবীপুর নিবাসী বিখ্যাত পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষ রেনেটি কীর্তনের প্রবর্তন করেন। এই অঞ্চল রেনেটি বা রাণীহাটি পরগণার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এইরকম নামকরণ। রেনেটি কীর্তনের সুর তরল, লয় ও ছন্দ সংক্ষিপ্ত, গতি ও মাত্রা দ্রুত এবং ছাব্বিশ তালের। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, টেঞা বৈদ্যপুরের বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধব দাস এই কীর্তন গানকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। রাজ্যেশ্বর মিত্র মনে করেন, রেনেটি কীর্তনের সুর তরল হলেও এর সুরের মাধুর্য অপূর্ব। অনেকে আবার রেনেটিকে ঠুংরির সঙ্গেও তুলনা করেছেন।[১২২] কুলীনগ্রাম থেকে কিছুটা দক্ষিণে মান্দারণ পরগণায় রেনেটি ঘরানা অপেক্ষা একটি তরল সুরের কীর্তন গানের প্রচলন হয়। যা মান্দারণী ঘরানা হিসাবে পরিচিতি লাভ

করে। মান্দারণী কীর্তন সমাজের প্রবর্তক ছিলেন বংশীবদন কীর্তনীয়া।[১২৩] এককথায় রামানন্দ বসু বৈষ্ণব ধর্মের বা সাহিত্যের জগতে এক উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব।

উনবিংশ শতাব্দীতে এসেও কুলীনগ্রামের বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডল ম্লান হয়ে যায়নি। কাশীনাথের বংশধর নিষ্ঠাবান ও সুলেখক হরিদাস বসু এই ঐতিহ্য ধরে রেখেছিলেন। ১২৬১ বঙ্গাব্দের ১০ই চৈত্র হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশ্বরূপ বসু ও মা ক্ষেৎৰমণি দাসী। শৈশব পিতৃমাতৃহীন হরিদাসের শিক্ষা জীবন কেটেছে দিনাজপুর ও হুগলি কলেজে। নানা অশান্তির কারণে কুলীনগ্রামে তাঁর জীবন অস্বস্তির মধ্যে কেটেছে। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম উপাসকের আচার আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই ধর্ম ত্যাগ করেন। তারপর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সান্নিধ্যে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইসময় হরিদাস তিনটি বই লেখেন, 'মহাপাতীর জীবনে সদগুরুর লীলা', 'সদগুরু ও সাধনতত্ত্ব' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৩২৬ বঙ্গাব্দ)। এই বইগুলোতে তিনি নিজের বংশের কথা ও জীবনের কথা, কুলীনগ্রামের সমসাময়িক ইতিবৃত্ত অর্থাৎ সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশের কথা এবং গুরু শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা তুলে ধরেন।[১২৪]

ষোড়শ শতকে বঙ্গদেশের ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম আলোড়ন হল বুঢ়ন গ্রাম নিবাসী। ভক্তিরসের সাধক যবন হরিদাসকে অদ্বৈতাচার্য কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দেওয়া। এই অদ্বৈতাচার্যের সহচার্যে এই আন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন যবন হরিদাস। গৃহত্যাগী হরিদাস সাধন ভজনের জন্য নানা নির্জন নিরাপদ বনাঞ্চলকে বেছে নিতেন। তিনি কিছুদিনের মধ্যে বেনাপোলে কুটির নির্মাণ করে ভজন সাধন করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি হরিধ্বনি দিয়ে বালকদের মধ্যে বাতাসা বিতরণ করতেন। তাঁর এই প্রথার অনুবৃত্তি করে এখনও বৈষ্ণব সমাজে নগর সংকীর্তনের সময় বাতাসা ছড়ানো হয়। হয়তো হরিদাস ঠাকুর এই নির্জনতার খোঁজেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র কুলীন গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে প্রায় দেড় কিমি দূরে নির্জন প্রান্তরে একটি পর্ণ কুটীরে সাধনা শুরু করেন। বর্তমানে এটিই হল কুলীনগ্রামের হরিদাস ঠাকুরের আখড়া বা 'হরিদাস গৌড়ীয় মঠ'। শোনা যায় এই স্থানে পরম সাধক জগদানন্দ পাঠকের গৃহ ও ভজনাশ্রম ছিল। কথিত আছে, অনন্ত চতুর্দশী তিথিতে তিনি কুলীনগ্রামে শুভ পদার্পণ করে চাতুর্মাস্য ব্রত উদযাপন করেন। পড়ে এখান থেকেই তিনি পুরী যাত্রা করেন এবং বাকি জীবনটা চৈতন্য সহচার্যে পুরীতেই কাটিয়ে দেন।[১২৫] আগে অনন্ত চতুর্দশীর দিন আখড়ার সুপ্রাচীন কদম গাছের নীচে হরিদাস ঠাকুরের বিগ্রহকে এনে উৎসব পালন কর হত। কিন্তু পরবর্তীকালের আশ্রম কর্তৃপক্ষের নানা অনীহার কারণে এই উৎসব বন্ধ হয়ে যায়। তখন গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে এই তিথিতে কদমগাছের নিচের বেদীতে মালসা ভোগ নিবেদন করেন। কথিত আছে, বসু পরিবারের এক সদস্য রাধারাণী বসু বর্তমান আশ্রম, মন্দির ও সেবাপূজার ব্যয়ভার চালানোর জন্য জমিদান করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ীয় মঠের নামে এই সম্পত্তি হস্তান্তর হয়।[১২৬] মন্দিরের সামনে একটি ইটের লিপি থেকে জানা যায় ১৯১১ সালে বৈদ্যপুর নিবাসী। দীননাথ নন্দী হরিদাসের কুটীরে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। বর্তমানে গৌড়ীয় মঠ মন্দির, সেবাইত ও সমস্ত কিছুর দায়িত্বে আছে।

জনশ্রুতি আছে, নিত্যানন্দের আদেশে চৈতন্যপার্ষদ ভাস্কর দাস, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও হরিদাসের ধ্যানস্থ মূর্তি বর্তমান মন্দিরে এবং জগন্নাথ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তবে স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস এই মন্দিরের দারু নির্মিত গৌরাঙ্গ মূর্তি রামানন্দ বসু প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই মন্দিরে 'রাধাকৃষ্ণ', 'নাড়ুগোপাল'-এর মূর্তি ও শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। নাটমন্দিরের সামনেই যবন হরিদাসের উত্তরমুখী মন্দির আছে। নির্দিষ্ট কোনো সময়ে বিগ্রহের অঙ্গরাগ করা হয়না। মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শুধুমাত্র মহাপ্রভুর রাজবেশ হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মশাল আরতির মধ্য দিয়ে বিগ্রহের নিত্যসেবা শুরু হয়। স্নান, বস্ত্র,

শৃঙ্গার, নিত্যপূজা, ভোগ (তিনবার ভোগ হয়) আরতি, শয়ন, গ্রন্থপাঠ, নামগান, পালাকীর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে বিগ্রহের নিত্যসেবা হয়। ঝুলন রথ, দোল, রাস, স্নানযাত্রা, জন্মাষ্টমী, প্রতি বছর আশ্বিন মাসে হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি এবং অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় মঠের বার্ষিক উৎসব মহাধুমধামে পালিত হয়। অগ্রহায়ণ পুর্ণিমার তাৎপর্য হল, অতীতের কোনো এক অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় চৈতন্যদেব পুরী যাওয়ার পথে বসু পরিবারের আমন্ত্রণে কুলীনগ্রামে এসে তিনদিন কাটায়। তখন তিনি হরিদাস মঠেও পদার্পণ করেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'এ এই ঘটনার সমর্থন মেলে। জয়ানন্দ জানিয়েছেন শান্তিপুর থেকে অসুয়া-কুলীনগ্রাম-দাঁতন-রেমুন্যা হয়ে চৈতন্য পুরী যাত্রা করেন।

"নানা মহোৎসবে। রজনী বঞ্চিয়া
সুরনদী কৈল বামে।
কাচমুনি বেড়া ডাহিনে থুইয়া
উত্তরিলা কুলীনগ্রামে।
...
গুণরাজ ছত্রী তনয় মহাশয়
নানা মহোৎসব করিয়া।
দেখিয়া প্রকাশ ঠাকুর হরিদাস
রহাইল চরণে ধরিয়া।"[১২৭]

এই কারণে এই তিথিতে উৎসবটি পালন করা হয়। এই উৎসবে গ্রামের মানুষ, বিভিন্ন স্থানের বৈষ্ণবৃন্দরা ও নানা স্থানের কীর্তনিয়ারা যোগ দেন। মঠের মহান্ত মহারাজরা ভক্তের দীক্ষা দেন। মঠের দক্ষিণ দিকে বাগানে সেবাইতদের কয়েকটি সমাধি আছে। হরিদাসের মৃত্যুতে স্বয়ং মহাপ্রভু মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন যা বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম ঐতিহ্য। বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে যবন হরিদাস একটি দৃষ্টান্তকারী উদাহরণ। আজকের সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের রক্তাক্ত কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত জগতে যবন হরিদাস খুবই প্রাসঙ্গিক।

প্রাক্-চৈতন্য যুগের অন্যতম বৈষ্ণব কেন্দ্র কুলীনগ্রামে শুধু হরিদাস ঠাকুরের আশ্রম নয়, মদনগোপাল মন্দিরের 'মদনগোপাল', 'শ্রীরাধিকা' ও 'শ্রীললিতা'র মূর্তি ভট্টাচার্য পাড়ায় একটি দালান মন্দিরে 'জগন্নাথ, বলরাম' ও 'সুভদ্রা'র মুর্তি রঘুনাথ মন্দিরে 'রাম', 'লক্ষণ', 'সীতা' ও 'হনুমান'-এর মূর্তি; গৌরপট্টহীন গোপেশ্বর শিব মন্দির; গ্রামের হাটতলায় পাথরের তৈরি 'শিবাণী' মূর্তি; মিত্রপাড়ায় কালুরায় নামে ধর্মঠাকুরের শিলা; চৈতন্যপুরে ভুবনেশ্বরী মন্দির এছাড়া গোপীনাথ মন্দিরে 'গোপীনাথ কৃষ্ণ' ও 'রাধিকা' বিগ্রহ বিশেষ ঐতিহ্য বহন করছে। মদনগোপাল মন্দিরে জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, রাস, কালীয়দমন উৎসব ও ১ লা মাঘে মন্দিরের সামনে অবস্থিত গোপাল দিঘির পাড়ে উত্তরায়ণের মেলা হয়। ভাদ্রমাসের রাধাষ্টমীর পরের তিথিতে এখানকার কালীয়দমন অনুষ্ঠানটি খুবই সুন্দর। কৃষ্ণের কালীয়দমন ঘটনার অনুকরণ করে কাঠের সাপ, কলার ভেলা দিয়ে মাঝ দিঘিতে অনুষ্ঠান হয়। মদনমোহন মন্দিরটি উড়িষ্যা স্থাপত্যের শৈলীতে তৈরি হয়েছে। ভট্টাচার্য পাড়ার জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ বিগ্রহ ছাড়া কষ্টিপাথরের 'বিষ্ণু মূর্তি', 'গরুর মূর্তি', 'স্নানযাত্রার বেদী' ও 'কুলীনগ্রামের রথ' আছে। নিকটেই রঘুনাথ মন্দির জগন্নাথের মাসির বাড়ি বা গুচিড়া বাড়ি হিসাবে পরিচিত। কাশীর বিজয়কৃষ্ণ মঠ নীলাচলে রথের পট্টডৌরী পাঠানোর দায়িত্ব নেওয়ার আগে থেকেই কুলীনগ্রামের বসু পরিবার এই প্রথায় ছেদ ঘটিয়ে দেন। কুলীনগ্রামের রথের উৎসব আনুমানিক সাড়ে চারশো বছরের পুরনো। কিন্তু বর্তমানের রথটি খুব বেশি পুরনো নয়। স্নানযাত্রার উৎসবটি এখানে বিশেষ বৈচিত্র্যের সঙ্গে পালন করা হয়। সব মিলিয়ে কুলীনগ্রাম বৈষ্ণব ও চৈতন্যপ্রভাব মণ্ডিত একটি ঐশীগ্রাম, যার

ঐতিহ্য সদা উজ্জলমান। শুধু বৈষ্ণব সংস্কৃতিই নয় বর্ধমানের অন্যান্য অঞ্চলগুলির মতো এখানেও শাক্ত ও বৈষ্ণব সংস্কৃতি মিলেমিশে পাশাপাশি সহাবস্থান করছে।

শ্রীপাট অগ্রদ্বীপ :

বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত প্রাচীন জনপদ, বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ হল অগ্রদ্বীপ। হাওড়া কাটোয়া রেলপথে হাওড়া থেকে ১৩১ কি.মি. দূরে অগ্রদ্বীপ ষ্টেশন। অগ্রদ্বীপ ষ্টেশন থেকে ইঞ্জিন ভ্যান বা টোটো করে খেয়াঘাট। সেখান থেকে নৌকোয় গঙ্গা পেরিয়ে কিছুদূর হাঁটলেই শ্রীপাট অগ্রদ্বীপ। বর্তমানে অগ্রদ্বীপ ভাগীরথীর উত্তরতীরে অবস্থিত। পূর্বে অগ্রদ্বীপ ভাগীরথীর বামতীরে ও নদিয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। পরিবর্তনশীল ভাগীরথীর নদীখাতের পরিবর্তন ও বিধ্বংসী বন্যার ফলে ভৌগোলিক মানচিত্রে অগ্রদ্বীপের স্থান বারংবার পরিবর্তিত হয়েছে। ভ্যানড্রেন ব্রুক ও রেনেলের মানচিত্রে ভাগীরথীর বামতীরে অগ্রদ্বীপকে দেখা যায়। হেনরি মার্টিনও ১৮০৬ সালে অগ্রদ্বীপকে ভাগীরথীর বামতীরে দেখেছিলেন। ১৮২০ সালের বিধ্বংসী বন্যায় নদীখাতের প্রবল পরিবর্তন হয়। ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত রেভারেণ্ড লঙের বিবরণী এবং ১৯১৭ সালে প্রকাশিত সার্ভের মানচিত্রে অগ্রদ্বীপের অবস্থিতি ছিল ভাগীরথীর দক্ষিণদিকে। সম্ভবত ১৯১৯ সালের বিধ্বংসী বন্যার ফলে নদীখাত পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে ভাগীরথীর উত্তরতীরে অগ্রদ্বীপ অবস্থিত। এই পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়, অগ্রদ্বীপের উত্তরে মরিগঙ্গার খাত ও ভালশুনির বিল দেখে। অগ্রদ্বীপের দক্ষিণে প্রবাহিত সাইনী খাল ও পাঠান নালা দিয়ে ভাগীরথীর সঙ্গে ব্রাহ্মাণী ও খড়ি বা খড়োশ্বরী নদীর যোগাযোগ ছিল।[১২৮]

অগ্রদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থিতির মতো অগ্রদ্বীপের নামকরণ নিয়েও নানা দোলাচল আছে। অগ্রদ্বীপ কথার অভিধানিক অর্থ হল 'আগে বা প্রথমে যে দ্বীপ জেগে ওঠে'। 'অগ্রে উৎপন্নং দ্বীপ, দ্বয়োর্গত আপো স্পিন্নিত দ্বীপ'। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে অগ্রদ্বীপের উল্লেখ আছে। ভাগীরথীর গর্ভে চর পড়ে প্রথমে যে দ্বীপ বা ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল তাই অগ্রদ্বীপ।[১২৯] 'জার্নাল অব দি সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এ প্রকাশিত ভ্যানড্রেক ব্রুকের ১৬৬০ সালে অঙ্কিত মানচিত্রে ভাগীরথীর বামতীরে হগদীয়া ও ডানতীরে গাজিপুর ছিল। এই হগদীয়াই অগ্রদ্বীপ। মি. উইলফোর্ড এই গ্রামকে আগনগর বলেছেন। আবার ঐতিহাসিক হান্টার 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল' (দ্বিতীয় ভলুউম)-এ অগ্রদ্বীপ এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত 'গোপীনাথ' দ্বারা ভক্ত গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৩০] বর্ধমান জেলার গেজেটিয়ারে পিটারসন অগ্রদ্বীপ সম্পর্কে লিখেছেন –

> "Agradwip is a famous place of pilgrimage and contains a temple of Gopinath at which some ten thousand pilgrims gather every April."[১৩১]

ঐশীভূমি অগ্রদ্বীপ ও গোপীনাথের কথা নানা সাহিত্যে পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য, গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' (১১৫৮), কবি বিজয়রাম সেন বা গুপ্তের 'তীর্থঙ্গল' (১১৭৮ সালের নদীপথের বিবরণ), ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য, 'বিশ্বকোষ', কাশীরাম দাসের সহোদর গদাধর দাসের 'জগন্নাথ মঙ্গল' / 'জগৎ মঙ্গল' ইত্যাদি গ্রন্থে অগ্রদ্বীপের কথা পাওয়া যায়।[১৩২] ইতিহাসেও অগ্রদ্বীপের নাম বারবার এসেছে। ১৭৭৯ সালে রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় হুগলি থেকে একটি রাজপথ অম্বিকা কালনা, মির্জাপুর, জাহান্নগর হয়ে পাটুলি পর্যন্ত আছে। সেখানে নদী পারাপারের ব্যবস্থা ছিল। ওই পথ ধরেই ১৭৫৭ সালে ১৭ ই জুলাই রবার্ট ক্লাইভ পাটুলিতে এসে স্বসৈন্যশিবির স্থাপন করেন। সিরাজদ্দউলার পতনের পর ১৭ই জুন। মীরজাফর কিছু সৈন্য নিয়ে অগ্রদ্বীপে এসে অন্য ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হয়।[১৩৩] পাটুলি, কাটোয়া, দাইহাঁটের মাতা অগ্রদ্বীপেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্য শিবির ছিল। মীরকাশিমকে বাদ দিয়ে কোম্পানি

মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসালে, মীরকাশিমের সেনাপতি হায়বৎউল্লা ও তকি খাঁর সঙ্গে অগ্রদ্বীপ এবং কাটোয়ার ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ তকি খাঁ মারা যান।[১৩৪]

অগ্রদ্বীপ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে ধর্মের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তা হল চৈত্রের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী উৎসব বা বারুণী স্নান। কি এই বারুণী উৎসব? বারুণী উৎসব সম্পর্কে কালীচরণ দাস লিখেছেন –

> "বারুণী উৎসব আসলে নব-বর্ষোৎসব। পৃথিবীর বার্ষিক গতি, আহ্নিক গতি ও চাঁদের পক্ষকাল তিথি, এ-গুলির মধ্যে সমতা নেই। তাই অতীতে যে-দিনে বর্ষ শুরু হল বলে আদি মানুষেরা আনন্দে মেতে উঠতেন, সময়ের প্রবাহে সে-দিনটি ক্রমশ কাল-ব্যবধানের শিকার হয়ে চৈত্রের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে হাজির হয়েছে। বিজয়া দশমী, দোল পূর্ণিমা, দশহরা ইত্যাদি সম্পর্কেও ওই একই রকম বিধি প্রযোজ্য। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে চন্দ্র শতভিষা নক্ষত্রে অবস্থান করে। জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে শতভিষার অধিপতি হচ্ছেন বারুণ। প্রতি মাসেই চন্দ্র শতভিষা নক্ষত্রে থাকে কিন্তু প্রতি মাসে বারুণী উৎসব হয় না। কারণ কোনও এক-কালে বিশেষ এক কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে বারুণীর দিন থেকেই নববর্ষ গণনা শুরু হয়েছিল। তাই একমাত্র চৈত্রের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতেই বারুণী। জ্যোতিষীরা গ্রন্থ নক্ষত্রের গতিবিধি হিসেব থেকে গণনা করে দেখেছেন প্রায় খ্রিস্টপূর্ব পাঁচহাজার বছর আগে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে নববর্ষ শুরু হয়েছিল।"[১৩৫]

তবে পাঁচ-সাত হাজার বছরের পুরানো হলেও অগ্রদ্বীপের বারুণী উৎসব অনেক প্রাচীন। গোপীনাথের প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই এখানে বারুণী উৎসব হয়। স্মৃতিকারেরা মনে করেন, শতবার সূর্যগ্রহণের পরে স্নান করলে যে পুণ্য হয়, একবার বারুণী স্নান করলে সমপরিমাণ পুণ্য হয়। বারাণসীতে গঙ্গা স্নান করা ও অগ্রদ্বীপের ঘাটে বারুণী স্নান করা একই। জনশ্রুতি আছে, উজ্জয়নির রাজা বিক্রমকেশরীও বারুণীতে অগ্রদ্বীপে স্নান করতেন। তাই অনেককাল আগে থেকেই হাজার হাজার পুণ্যলাভের আশায় বারুণী উৎসবে অগ্রদ্বীপে স্নান করতে আসছেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে এখানে মেলা বসতো। বিহার, উড়িষ্যা, যশোর, রাজশাহী ইত্যাদি স্থান থেকে পুণ্যার্থীরা অগ্রদ্বীপে স্নান করতে আসতেন। উনবিংশ শতকে গঙ্গাসাগরের মেলার থেকে বারুণী উৎসব অনেক বেশি জাঁকজমক পূর্ণ ছিল। এখানে আগে মহিলারা সন্তান বিসর্জন দিতেন। ১৮১২ সালে বারুণী উৎসব উপলক্ষ্যে অগ্রদ্বীপে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ এসেছিলেন।[১৩৬] রেভারেণ্ড জেমস লঙের বিবরণী থেকে জানা যায় –

> "In 1823 Agradwip mela was attended by 100000 persons, in 1813 two women cast their children into the river. The Banks of the Bhagirathi"[১৩৭]

তবে বর্তমানে বারুণী উৎসবের সঙ্গে লৌকিক আচার মিশে এটি আমবারুণী উৎসব নামে পরিচিতি লাভ করেছে। গৃহস্থ তাঁর গাছের কচি আম নদীকে উৎসর্গ করে তারপর খায়। এই দিন অগ্রদ্বীপের সমস্ত বাড়িতে আম দিয়ে রান্না হয়। সব ব্যঞ্জনে আম দেওয়া হয়।[১৩৮]

এবার আশা যাক, অগ্রদ্বীপ ও গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের প্রাণনাথ গোপীনাথ-এর কথায়। গোবিন্দ ঘোষ ছিলেন গোপীনাথ-এর প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু বিশ্বকোষ এর প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে, কাশীপুর বিষ্ণুতলা নিবাসী বাসুদেব ঘোষ অগ্রদ্বীপে গোপীনাথকে প্রতিষ্ঠিত করেন।[১৩৯] কিন্তু শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বৈষ্ণবতলা বাসী গোবিন্দ ঘোষ গোপীনাথ প্রতিষ্ঠা করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার সাবডিভিশন কাঁদির অন্তর্গত রসোড়া গ্রামে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশে গোপালচন্দ্র ঘোষ নামে বৈষ্ণব ধর্মালম্বী এক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বাস করতেন। তাঁর পুত্র বল্লভচন্দ্র ঘোষ অনিবার্য কারণে পৈত্রিক নিবাস রসোড়া ছেড়ে বর্ধমানের কুলাই গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। বল্লভঘোষও ধর্মপ্রাণাধিক্য লোক ছিলেন। বল্লভের তিন স্ত্রীর ৯ টি সন্তান ছিল

(মতান্তরে দুই স্ত্রীর ৬ টি সন্তান ছিল)। প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র – বসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব; দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র - দনুজারি, কংসারি ও মীনকেতন; তৃতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র – জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ।[১৪০] এঁদের মধ্যে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব নবদ্বীপে এসে চৈতন্যাশ্রয় লাভ করেন। গোবিন্দের অন্য ভাইরা কুলাইয়েই থেকে যান। তারা ক্রমান্বয়ে কুলাই, দিনাজপুর, জগদানন্দপুরে অন্যতম বৈষ্ণব ব্যাক্তিত্ব হিসেবে বসবাস শুরু করেন। তাই কুলজী পঞ্জিকায় বলা হয়েছে –

"ধন্যরে গোপাল ঘোষ সকলি বৈষ্ণব।
যে কুলে জন্মিলা বাসু গোবিন্দ মাধব।।"[১৪১]

গোবিন্দ, বাসুদেব ও মাধব বিশিষ্ট পদকর্তা ও কীর্তনিয়া ছিলেন। পদকল্পতরুতে গোবিন্দ ঘোষের ভণিতায় ৬ টি পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গোপীনাথ আচার্য রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে গৌড়বাসীদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিলেন, গোবিন্দ, বাসুদেব ও মাধব হল প্রভুকে সন্তোষ দানকারী কীর্তনিয়া।[১৪২] কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন –

"গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়।।
মাধব বাসুদেব ঘোষ দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর।।"[১৪৩]

দেবতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক কাহিনির জন্ম হয়। অগ্রদ্বীপে 'গোপীনাথ' প্রতিষ্ঠারও একটি কাহিনি আছে। চৈতন্যদেব সপার্ষদ তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। সকল পার্ষদবৃন্দের সঙ্গে গোবিন্দ ঘোষও ছিলেন। পরিক্রমা করতে করতে তিনি অগ্রদ্বীপে এসে পৌছলেন। একদিন চৈতন্যদেব দুপুরে ভিক্ষার (আহারের পর মুখশুদ্ধি হিসাবে কিছু প্রার্থনা করেন। তৎক্ষণাৎ গোবিন্দ ঘোষ একটি হরিতকি টুকরো দেন। এত তাড়াতাড়ি গোবিন্দ কোথা থেকে হরিতকি পেলেন, তাঁর সন্ধান করতেই গোবিন্দ বলেন পূর্বে সঞ্চিত করা ছিল। প্রভু এই কথা শুনে গোবিন্দকে তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করতে বলেন। কারণ নিস্কাম বৈরাগী সন্ন্যাসীর সঞ্চয় স্পৃহা থাকতে নেই। এই সঞ্চয় থেকেই মানুষের ধীরে ধীরে মোহ জন্ম নেয়। গোবিন্দ ঘোষ অনেক অশ্রুপাত ও কাকুতি মিনতি করে বলেন, তিনি চৈতন্যকে পুত্রবৎ সেবা করেন। তাঁকে যেন এই শাস্তি না দেওয়া হয়। চৈতন্য তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেন, গোবিন্দ যেন অগ্রদ্বীপে থেকেই তাঁর সাধনভজন করেন। ক্রমেই তাঁর জীবনে বিশেষ কিছু প্রাপ্তি ঘটবে। এরপর মহাপ্রভু চলে যান। তারপর থেকে সামান্য ভিক্ষা গ্রহণ করে সর্বক্ষণ ঈশ্বরের নাম জপ করে গোবিন্দ দিন অতিবাহিত করেন। একদিন ভাগীরথীতে স্নান স্তব করার সময় একটি পোড়া কাঠ তাঁর পিঠে ঠেকে। সেই কাঠটি বারংবার তাঁর জপে বাঁধা সৃষ্টি করায় তিনি কাঠটি নদীর পাড়ে তুলে রাখেন। নদী থেকে বাড়ি এসে নিত্য কাজ ও নাম জপের মধ্যে সেই কথা ভুলে যান। রাত্রে স্বদেশে পান গোবিন্দ যেন ঐ কাঠ তুলে এনে কৃষ্ণের মূর্তি করে সেবা। প্রতিষ্ঠা করেন। কিছু পরে সেই কাঠখণ্ড ব্রহ্মশিলা খণ্ডে পরিণত হয়। গোবিন্দ ঘোষ জনৈক ভাস্করের দ্বারা সেই ব্রহ্মশিলা দিয়ে গোপীনাথ-এর মূর্তি তৈরি করিয়ে অগ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্রহ্মশিলা নিয়েও একটি জনশ্রুতি আছে। চৈতন্য তীর্থ ভ্রমণকালে গৌড়ের বাদশাহের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হন। রাজ ভবনের বহির্দ্বারের শীর্ষ স্থানে চৈতন্য একটি কালো পাথর দেখতে পান। সেই কালো পাথর দেখে তিনি চিনতে পারেন সেটি ব্রহ্মশিলা। চৈতন্য সেই পাথরটি অনেক অনুরোধ করে রাজার থেকে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। গোবিন্দ সেই শিলাই পেয়েছিলেন। ব্রহ্মশিলা পরীক্ষা করা যায় হস্তলিপি পদ্ধতি দ্বারা। হস্তলিপি একপ্রকার তান্ত্রিক আরাধনা। একটি নিরক্ষরা সুলক্ষণা ব্রাহ্মণ কন্যাকে তিন দিন নানা তান্ত্রিক কাজ ও সিদ্ধমন্ত্রের সাহায্যে সিদ্ধ করে তার হাতে একটি খড়ি দিতে প্রশ্নের উত্তর লিখতে আদেশ করলে কন্যা যা লেখে, তাই হল হস্তলিপি।[১৪৪] তবে

চৈতন্যদেব কোন পদ্ধতিতে শিলা পরীক্ষা করেছিলন তা অজানা। এবার ফিরে আসা যাক আসল কথায়। 'গৌরপদ-তরঙ্গিনী' থেকে জানা যায়, মহাপ্রভু গোবিন্দ ঘোষকে গোপীনাথের সেবা প্রতিষ্ঠা করে বিয়ে করার আদেশ দেন। গোবিন্দ সেই আদেশ পালন করে 'গোপীনাথ'-কে পুত্রবৎ সেবা করেন এবং অগ্রদ্বীপের নিকটবর্তী কাশীপুর বিষ্ণুতলার সিংহ বংশের কন্যাকে বিয়ে করেন।[১৪৫] গোবিন্দ ঘোষের একটি পুত্র জন্মায়। কালের পরিহাসে গোবিন্দের স্ত্রী, পুত্র সকলে মারা যায়। তখন গোবিন্দ মনের দুঃখে 'গোপীনাথ'কে পুত্র কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ করে তাঁর সেবা পূজা বন্ধ করে দেন। গোবিন্দ হা-হুতাশ করেন মৃত্যুর পর কে তাঁর শ্রাদ্ধ ও ক্রিয়াকর্ম করবে। তখন গোপীনাথ গোবিন্দকে কথা দেন, 'গোপীনাথ'ই তাঁর শ্রাদ্ধ করবেন। এরপর গোবিন্দ ঘোষের মৃত্যুর পর গোপীনাথ তাঁর শ্রাদ্ধ কর্ম করেন। সেই থেকে এই প্রথা আজও চলে আসছে। চৈত্রের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে অর্থাৎ বারুণী উৎসবের দুইদিন আগে হাজার হাজার ভক্তকুলের সামনে পরনে কাছা, হাতে কুশাঙ্গরীয় ও পিণ্ড তুণ্ডুল নিয়ে স্বয়ং গোপীনাথ ভক্ত প্রবর গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ করেন। ভক্তের ভগবানের এই লোকায়ন দৃশ্য বড়ই চমৎকৃত।

গোবিন্দ ঘোষ যে শুভদিন, শুভদণ্ড ও শুভমুহূর্ত নবীন, নীরদ, সুঠাম, সুবঙ্কিম 'শ্রীশ্রীগোপীনাথ' তাঁর পর্ণকুটীরে প্রতিষ্ঠা করেন সেই দিন তাঁর কুটীর দেবালয়ে পরিণত হয়েছিল। আর ভাগীরথী তীরবর্তী অগ্রদ্বীপের তীর্থ মাহাত্ম আরও বেড়ে গিয়েছিল। এ ব্যতীত 'গোপীনাথ'এর মেলা বা গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব তিথির উৎসব অগ্রদ্বীপকে মহাতীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছে। অগ্রদ্বীপে শুধু 'গোপীনাথ'ই নয় সাহেবধনী সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবক্তা চরণপালেরও মহোৎসব হয়। এই চরণপালের মহোৎসবকে ঘিরেও আছে। একটি লোকায়ত কাহিনি। আমরা জানি, চৈতন্য অপ্রকট হওয়ার পর বাংলার মূল বৈষ্ণব ধর্ম নানা খাতে বইতে শুরু করেছিল। তারই একটি উপশাখা হল সাহেবধনী সম্প্রদায়। চরণ পালের জন্ম পল্লব গোপ বংশে। নদিয়া জেলার খড়িয়া নদীর তীরে হুদা লক্ষণগাছা গ্রাম বা দোগাছি গ্রাম নিবাসী দুঃখীরাম পালের পুত্র হল চরণ পাল। তিনি এক উদাসীন ব্যক্তিকে বন্ধ্যা গরুর দুধ খাইয়ে ছিলেন। সেই উদাসীন ব্যক্তির আশীর্বাদ অগ্রদ্বীপে এসে চরণপাল বাকসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁদের ইস্ট দেবতা হলেন দীনদয়াল। তাঁর সম্প্রদায়ের মতে তিনি দীনদয়ালকে পেয়েছিলেন চরণ পালের অনেক শিষ্য আছে। অগ্রদ্বীপের মেলাতে চরণ পালের শিষ্যরা এসে মহা সমারোহে মহোৎসব পালন করেন। সারা বছরের ভিক্ষার্থ দিয়ে তাঁরা এই মহোৎসব করেন। 'গোপীনাথ'-এর উৎসবের প্রথম দিনে অর্থাৎ একাদশীতে চিড়ে মহোৎসব হয়, পরের দিন অন্ন মহোৎসব, তারপর ত্রয়োদশীতে বারুণী স্নান। অগ্রদ্বীপের মহোৎসবে নানা ধর্মের মানুষের আনাগোনা হয়। মেলায় কীর্তনের আসর, নাম গান ও লোকসঙ্গীতের আসর বসে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা এখানে আখড়া করেন তিনদিন ধরে। চৈতন্যের ভাবান্দোলনের ফলে গ্রাম বাংলায় যে উপধর্ম গজিয়ে উঠেছিল তাঁর বেশির ভাগই দেখা মেলে 'গোপীনাথ'এর মেলায়। লীনা চাকী লিখেছেন –

> "অগ্রদ্বীপের মেলা যেন মিনি কুম্ভমেলা। বাংলার যত জীবিত গৌণধর্ম আছে তাঁদের এক প্রদর্শনী যেন এই মেলাতেই। বাউল, ফকির, সাহেবধনি, তান্ত্রিক, অঘোরি, কাঠিয়াবাবা, কণ্ঠধারী আরও যে কত কিসিমের সাধু। যে যার মতো বহিরবেশ চিহ্ন নিয়ে বসে।
>
> এই মেলা মূলত বৈষ্ণবদের যে কোনো গৌণ ধর্মাশ্রিত মেলার মতোই এখানে এদেরও ভিড় জমে। কোন ধর্মীয় অনুশাসন নেই, চোখ রাঙানি নেই, যে মানুষগুলি বেদাশ্রিত ধর্মের চাপে নিজেদের দীনাতিদীন করে রাখে, লুকিয়ে রাখে মেলায় এসে তারাই নিজেদের কেমন মেলে ধরে।"[১৪৬]

একাদশীতে চিড়ে মহোৎসবের দিন সকল ভক্তগণ নিজের গাছের প্রথম ফল বা আনাজ এনে উৎসর্গ করেন 'গোপীনাথ'এর উদ্দেশ্যে। মালসা করে চিড়ে, দই, বাতাসা, সন্দেশ, মঠ ইত্যাদি এনে 'গোপীনাথ'কে পূজা দেন। প্রত্যেকেই সাক্ষী হতে চান সেই মাহেন্দ্র মুহূর্তের। যখন ভক্তের ভগবান ভক্তের ডাকে সাড়া

দিয়ে মানুষের মাঝে আসেন। আখড়াগুলোতেও সেইদিন চিড়ে মহোৎসব পালন করা হয়। দ্বাদশী অর্থাৎ পরের দিন অন্ন মহোৎসব হয়। অন্ন মহোৎসবের জন্যও একটি বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। আখড়াগুলোতে বড় বড় তিনটে গর্ত করা হয় আগের দিন। গর্তগুলোকে গোবর দিয়ে নিকিয়ে, রোদে শুকিয়ে, ভালো করে হলুদ ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর পরের দিন গর্ততে ভাত, ডাল, তরকারি ঢালা হয়। হিন্দু-মুসলিম, জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ এই মহোৎসবে একসঙ্গে খায়। মেলাতে নাগরদোলা, নানা দোকান- পাসার, খাবারের দোকান, খেলনার দোকান ইত্যাদি বসে। দূরদুরান্তের বহু মানুষ গোপীনাথকে দর্শন করার জন্য মেলাতে এসে হাজির হয়। এই মেলা খুব সাত্বিক ও পবিত্র। কোনো বাজে সংসর্ব মেলাতে দেখা যায় না। ভক্তদের বিশ্বাস, চৈত্র মাসে মেলা হওয়া সত্ত্বেও এই তিনদিন কোনো ঝড় বৃষ্টি হয় না। মেলাতে প্রশাসনিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে। জনসাধারণের জন্য অস্থায়ী শৌচালয় ও পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকে। মেলাতেই মেলে নানা লোকশিল্প ও শিল্পীর সন্ধান। সাধারণ থেকে অসাধারণ। আধুনিকতার ছোঁয়া এখনো অগ্রদ্বীপের মেলায় লাগেনি, এটাই এই মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অগ্রদ্বীপে 'গোপীনাথ'এর পাশে একটি রাধিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এটি পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শোনা যায়, অগ্রদ্বীপের ঘোষ পাড়ার ভাটগিন্নি দাইহাঁটের শিল্পীদের দিয়ে কষ্টিপাথরের 'রাধিকা' মূর্তি বানিয়ে এনে 'গোপীনাথ'এর পাশে প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারণে দোলের আগের দিন গোপীনাথ সদলবলে ঘোষপাড়ায় শ্বশুর বাড়ি যান। সেখানে সারাদিন তাঁর সেবাপূজা হয়। সন্ধ্যাবেলায় আবার তিনি নিজের বাড়ি ফিরে আসেন। এ প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন –

> "বাংলার বাইরে বেশির ভাগ মন্দিরে কৃষ্ণ একাই আছেন। তাঁর পাশে রাধা নেই কিন্তু বাংলাদেশে কৃষ্ণ-রাধার যুগল সাধনা বোধ হয় শ্রীচৈতন্যের পর শুরু হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা কৃষ্ণ-রাধার যুগল সাধনা করতেন। সেইজন্য বাংলাদেশের বহু মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিই বেশি দেখা যায়।"[১৪৭]

লোকবিশ্বাসে ভরপুর এই গোপীনাথ-কে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দেশের রাজাদের মধ্যেও নানা টানাপোড়েন চলেছে। গোবিন্দ ঘোষের মৃত্যুর পর, গোবিন্দ ঘোষের বংশধরদের একটি শাখা গোপীনাথ বিগ্রহকে পূর্ববঙ্গে পাঠিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করে। তখন গ্রামবাসীরা জানতে পেরে নিকটবর্তী পাটুলি-নারায়ণপুরের রাজা রামেশ্বর দত্তকে বিগ্রহ রক্ষা করার অনুরোধ করেন। রাজা সৈন্য পাঠিয়ে 'গোপীনাথ'কে কুষ্টিয়ার কাছাকাছি কোনো এক স্থান থেকে উদ্ধার করে এনে রাজবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে শুধুমাত্র 'গোপীনাথ'এর মেলার সময়েই তাকে অগ্রদ্বীপে পাঠানো হত। সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে বারুণী মেলায় প্রচুর ভিড় ও গণ্ডগোলের ফলে কিছু লোক মারা যায়। নবাব পাটুলির রাজা ও কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে ডেকে এই ঘটনার জন্য বিচার সভা বসান। বিচারে কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে 'গোপীনাথ'এর দায়িত্ব যায়। তারপর থেকেই 'গোপীনাথ' পাটুলির রাজার নিয়মেই কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে থাকেন। একসময়ে কলকাতার শোভাবাজারের রাজবাড়িতে, রাজা নবকৃষ্ণদেবের মাতৃশ্রাদ্ধে দেশের সমস্ত 'কৃষ্ণ' বিগ্রহকে আনা হয়। গোপীনাথ ও সেখানে যান। কিন্তু পরে নবকৃষ্ণ সব বিগ্রহকে ফিরিয়ে দিলেও তিন লক্ষ টাকা ঋণের অজুহাতে 'গোপীনাথ'কে কৃষ্ণনগরে ফেরাতে রাজি হলেন না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখন নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে মামলা করে 'গোপীনাথ'কে কৃষ্ণনগরে ফিরিয়ে আনেন।[১৪৮] তৎপরবর্তীকালে আবার কৃষ্ণচন্দ্রের উত্তরপুরুষরা 'গোপীনাথ'কে অগ্রদ্বীপে বরাবরের জন্য পাঠাতে রাজি হন না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রদ্বীপবাসী ও গোপীনাথ ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য তথা গোবিন্দ ঘোষের বংশধররা কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের বিরুদ্ধে মামলা করেন। কিছুকাল আগে সেই মামলার রায় প্রকাশ হয় এবং রায় অগ্রদ্বীপের পক্ষে যায়। তারপর থেকে 'গোপীনাথ' এখন অগ্রদ্বীপেই আছেন।

'গোপীনাথ'কে ঘিরে বর্তমানে রথ, ঝুলন, দোল, জন্মাষ্টমী, রাস ইত্যাদি উৎসব পালিত হয়। তাছাড়া নিত্য বিগ্রহ ও গোবিন্দ ঘোষের সমাধির সেবাপূজা চলে। বিগ্রহের গাত্রোত্থান, স্নান, শৃঙ্গার, পূজা, আরতি, নাম-গান, সকাল-বিকাল-রাত্রিতে বিগ্রহের ভোগ নিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সেবা চলে। দুপুরের অন্নভোগ অন্ন, পঞ্চব্যঞ্জন, পরমান্ন, মিষ্টি ইত্যাদি থাকে। বর্তমানে সেবাইতদের দ্বারা বিগ্রহের সেবা চলে। কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি, ভক্তদের ডান ও আইনিভাবে তৈরি একটি ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বারা বিগ্রহের সেবা পূজার ব্যয়ভার চলে। পাশের ঘোষপাড়া থেকে বিগ্রহের পরমান্ন রান্নার দুধ রোজই প্রায় আসে। সব মিলিয়ে এই পুণ্যতীর্থ অগ্রদ্বীপ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পাটবাড়ির মধ্যে অন্যতম একটি শ্রীপাট।

শ্রীপাট অম্বিকা কালনা :

বঙ্গদেশে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর দুইতীরে গড়ে উঠেছিল বহু বৈষ্ণব শ্রীপাট। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত অম্বিকা কালনা এইরকম একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীপাট। অন্যতম বৈষ্ণব মহাজন ভাতৃদ্বয় গৌরীদাস পণ্ডিত ও সূর্যদাস সরখেলের বিচরণক্ষেত্র ছিল অম্বিকা কালনা। এই অম্বিকা কালনাতেই ব্রজের সুবল সখা তথা গৌরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীচৈতন্যদেবের মিলন ঘটেছিল। শুধু বৈষ্ণবীয় তীর্থ স্থান নয়, অজস্র প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শাক্ত মন্দিরের অবস্থিতির জন্য স্থানীয় লোকেরা অম্বিকা কালনাকে 'মন্দিরের শহর' বলে থাকে।

বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে অবস্থিত কালনা মহকুমার সদর শহর অম্বিকা কালনা একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু অঞ্চল রূপে পরিচিত। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে এই স্থানটি অম্বুয়া বা অম্বুয়া-মুলুক নামে পরিচিত হয়ে আসছে।[১৪৯] এই 'মুলুক' শব্দটি সুলতানী আমলের কথা মনে করিয়ে দেয়। কালনার অতীত ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, সুলতান রুকুন-উদ্দিন কৈকায়ুসের(১২৯১-১৩০১ খ্রীঃ) আমলে জাফর খাঁ কর্তৃক সপ্তগ্রাম অধিকারের পরে সামরিক ঘাঁটি বা প্রতিরক্ষার দিকে অম্বুয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সুলতানী আমলে প্রতিষ্ঠিত দুটি মসজিদের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে একথা অনুমান করা যায়। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী জানিয়েছেন, খানসাহেব মৌলবী ওয়ালির মতে, হিন্দু ও মুসলমান যুগে কালনা একটি জনপ্রিয় স্থান ছিল। 'আইন-ই-আকবরী'তে সাতগাঁর অন্তর্ভুক্ত অম্বোয়া পরগণার কথা আছে। যদিও এই পরগণা রাইপুর পরগণার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য অম্বিকা-রাইপুর নামে পরিচিত ছিল। ১৭২২ সালে জাফর খাঁর আমলে অম্বোয়া পরগণাকে চাকলা বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আর সেই থেকে আজ পর্যন্তও অম্বিকা কালনা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। এছাড়া ১৬৬০ সালে অম্বিকা কালনার মানচিত্রে 'Ambowa'-র উল্লেখ আছে।[১৫০]

অম্বুয়ানগর বা অম্বিকা কালনার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা দেখি, সর্বপ্রথম বিপ্রদাস পিপিলাই-এ 'মনসাবিজয়' কাব্যে অম্বুয়ার উল্লেখ আছে। তখন অর্থাৎ ১৪৯৫-৯৬ সালে অম্বুয়া একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। বিপ্রদাস তাঁর কাব্যে লিখেছেন -

"ইন্দ্রানি বাহিয়া নদিয়ায় উপনীত
আঁবুয়া বাহিয়া গিয়া চাপা এবুহিত।
রন্ধন ভোজন করি গোঁয়ায় রজনী
বাহ বাহ বলি ডাকে চাঁদো নৃপমণি।"[১৫১]

আবার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন -

"নায়ের পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক
ডাহিনে রহিল পুরী অম্বয়া মুলুক।"[১৫২]

আর চৈতন্যজীবনীকার জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য থেকে জানা যায়, চৈতন্য প্রথমবার শ্রীক্ষেত্রে যাবার সময় অম্বুয়ায় এসেছিলেন। জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল'এ জানিয়েছেন -

"রজনী প্রভাতে শান্তিপুর ছাড়ি
আম্বুয়াএ দরশন।
আচার্য জগন্নাথ সভেই মেলিয়া
সভে করে সোঙরন।
নানা মহোৎসবে রজনী বঞ্চিয়া
সুরনদী কৈল বামে।
কাচমুনি বেলড়া ডাহিনে থুইয়া
উত্তরিলা কুলীন গ্রামে।"[১৫৩]

এরপর চৈতন্যদেবের পুরীতে অবস্থানকালে নিত্যানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও সমগ্র বঙ্গদেশকে নাম সংকীর্তনে মাতিয়ে তুলতে তুলতে অম্বুয়ানগরে এসে পৌঁছান। এ কথার স্মরণে বৃন্দাবন দাস নিজের কাব্যে লিখেছেন -

"জয় জয় অবধূতচন্দ্র মহাশয়।
যাহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয়।।
এই মতে সপ্তগ্রামে অম্বুয়া মুল্লুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।।"[১৫৪]

উপরিউক্ত তথ্যগুলি থেকে আমরা জানতে পারি, চৈতন্যযুগের অনেক আগে থেকেই অম্বিকা কালনা একটি জনপ্রিয় ও বহু পরিচিত নগর ছিল।

এরপর জানা যাক, অম্বিকা কালনা নামটির উৎপত্তি কিভাবে? বিভিন্ন জায়গার মত এখানেও স্থান নাম নিয়ে গবেষকদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন অম্বু ঋষির আশ্রমস্থল হিসেবে স্থানটি অম্বিকা কালনা নামে প্রসিদ্ধ।[১৫৫] কারো মতে, 'অম্বিকা' নামটি এসেছে দুর্গার নামে পরিবর্তে। আর বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন 'কালনা' শব্দটি 'কল্যাণ' শব্দ থেকে জাত।[১৫৬] আবার বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন, "অম্বিকা-কালনার অম্বিকা জৈনদেবী ছিলেন। পরে তিনি হিন্দু শক্তি পূজায় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েছেন।"[১৫৭] আবার যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী জানিয়েছেন, অম্বিকা নামের ক্ষেত্রে বিনয় ঘোষের জৈন দেবী কল্পনাটি হয়তো ভ্রান্ত। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী জানিয়েছেন- "জৈন দেবী অম্বিকা অপেক্ষায় অম্বিকা বা দুর্গা বা মহিষমর্দিনীর পূজা প্রাচীন। বেদ, আরণ্যক, পুরাণও তন্ত্রশাস্ত্র বর্ণিত অম্বিকার পরিচয় বহু পূর্বকালের। সর্বপ্রথম শুক্ল যজুর্বেদে অম্বিকার উল্লেখ আছে।"[১৫৮] এছাড়া অম্বিকা-কালনার প্রসিদ্ধ প্রাচীন দেবী হলেন মহিষাসুরমর্দিনী বা মহিষমর্দিনী, যা দুর্গারই ভিন্নরূপ। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মহাসাড়ম্বরে মহিষমর্দিনী পূজা হয়ে চলেছে কালনায়। তাই দুর্গা নাম থেকে অম্বিকা নামটি আসার সম্ভাবনা প্রবল।

গবেষক দীপক কুমার দাস লিখেছেন অম্বুয়া ও কানলা দুটি পৃথক স্থান নাম। পাঠান যুগে অম্বুয়া সুলতানি শাসনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং পরগনা নামে ইতিহাসের উপাদান হয়ে ওঠে। আর কালনা ছিল প্রাক মুসলিম যুগের বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও গঞ্জ। জলবাচক শব্দ 'অম্বু' বা 'অম্ভু'র সঙ্গে দ্রাবিড় 'ইয়া' বা 'য়া' প্রত্যয় যোগে 'অম্বুয়া' শব্দটির উৎপত্তি। তাই ভাগীরথী তীরবর্তী অম্বিকা কালনার নামটি যে এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে তা বলা যেতে পারে। তাছাড়া তিনি বলেছেন, দ্রাবিড় 'কু্>কল্' শব্দের অর্থ নদীতীর। এর সঙ্গে 'ওনা' যোগে কালনা শব্দটি

এসেছে – নদীতীরের বাসস্থান অর্থে।[১৫৯] যাই হোক শেষ পর্যন্ত একথা বলা যায়, প্রাচীন দেবী মহিষমর্দিনী বা দুর্গা বা অম্বিকা থেকে অম্বুয়া কালনা বা নদীতীরবর্তী স্থান অম্বুয়া মুলুক বা অম্বিকা কালনা।

এরপর আসা যাক, অম্বিকা কালনার বৈষ্ণব মহাজন গৌরীদাস পণ্ডিতের জীবনবৃত্তান্তে। গৌরীদাসের জীবন সম্পর্কে আমরা সর্বপ্রথম বিস্তারিত জানতে পারি, পরম বৈষ্ণব নরহরি দাসের 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ থেকে। তবে বিখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীহরিদাস দাস 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন, গৌরীদাস পণ্ডিত ছিলেন দ্বাদশ গোপালের অন্যতম এবং নিত্যানন্দ শাখার বৈষ্ণব।[১৬০] কবি কর্ণপুরের'গৌরগণোদ্দেশদীপিকার' ১২৮ নং শ্লোক থেকে জানা যায় গৌরীদাস পূর্বলীলায় সুবলসখা ছিলেন।[১৬১] নবদ্বীপ থেকে ১২ মাইল দূরে শালিগ্রামে গৌরীদাসের জন্ম। গৌরীদাসের পিতা কংসারি মিশ্র ও মাতা কমলাদেবী। গৌরীদাসরা ছয় ভাই ছিলেন যথা; দামোদর, জগন্নাথ, সূর্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস, নৃসিংহ ও চৈতন্য। গৌরীদাসের অগ্রজ সূর্যদাস হলেন বসুধা ও জাহ্নবী(নিত্যানন্দের পত্নীদ্বয়)র পিতা। গৌরীদাসের পত্নীর নাম বিমলা দেবী এবং তাঁদের দুই পুত্র বলরাম ও রঘুনাথ।[১৬২] রমাকান্ত চক্রবর্তী গৌরীদাস সম্পর্কে লিখেছেন - "Ambika-kalna in Burdwan was the Sripata of Gouridasa Pandita, who was the uncle of Janhava Devi, Nityananda,s wife. Kalna is still one of the big centres of rice trade in west-Bengal. Gouridasa Pandita no doubt, converted a good number of the rice merchants, and possibly established contact with the rice traders of East-Bengal. He installed the images of Chaitanya and Nittyananda and initiated their Worship. He probably wrote a biography of Chaitanya. He Went to Vrindavana where he died."[১৬৩]

অগ্রজ সূর্যদাসের আদেশে গৌরীদাস ভাগীরথীর তীরে নির্জনে অম্বিকা কালনায় এসে সাধন-ভজন করতে থাকেন। নরহরি দাস লিখেছেন -

"সরখেল সূর্যদাস পণ্ডিত উদার।
তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার।।
শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় কহিয়া।
গঙ্গাতীরে কৈলা বাস অম্বিকা আসিয়া।।"[১৬৪]

এরপর একদিন চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ হরিনদী গ্রাম থেকে নিজেরাই নৌকা বেয়ে অম্বিকা কালনায় হরিদাসের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। অম্বিকায় এসে গৌরীদাসের সঙ্গে চৈতন্যদেবের এক তেঁতুল বৃক্ষের নিচে মিলন হয় যা গৌরীদাসের বাড়ির অন্তর্ভুক্ত এবং সেখানেই মহাপ্রভু উপবেশন করেন। সেই স্মৃতি অনুযায়ী আজও ওই স্থানটি আম্বুলিতলা বলে পরিচিত হয়। বর্তমানেও মহাপ্রভুর পায়ের ছাপ পাওয়া যায়। অম্বিকায় মহাপ্রভুর উপস্থিতিতে গৌরীদাস আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং সেই আম্বুলিতলাতেই মহাপ্রভু গৌরীদাসকে আলিঙ্গন দেয় এবং নিজের হাতে বয়ে আনা নৌকার বৈঠাটি উপহার দেন। মহাপ্রভু বললেন -

"গঙ্গাপার হৈলু - নৌকা বাহিরে বৈঠায়।
এই লেহ বৈঠা - এবে দিলাম তোমায়।।
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে।
এতকহি' আলিঙ্গন কৈলা পণ্ডিতেরে।।"[১৬৫]

গৌরীদাস এই বৈঠা নিয়ে প্রশ্ন করলে চৈতন্য বলেন এই বৈঠা দিয়ে তুমি মানুষকে ভবনদী পার করিয়ে দেবে। এরপর গৌরাঙ্গ গৌরীদাসকে নবদ্বীপে নিয়ে গিয়ে স্বহস্তে লিখিত একখানি গীতা গৌরীদাসকে উপহার

দেন। প্রভুর শ্রীহস্তের মুক্তাক্ষর দেখে ও স্পর্শ করে গৌরীদাসের আনন্দ অশ্রু বইতে থাকে। নরহরি দাস জানিয়েছেন -

"প্রভুদত্ত গীতা বৈঠা প্রভু - সন্নিধানে।

অদ্যাপিহ অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে।।"[১৬৬]

এর কিছু সময় পর চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়ে শান্তিপুরে এলেন অদ্বৈত গোঁসাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু অভিমানের বশবর্তী হয়ে গৌরীদাস চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন না। তখন চৈতন্য ও নিত্যানন্দ দুজনেই অম্বিকায় গৌরীদাসের কাছে এলেন। গৌরীদাস তখন কাঁদতে কাঁদতে দু'জনকেই নিত্যবন্দি করে চিরকালের জন্য সেবার অধিকারী হতে চাইলেন। চৈতন্য গৌরীদাসের এই আকুলতা দেখে নবদ্বীপ থেকে নিম বৃক্ষ আনিয়ে নিজের এবং নিত্যানন্দের প্রতিমূর্তি গড়তে আদেশ করলেন। নরহরি দাস লিখেছেন -

"পণ্ডিতের মন জানি' প্রভু গৌরহরি।
একদিন পণ্ডিতে কহয়ে যত্ন করি।।
"নবদ্বীপ হৈতে নিমবৃক্ষ আনাইবে।
মোর ভ্রাতা সহ মোরে নির্মাণ করিবে।।
আনায়াসে নির্মাণ হইব মূর্তিদ্বয়।
তুয়া অভিলাষ পূর্ণ করিব নিশ্চয়"।।"[১৬৭]

কিন্তু গৌরীদাস জীবন্ত প্রভুর বদলে নিষ্প্রাণ দারুমূর্তি গ্রহণে নারাজ। তখন চৈতন্য গৌরীদাসকে নব-নির্মিত বিগ্রহদ্বয়, নিজের ও নিত্যানন্দের ভোগরাগের ব্যবস্থা করতে বললেন। চৈতন্যের লীলায় গৌর-নিতাইয়ের দারুমূর্তি সচল হলেন এবং ভোগ গ্রহণ করলেন। তখন চৈতন্যদেব সেই সচল ও প্রাণবন্ত যুগল বিগ্রহ সেবা পূজার ভার গৌরীদাসকে দিয়ে নিত্যানন্দকে নিয়ে নীলাচলে চলে গেলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আদেশে গদাধর গৌর-নিতাই বিগ্রহ তৈরী করেছেন, নরহরি দাসের একথাটি সম্ভবত ভুল। কারণ 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর' ছাড়া আর কোনো গ্রন্থে অর্থাৎ চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ বা অন্য কোনো গ্রন্থে একথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রখ্যাত গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী লিখেছেন - "... শ্রীচৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় তাঁর আদেশে বিগ্রহ নির্মাণের ব্যাপারটি একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এ বিষয়ে মুরারীগুপ্ত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বা বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে কোন উল্লেখ মাত্র নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথমবার শান্তিপুর আগমনের অন্ততঃপক্ষে দু'শবছর পরে 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেব কোন অবস্থায় তাঁর বিগ্রহ নির্মাণ করে সেবাপূজা করার কথা কারও কাছে ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেন নাই। নরহরি চক্রবর্তী গৌরীদাসের মাহাত্ম্য বাড়াতে শ্রীচৈতন্যদেব কথিত বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গৌরীদাস গৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।"[১৬৮]

আর বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানা যায়, গৌরীদাসই প্রথম চৈতন্যের জীবিত অবস্থায় গৌরাঙ্গ বিগ্রহ তৈরি করে গৌরাঙ্গ পূজা প্রচলন করেন। অর্থাৎ অম্বিকা কালনার মূর্তিটিই বঙ্গদেশের প্রথম গৌরাঙ্গ মূর্তি। গবেষক ষষ্ঠীচরণ ভট্টাচার্য ও এবিষয়ে সহমত পোষণ করে লিখেছেন - "যতদূর জানা যায় গৌরীদাস পণ্ডিতই প্রথম গৌর-নিতাই বিগ্রহের সেবাপূজার প্রচলন করেন এবং তা গৌরাঙ্গ প্রকট কালেই।"[১৬৯]

এদিকে গৌরীদাস ক্রমে বৃদ্ধ হতে লাগলেন। তখন তিনি চৈতন্য অনুচর মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র(কাশীনাথের পুত্র) বা শিষ্য হৃদয়ানন্দকে নিজের কাছে চেয়ে আনলেনে। গৌরীদাস হৃদয়ানন্দকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়ে, মন্ত্র দীক্ষা দিয়ে বিগ্রহ সেবার ভার দিলেন। এইভাবে চলতে থাকার পর, চৈতন্যের জন্ম উৎসবের কিছুদিন আগে গৌরীদাস বিগ্রহ সেবার সমস্ত দায়িত্ব হৃদয়ানন্দকে দিয়ে শিষ্য বাড়ির

উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। এদিকে গুরুর অনুপস্থিতিতে বাধ্য হয়ে হৃদয়ানন্দকে চৈতন্যের জন্মতিথির উৎসবের সমস্ত আয়োজন করতে হল। জন্মতিথির ঠিক আগের দিন গৌরীদাস বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত আয়োজন দেখে খুশি হয়েও আনন্দের পরিবর্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে বসলেন। এই ক্ষোভের কারণে হৃদয়ানন্দ অভিমান করে উৎসবের দিন ভাগীরথীর তীরে গিয়ে বসে থাকলেন। এদিকে গৌরীদাস নিজে উৎসব শুরু করে বিগ্রহকে ভোগ-রাগ দিতে গিয়ে মন্দির খুলে দেখেন গর্ভগৃহের সিংহাসনে বিগ্রহ নেই। তখন গৌরীদাস আরো ক্রোধান্বিত হয়ে ভাবলেন হৃদয়ানন্দ বিগ্রহ চুরি করে নিয়ে গেছেন। তিনি হৃদয়ানন্দকে শাস্তি দেওয়ার জন্য একটা ছড়ি হাতে করে ভাগীরথীর তীরে ছুটলেন। কিন্তু নদীর তীরে এসে এক বিরল দৃশ্যের সম্মুখীন হলেন গৌরীদাস। অন্তর্ধৃত বিগ্রহদ্বয় হৃদয়ানন্দের সঙ্গে প্রেমানন্দে নৃত্য করছেন। তা দেখে গৌরীদাসের হাতের লাঠি খসে পড়ল, আর বিগ্রহরা গৌরীদাসকে দেখে চুপিচুপি মন্দিরের সিংহাসন অধিকার করল। তিনি আরো দেখলেন, চৈতন্য মহাপ্রভু হৃদয়ানন্দের অন্তরে বিলীন হয়ে গেলেন। তখন গৌরীদাস নিজের ভুল বুঝতে পেরে হৃদয়ানন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁকে হৃদয়চৈতন্য নাম দিলেন এবং তিনি বুঝলেন হৃদয়চৈতন্যের মত পরম ভক্ত সত্যিই বিরল।

পরবর্তীকালে হৃদয়চৈতন্যের অন্যতম শিষ্য ছিলেন পরম বৈষ্ণব শ্যামানন্দ। মেদিনীপুরের ধারোন্দা-বাহাদুরপুর গ্রামের সদগোপবংশের সন্তান ছিলেন শ্যামানন্দ। প্রথম জীবনে শ্যামানন্দের নাম ছিল দুঃখী বা দুখিয়া। হৃদয়চৈতন্যের কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর নাম হয় কৃষ্ণদাস এবং এরপর তাঁর নাম হয় শ্যামানন্দ।[১৭০] কিন্তু হৃদয়চৈতন্যের পর অম্বিকায় গৌর-নিতাই বিগ্রহের দায়িত্ব নেন তাঁর শিষ্য গোপীরমণ ঠাকুর। 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর' থেকে জানা যায় -

"মহামহোৎসব আয়োজন করাইলা।
সর্ব্বত্রেই নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলা।।
আইলেন বীরচন্দ্র নিজগণ সনে।
কৃষ্ণ মিশ্র আইলা বেষ্টিত নিজগণে।।
শ্রীহৃদয়ানন্দ শিষ্য শ্রীগোপীরমণ।
অম্বিকা হইতে তিঁহ করিলা গমন।।"[১৭১]

হৃদয়চৈতন্যের স্ত্রী সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে গোপীরমণ ঠাকুরের সঙ্গে হৃদয়চৈতন্যের নাতনি(রঘুনাথের কন্যা) অন্নপূর্ণাদেবীর বিবাহ হয়। তাঁদের পুত্র এবং পরবর্তীকালে তৎ-পুত্ররায় এই বিগ্রহ সেবার ভার বহন করে চলেছেন। বর্তমানে হৃদয়চৈতন্যের বংশধর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও তাঁর শরিকরা বিগ্রহ সেবা করছেন।[১৭২]

এবার আমরা শ্রীপাটের বর্তমান অবস্থার প্রতি দিক্‌পাত করি। শ্রীপাটের প্রধান বিগ্রহ অর্থাৎ গৌরীদাস প্রতিষ্ঠিত দারু নির্মিত গৌর-নিতাই বিগ্রহের উচ্চতা পাঁচফুট। একটি বড় মন্দিরকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে, তার মাঝের অংশে গৌর-নিতাই বিগ্রহকে রাখা হয়েছে। প্রধান বিগ্রহের এক পাশে গৌরীদাসের বিগ্রহ এবং অন্য পাশে গৌরীদাস সেবিত রাধামাধব বিগ্রহ ও অন্যান্য বিগ্রহের অবস্থান। এছাড়া মহাপ্রভুর দেওয়া গীতা ও বৈঠা, মহাপ্রভুর খড়ম, শালগ্রামশিলা এবং আম্বুলীতলায় মহাপ্রভুর পদচিহ্ন পূজিত হয়। গৌর-নিতাই শ্বেতবস্ত্র পরিহিত ও শ্বেত উত্তরীয় দ্বারা আবৃত। ধাতুব্রহ্ম রাধারমণ-এর সারাবছর রাজবেশ থাকে। প্রয়োজন অনুসারে সকল বিগ্রহের অঙ্গরাগ করা হয়। বছরে পাঁচবার ঋতু অনুসারে বিগ্রহের পোষাক পরিবর্তন করা হয়। এছাড়া রথ, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাস ও দোলে রাধারমণ-এর পোশাক পরিবর্তন হয়।[১৭৩] শ্রীপাটের একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় হল, বিগ্রহের ঝলক দর্শন। মূল মন্দিরের দরজা সবসময় খোলা থাকে না,

ভক্ত এলে তবেই ভগবানের দর্শন পান। এই রীতি থেকেই একদিন এখানে পরম ভক্ত-বৈষ্ণব ভাগবান দাস বাবাজির ভক্তির আবিষ্কার হয়।

শ্রীপাটে ভোরে বিগ্রহের নিদ্রাভঙ্গ থেকে রাত্রে শয়ন পর্যন্ত পাঁচ বার সেবা পূজা হয়। প্রভাতে খোল-মঞ্জরী ও অন্যান্য বাদ্য সহযোগে বিগ্রহের জাগরণ হয়। তারপর মঙ্গলারতি ও সন্দেশভোগ দেওয়া হয়। ৯.৩০এ বিগ্রহের স্নান, সজ্জার পর মিষ্টি ও ফলসহযোগে বাল্যভোগ দেওয়া হয়। দুপুরে ১টার সময় পঞ্চ-ব্যঞ্জনসহ ৩-৪ সের চালের অন্নভোগ দেওয়া হয়। দুপুরের অন্নভোগে রোজ পরমান্ন থাকে। অন্নভোগের পর আরতি ও শয়ন হয়। বিকেল ৪ টেতে বিগ্রহের জাগরণ, ফল ও মিষ্টিভোগ এবং নানা বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করা হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি ও নামগান হয়। রাতের ভোগে লুচি, দুধ ও সন্দেশ আবশ্যক। রাতের ভোগের পর শয়ন। অন্যান্য শ্রীপাটের মতোএখানেও ভোগে লালরঙের শাক-সব্জি, পুঁইশাক, সজনেডাঁটা, পোস্ত, মসুরডাল ও বউলির ডাল নিষিদ্ধ। সারাবছর সেবাভোগের নিয়মপ্রায় একই থাকে তবে উৎসব অনুষ্ঠানে ভোগের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বৈশাখ মাসে বিশেষ শিতলিভোগ, কার্তিকমাসে বিশেষ বাল্যভোগ এবং পৌষমাসে খিঁচুড়ি ভোগ দেওয়া হয় বিগ্রহকে। আগে গৌর-নিতাইকে কলারপাতে ভোগ নিবেদন করা হলেও এখন কাঁসার পাত্রে ভোগ দেওয়া হয়।[১৭৪]

রথ, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাস ও দোল ছাড়াও শ্রাবণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে এই শ্রীপাটের প্রধান উৎসব গৌরীদাস স্মরণ উৎসব মহা-সমারহে পালিত হয়। উৎসব উপলক্ষে অখণ্ড নামযজ্ঞ, অন্নকূট উৎসব ও কীর্তন গান হয়। উৎসবে বিভিন্ন স্থানের বৈষ্ণব, নেড়া-নেড়িরা এবং শ্রীপাটের দীক্ষিত প্রচুর শিষ্যবর্গ ও সাধারণ মানুষের সমাগম হয়। মন্দির সংলগ্ন স্থানে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয় এবং তাঁরা স্বপাক আহার করেন। এই মহোৎসবে প্রচুর পরিমাণে মালসা ভোগ হয়। আবার উত্থান একাদশীতে রাধারমণ বিগ্রহকে নাম-সংকীর্তন সহযোগে শোভাযাত্রা করিয়ে ভাগীরথীতে স্নান করানো হয়। এছাড়া দোলউৎসবের সময় মহাপ্রভুর খড়ম নগর পরিক্রমা করানো হয়। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণকারী ব্রাহ্মণরা বিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগ রান্না, মন্দির পরিমার্জন ও অন্যান্য কাজ করেন। তবে পূজক ব্রাহ্মণের এই পদটি বংশানুক্রমিক নয় এবং এক-একজন শরিক ভিন্ন ভিন্ন সেবা পূজক রাখেন। মূল মন্দিরে কোনো নারী প্রবেশ করতে পারে না। শ্রীপাটের সেবা পূজার এই বিপুল অর্থ আসে বংশধর-সেবাইতদের কাছ থেকে। বংশধররা ধর্মীয় গণ্ডি পেরিয়ে চাকরি, ব্যবসা ও অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত। পূর্বে প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি থাকলেও বর্তমানে তাঁর পরিমাণ সামান্য। তবে সম্প্রতি একটি ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে বংশধরদের নিয়ে। আর শ্রীপাটের বংশধরদের বিপুল শিষ্য-সম্পদায় থেকেও প্রচুর প্রণামী আসে। শ্রীপাটের বর্তমান বংশধর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর থেকে জানতে পারি, কালনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও জেলাগুলি ছাড়াও মেদিনীপুর জেলায় তাঁদের প্রচুর শিষ্যগোষ্ঠী আছে। মেদিনীপুরের সঙ্গে এই শ্রীপাটের ঘনিষ্ঠতার কারণ, হৃদয়চৈতন্যের অন্যতম শিষ্য শ্যামানন্দ। এছাড়াও পূর্বযোগাযোগের কারণে প্রতি বছর মণিপুর থেকে এই শ্রীপাটে অনেক ভক্তের সমাগম হয়। শ্রীপাটে কোনো সরকারী অনুদান আসে না। বিজয়কৃষ্ণ মহাশয়ের মতে, সরকারী অনুদানকে তাঁরা ঘৃণার চোখেই দেখে। কারণ তাঁর মতে, যে ভগবান ভক্তের ভক্তির কাঙাল তাঁকে সামান্য জল-বাতাসা ও মনের অগাধ ভক্তি দিয়ে সেবা করলেই সেই সেবা তিনি গ্রহণ করবেন।

গৌরীদাস পণ্ডিত ছাড়া ও কালনায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে সূর্যদাস পণ্ডিত একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। গৌরীদাসের শ্রীপাটের খুব কাছেই সূর্যদাসের শ্রীপাট। লোকবিশ্বাস মহাপ্রভুপাড়ায় শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর গৌর-নিতাই শ্রীমন্দিরটি হল সূর্যদাস পণ্ডিতের বাড়ি।[১৭৫] সেই কারণে এটি জাহ্নবাদেবী ও বসুধাদেবীরও বাড়ি। তবে সূর্যদাস কবে শালিগ্রাম থেকে অম্বিকাকালনায় আসেন সে বিষয়ে কোনো সঠিক তথ্য জানা যায় না। এখানেও ৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট গৌর-নিতাই বিগ্রহ এবং সূর্যদাস পণ্ডিত পূজিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে কেন্দ্র

করে বৈষ্ণবদের বিভিন্ন উৎসব পালিত হয় সারাবছর। ভোরে গাত্রোত্থান থেকে রাত্রে শয়ন পর্যন্ত ৫ বার বিগ্রহের ভোগ হয় এবং দুপুরে পরমান্নসহ অন্নভোগ হয়। আর মাঘীপূর্ণিমায় মহাধুমধামে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব পালিত হয়। চারদিন ধরে এই মহোৎসব পালিত হয় এবং পঞ্চমদিন ধূলোট, নগরপরিক্রমা ও অন্নকূট উৎসব হয়।[১৭৬] উৎসবে অনুষ্ঠানে এখানে জমজমাটি কীর্তনের আসর বসে আর বহু ভক্ত বৈষ্ণবের সমাগম হয়। সেবাইত বংশধরদের তত্ত্বাবধানেই বিগ্রহের সেবা পূজা চলে।[১৭৭]

অম্বিকা কালনা শ্রীপাটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ভগবান দাস বাবাজির আখড়া। উড়িষ্যাবাসী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ভগবান দাস বাবাজি গৌরীদাস ও সূর্যদাসের মৃত্যুর পরবর্তীকালে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীপাট অম্বিকা কালনায় নামব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উড়িষ্যার এক নিচু বংশে ভগবান দাসের জন্ম হয়। তারপর ধর্মপ্রাণা ভগবান দাস বৃন্দাবনে চলে যান। সেখানে তিনি উৎকলবাসী পরম সাধক কৃষ্ণদাস বাবাজির কাছে ভেক নিয়ে রাগানুগা সাধনের নিগূঢ় নির্দেশ পান। কৃষ্ণদাস বাবাজির নির্দেশে তিনি কালনায় গৌরীদাসের শ্রীপাটে এসে নামব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭৮] ভগবান দাসের অম্বিকায় এসে নামব্রহ্ম প্রতিষ্ঠার বিষয়ে লোকমুখে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। একসময় মন্দিরের সেবাইত শ্রীগোরাচাঁদ ঠাকুর নিবিষ্ট মনে প্রভুর সেবা পূজা করছেন। এমন সময় বৃন্দাবন থেকে এক বৈষ্ণব সাধক এসে দাঁড়িয়েছেন মন্দিরের দরজায়। দরজা কিন্তু বন্ধ। কথিত আছে, গৌর-নিতাই বিগ্রহের সেবা পূজা প্রতিষ্ঠার সময় চৈতন্যদেব গৌরীদাসকে বলেছিলেন অন্য কোনো পরম ভক্ত বা সিদ্ধ সাধক তাঁর দর্শনে এলে তিনি তাঁর সঙ্গে চলে যাবেন। সেই থেকে মূল মন্দিরের দরজা বন্ধ করে রাখার প্রথা শুরু হয়েছে। শুধু ভক্ত এলেই মন্দিরের দ্বার খোলা হয় আর বিগ্রহের ছবি তোলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। (এই কারণে বিগ্রহের কোনো ছবি তোলা সম্ভব হয়নি।) যায় হোক, এদিকে ভগবান দাস বন্ধ দরজা দেখে ভাবনায় পড়ে গেলেন। চিন্তামগ্ন ভগবান দাস দেখলেন কিছুক্ষণ পর আপনা থেকেই মন্দিরের দরজা খুলে গেল। গোরাচাঁদ ঠাকুর এই দৃশ্য দেখে ভীত হলেন এবং প্রাণের ঠাকুরের গৃহত্যাগ করার প্রমাদ গুনতে থাকলেন। ক্রন্দনরত গোরাচাঁদ ঠাকুর তখন কিছুটা বুদ্ধিমানের মতো বৈষ্ণব সাধকের উদ্দেশ্যে বললেন - "যদি সত্যিকারের গৌরীদাসকে প্রভুর সখা বলে মনে করেন, তবে যে শক্তিতে মন্দিরের দরজা খুললেন, সেই শক্তিতে দরজা বন্ধ করুন। কারণ এখনো পূজা অসম্পূর্ণ।" তখন সত্যিই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এই শক্তিবান মহাসাধকই হলেন ভগবান দাস বাবাজি।[১৭৯]

তিনি রোজ এক লক্ষের বেশি নাম জপ করতেন। কখনো কারও প্রণাম গ্রহণ করেন নি। তিনি রোজ গঙ্গা স্নান করতেন এবং মা গঙ্গার প্রতি তাঁর ভক্তি এতই প্রগাঢ় ছিল যে, কখনো গঙ্গার দিকে পিছু ফিরে হাঁটতেন না। প্রয়োজনে উলটো হাঁটতেন। মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশে তিনি গঙ্গার ধারের এক মুচকুন্দ গাছ থেকে কিছুটা অংশ কেটে নামব্রহ্ম লিখে অম্বিকায় প্রতিষ্ঠা করেন। আরো শোনা যায় জাহ্নবা দেবী বাঘনাপাড়া থেকে অম্বিকা হয়ে খেতুরীতে যাবার সময় গঙ্গার ধারে রান্না করেছিলেন। তখন তিনি একটি মুচকুন্দ গাছের ডাল কেটে হাতা বানিয়েছিলেন। এই হাতাটি পরে গঙ্গার ধারে ফেলে যান। পরে নাকি তার থেকে মুচকুন্দ গাছ হয় আর সেই গাছের ডালে নামব্রহ্ম না লেখা ছিল। সে যাই হোক, নামব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে সেই বাড়ির নাম হয় 'নামব্রহ্মবাটী'। গৌরীদাসের শ্রীপাটের পাশেই ভগবান দাসের আখড়া বা নামব্রহ্মবাটী। ভগবান দাস জীবিত অবস্থায় গৌরীদাসের শ্রীপাটের প্রসাদই গ্রহণ করতেন, তাই তাঁর মৃত্যুর পর রোজ এই শ্রীপাটের ভোগের একটি অংশ আখড়ায় যায় এবং তারপর সেখানে ভোগ হয়। ভগবান দাসের সঙ্গে বর্ধমানের মহারাজের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তৎকালীন বর্ধমানের মহারাজ ভগবান দাসকে প্রায় গুরু পদে বরণ করেছিলেন। ভগবান দাসকে আশ্রম বানানোর জন্য মহারাজ কিছু নিষ্কর সম্পত্তি দান করেছিলেন। ভগবান দাসের আখড়াতেই একটি বিশেষ ঘটনার হদিস মেলে। ভগবান দাস প্রবল গঙ্গাভক্ত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গার স্নানে যেতে পারছিলেন না। তখন গঙ্গাদেবী তাঁকে স্বপ্ন দেখান, তাঁর বাড়ির কুয়োতেই গঙ্গার

জল আসবে। সত্যিই নাকি সেই সময় কুয়োতে গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার-ভাঁটা হত, বর্ষাকালে নদীর মতো জল ঘোলা হত।[১৮০] এই কুয়োতে নামার জন্য সিঁড়ি করা আছে। তবে বর্তমানে কুয়ো একেবারেই মজা। এখন সাধারণ মানুষের কাছে এই কুয়ো ভোগবতী গঙ্গা নামে পরিচিত। শোনা যায়, ১২৭৩ সনের চৈত্রমাসে ভগবান দাস বাবাজির সঙ্গে দেখা করার জন্য মহাসাধক শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এসেছিলেন। তারপর ১২৭৭ সনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভগবান দাসের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন।[১৮১] এই নামব্রহ্মবাটিতেই ভগবান দাস বাবাজির সমাধি আছে। ভগবান দাস ধনেখালিতে একটি মন্দির তৈরী করে গৌরাঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে কালনায় নামব্রহ্মবাটীটি গৌরীদাসের বংশধরদের দ্বারা গঠিত ট্রাস্টিতে চলে।

অম্বিকা কালনা শ্রীপাটের সঙ্গে মণিপুরী বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির একটি পুরোনো সংযোগ রয়েছে। পরম বৈষ্ণব নরোত্তম দাসের অন্যতম শিষ্য শ্রীপরমানন্দ গোস্বামী, মণিপুরের রাজা জয়সিংহকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। জয়সিংহের মণিপুরী নাম ছিল চিং থং খোম্বা। সম্ভবত বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় ভাগ্যচন্দ্র। যায় হোক, রাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রজারাও বৈষ্ণবধর্মী ছিলেন। এর ফলে মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজা ভাগ্যচন্দ্র 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'-এ বর্ণিত নানা সংকীর্তনাদি ও নৃত্যগীত সমন্বিত রাস উৎসবের সূচনা করেন। মণিপুরে গোবিন্দজীর মন্দির তৈরি করে নিজের মেয়ে বিম্ববতীকে কলাবিদ্যা শিখিয়ে ভক্তিরসে আপ্লুত করে প্রথম রাস উৎসবে শ্রীরাধিকার অভিনয় করান। এই কন্যাই পরবর্তীকালে বিখ্যাত সাধিকা মণিপুরের মীরাবাই সিজালাইরোইবি নামে পরিচিতা হন। রাজা নিজেও নৃত্য বিশারদ, সঙ্গীতজ্ঞ, সুগায়ক ও দক্ষ পাখোয়াজ বাদক ছিলেন।[১৮২] রাজা ভাগ্যচন্দ্র শেষজীবনে অর্থাৎ ১৭৯৮ সাল নাগাদ নবদ্বীপে তীর্থ করতে আসেন। এই সময় তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে শ্রীপাট অম্বিকা কালনায় আসেন। Snahal R.K. Singha র 'Chingthang Khomba Maharaj Ganga Chapta' গ্রন্থে এবং Dr. Dwijendra Narayan Goswami লিখেছেন - "He was invited by the vaisnavas of Ambika kalna to see the images of Lord Gauranga and prabhu Nityananda which were prepared after Sri Chaitanya became a mopnk but before his going to Puri, the puja of these images were started. … Pandit Gauri Das Thakur, a contemporary and intimate bhakti of Sri Chaitanya. In the year 1798AD, Gauri Das's descendent Gora Chand Thakur was the sebait of Mahaprabhu temple at Kalna."[১৮৩] Dr. Dwijendra Narayan Goswami আরো লিখেছেন, তিনি অম্বিকায় এসে নিজের খরচে মহাধুমধামে মহোৎসব করেন। এছাড়া মণিপুরী কলাকুশলীদের নিয়ে তিনি উৎসবে নৃত্য সংকীর্তন করেন। এই উৎসবে নৃত্য করেন ভাগ্যবতী, মন্দাকিনী, যশোদা, ইন্দ্রানী ও চম্পকলতা প্রমুখরা। সাতটি মঞ্জিরা সাতজন বাজিয়েছিলেন নাচের সময়।[১৮৪] নবদ্বীপে ফিরে যাবার সময় তিনি গৌর-নিতাই বিগ্রহ ও রাধারমণ-এর জন্য অর্থ ও অলঙ্কার দান করেন। এরপর বঙ্গদেশের বিভিন্ন গৌরমণ্ডল পরিভ্রমণ করতে করতে মুর্শিদাবাদের গম্ভিলায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই স্মৃতি অনুসারে সেই সময় থেকে এখনো পর্যন্ত প্রতি বছর অসংখ্য মণিপুরী তীর্থযাত্রী বা বৈষ্ণবরা আসেন অম্বিকায়। এর ফলে মনিপুর ও অম্বিকার মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

গৌরীদাস ও সূর্যদাসের শ্রীপাট ছাড়াও অম্বিকা কালনায় অসংখ্য বৈষ্ণব ও শাক্ত মন্দির আছে। পঁচিশ চূড়াবিশিষ্ট লালজীর বৈষ্ণব মন্দির, পঁচিশ চূড়ার কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির (এই মন্দিরের বিগ্রহ হল কষ্টিপাথরের বিষ্ণু), বর্ধমান মহারাজ তিলকচাঁদের আমলে তৈরি অনন্তবাসুদেবের বৈষ্ণব মন্দির, পঁচিশ চূড়াবিশিষ্ট গোপালজিউ মন্দির, জগন্নাথ বাড়ির জোড়া শিবমন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির, ১০৮ টি শিবমন্দির ইত্যাদি। প্রাচীন এই মন্দিরগুলি প্রত্যেকটিই টেরাকোটার সুন্দর অলংকরণে সজ্জিত। শুধু মন্দিরই

নয় কালনায় একাধিক প্রাচীন মসজিদ আছে। এই প্রাচীন ও সুন্দর স্থাপত্যগুলো আজ আমাদের জাতীয় সম্পদ। পাশাপাশি একাধিক সংস্কৃতি ও ধর্ম পালনের অন্যতম স্থান হল অম্বিকা কালনা।

বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির ধারক এই শ্রীপাটকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের সমাগম ও মিলন ঘটে। যা বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিষ্য-সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে অনেকাংশেই শ্রীপাটের যোগাযোগ আছে। গৌরীদাসের বর্তমান বংশধর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতো আমাদেরও মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পাটবাড়ির মধ্যে একটা গভীর সংযোগ গড়ে ওঠা প্রয়োজন। খেতুরী উৎসবের মতো বড় কোনো বৈষ্ণব সম্মেলনের আবশ্যিকতা আছে বর্তমানে। যথাযথ প্রতিনিধিত্বের অভাবে বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে নানা অশুদ্ধি প্রবেশ করেছে। যার ফলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের সঠিক দিকটি ব্যহত হচ্ছে। তাই বর্তমানে বৈষ্ণব সংস্কৃতির উৎকর্ষতার জন্য শ্রীপাট অম্বিকা কালনার বংশধরদের মতো অন্যান্য শ্রীপাটের বংশধর ও সেবাইতদের ভাবনা চিন্তা করতে হবে।

তথ্যসূত্র :

১। 'বর্দ্ধমান সমগ্র' (প্রথম খণ্ড); সম্পাদনা - গোপীকান্ত কোঙার; প্রবন্ধ – 'বর্ধমানের ইতিহাস/ যৎকিঞ্চিত', প্রাবন্ধিক - সুকুমার সেন; মিত্র, কলকাতা - ৭৩; দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০০৯; পৃষ্ঠা - ৬১ [অতঃপর বইটি বদ্ধমান সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। নামে উল্লিখিত হবে।]

২। 'বর্ধমানের ইতিহাস ইতিহাসের বর্ধমান'; সম্পাদনা - রাধামাধব মণ্ডল; প্রবন্ধ – 'বর্ধমানের ইতিহাস প্রসঙ্গ': প্রাবন্ধিক - সর্বজিৎ যশ; সহযাত্রী, কলকাতা - ৯; প্রথম প্রকাশ, ৬ নভেম্বর, ২০১৬; পৃষ্ঠা - ২৮-২৯ [অতঃপর বইটি 'বর্ধমানের ইতিহাস ইতিহাসের বর্ধমান' নামে উল্লিখিত হবে।]

৩। 'বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান'; সম্পাদনা - জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও গিরিধারী সরকার; প্রবন্ধ – 'প্রাচীন রাঢ়ভুমি ও বর্ধমান' প্রাবন্ধিক - যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩; প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১২; পৃষ্ঠা – ৩৪।

৪। তদেব; পৃষ্ঠা – ৩৪।

৫। 'বর্দ্ধমান সমগ্র' (প্রথম খণ্ড) প্রবন্ধ – 'বর্ধমানের ইতিহাস যৎকিঞ্চিত' প্রাবন্ধিক - সুকুমার সেন; পৃষ্ঠা - ৬৩।

৬। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব); নীহাররঞ্জন রায়; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩; অষ্টম দে'জ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ১১৬-১১৭ [অতঃপর বইটি 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদি পর্ব) নামে উল্লিখিত হবে।]

৭। 'বর্ধমানের ইতিহাস ইতিহাসের বর্ধমান'; প্রবন্ধ – 'বর্ধমানের ইতিহাস প্রসঙ্গ' প্রাবন্ধিক - সর্বজিৎ যশ; পৃষ্ঠা - ২৭। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব): পৃষ্ঠা - ১১৭।

৮। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব); পৃষ্ঠা-১১৭

৯। 'বর্দ্ধমান সমগ্র' (প্রথম খণ্ড); প্রবন্ধ – 'বর্ধমান নামের ইতিহাস' প্রাবন্ধিক - গীতা হাজরা; পৃষ্ঠা – ৭৩।

১০। তদেব; পৃষ্ঠা - ৭৩।

১১। তদেব; পৃষ্ঠা - ৭২।

১২। তদেব; পৃষ্ঠা - ৭২।

১৩। 'বর্ধমানের ইতিহাস ইতিহাসের বর্ধমান' প্রবন্ধ - 'বর্ধমানের ইতিহাস প্রসঙ্গ'; প্রাবন্ধিক - সর্বজিৎ যশ; পৃষ্ঠা – ৩২।

১৪। ‘বর্ধমান সমগ্র’ (প্রথম খণ্ড); প্রবন্ধ – ‘বর্ধমান নামের ইতিহাস’ প্রাবন্ধিক - গীতা হাজরা; পৃষ্ঠা – ৭৩।

১৫। তদেব; পৃষ্ঠা - ৭৩।

১৬। ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ (প্রথম খণ্ড); বিনয় ঘোষ প্রকাশ ভবন, কলকাতা - ৭৩; অষ্টম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৪; পৃষ্ঠা – ৯৮ [অতঃপর বইটি ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ (প্রথম খণ্ড) নামে উল্লিখিত হবে।]

১৭। ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, অষ্টাদশ ভাগ (ত্রৈমাসিক): সম্পাদক - নগেন্দ্রনাথ বসু; প্রবন্ধ- ‘পাটপর্য্যটন ও শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয়’, প্রাবন্ধিক - অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির; কলকাতা; ১৩১৮ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা - ১০৭। [অতঃপর পত্রিকাটি ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, অষ্টাদশ ভাগ (ত্রৈমাসিক) নামে উল্লিখিত হবে।]

১৮। ‘কাটোয়ার ইতিহাস’; নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা - স্বপনকুমার ঠাকুর; রাঢ়, বীরভূম;প্রথম রাঢ় সংস্করণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা- ১০ [অতঃপর বইটি ‘কাটোয়ার ইতিহাস’ নামে উল্লিখিত হবে।]

১৯। ‘বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ (তৃতীয় খণ্ড); যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী; পুস্তক বিপণি, কলিকাতা- ৯; প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯৪; পৃষ্ঠা - ১১৩ [অতঃপর বইটি ‘বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ (তৃতীয় খণ্ড) নামে উল্লিখিত হবে।]

২০। ‘কাটোয়ার ইতিহাস’ ; পৃষ্ঠা - ২

২১। তদেব; পৃষ্ঠা – ৪-৫।

২২। ‘রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা’ (কাটোয়া মহকুমা); বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা - ১২; প্রথম প্রকাশ, ২ নভেম্বর ২০০৯; পৃষ্ঠা - ২০ [অতঃপর বইটি ‘রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা’ (কাটোয়া মহকুমা) নামে উল্লিখিত হবে।]

২৩। ‘চৈতন্যভাগবত’; বৃন্দাবন দাস; সম্পাদনা - সুকুমার সেন; সাহিত্য আকাদেমি, কলকাতা- ২৫; চতুর্থ মুদ্রণ ২০১১; পৃষ্ঠা - ২০৭ [অতঃপর বইটি ‘চৈতন্যভাগবত’ নামে উল্লিখিত হবে।]

২৪। ‘কাটোয়ার ইতিহাস’; পৃষ্ঠা - ২-৩

২৫। ‘বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ (তৃতীয় খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১১৪।

২৬। ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ (প্রথম খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১৬৩-১৬৪।

২৭। ‘কাটোয়ার ইতিহাস’ ; পৃষ্ঠা – ৫২।

২৮। ‘প্রেমবিলাস’ ; নিত্যানন্দ দাস; প্রকাশক - রামদেব মিশ্র; বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ১৬২ [অতঃপর বইটি ‘প্রেমবিলাস’ নামে উল্লিখিত হবে।]

২৯। ‘EARLY HISTORY OF THE VAISNAVA FAITH AND MOVEMENT IN BENGAL’ ; Sushil Kumar De; General Printers and Publishers Limited, Calcutta; 1942; page - 15

৩০। ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ (প্রথম খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১৪৮।

৩১। ‘কাটোয়ার ইতিহাস’; পৃষ্ঠা – ৬৩।

৩২। ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’; কৃষ্ণদাস কবিরাজ; সম্পাদনা - সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা -৯; দশম মুদ্রণ; চৈত্র ১৪১৯ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ১৩৩ [অতঃপর বইটি ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ নামে উল্লিখিত হবে।]

৩৩। ‘চৈতন্যভাগবত’ ; পৃষ্ঠা - ২১১।

৩৪। ‘রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা’ (কাটোয়া মহকুমা); পৃষ্ঠা – ৬৮-৬৯।

৩৫। ‘বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ (তৃতীয় খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১১৪।

৩৬। 'রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা' (কাটোয়া মহকুমা); পৃষ্ঠা – ৭৪।

৩৭। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (প্রথম খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১৬৬।

৩৮। 'রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা' (কাটোয়া মহকুমা); পৃষ্ঠা – ৬৯-৭০।

৩৯। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১১৪-১১৫।

৪০। 'রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা' (কাটোয়া মহকুমা); পৃষ্ঠা - ৭৫।

৪১। 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর'; নরহরি চক্রবর্তী; সম্পাদক – নন্দলাল বিদ্যাসাগর; গৌড়ীয় মিশন, কলিকাতা - ৬; ২১ ডিসেম্বর ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ৩৯২ [অতঃপর বইটি 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর' নামে উল্লিখিত হবে।]

৪২। 'রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা' (কাটোয়া মহকুমা); পৃষ্ঠা – ৭২।

৪৩। তদেব; পৃষ্ঠা – ৭২।

৪৪। 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম'; রমাকান্ত চক্রবর্তী; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা –৯; পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৩; পৃষ্ঠা – ৮৭-৮৮ [অতঃপর বইটি 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম' নামে উল্লিখিত হবে।]

৪৫। 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর' ; পৃষ্ঠা – ৩৯৩-৩৯৪।

৪৬। তদেব: পৃষ্ঠা – ৩৯৫।

৪৭। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড): পৃষ্ঠা - ১৩২।

৪৮। তদেব; পৃষ্ঠা - ১৩২-১৩৩।

৪৯। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (প্রথম খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১৭৫।

৫০। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১৩২।

৫১। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'; পৃষ্ঠা - ৬৫।

৫২। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড); পৃষ্ঠা – ১৩৩।

৫৩। 'রামায়ণ', কৃত্তিবাস পণ্ডিত; সম্পাদনা- সুখময় মুখোপাধ্যায়; ভারবি, কলকাতা– ৭৩; তৃতীয় সংস্করণের তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, অগাস্ট ২০১৫; পৃষ্ঠা - ২২।

৫৪। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'; পৃ: - ২৫২।

৫৫। 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব'; গৌরগুণানন্দ ঠাকুর; শ্রীখণ্ড, বর্ধমান; দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৪ কার্ত্তিক, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ১০ [অতঃপর বইটি 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' নামে উল্লিখিত হবে।]

৫৬। তদেব; পৃষ্ঠা - ১০০-১০২।

৫৭। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড): পৃষ্ঠা - ১৩৩-১৩৪।

৫৮। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (প্রথম খণ্ড): পৃষ্ঠা - ১৭৬।

৫৯। তদেব; পৃষ্ঠা - ১৭৭।

৬০। 'কাটোয়ার ইতিহাস'; পৃষ্ঠা – ৭১-৭২।

৬১। 'শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী': জগদ্বন্ধু ভদ্র; সম্পাদনা - মৃণাল কান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির, কলকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ১০৫।

৬২। তদেব; পৃষ্ঠা - ১৩৮।

৬৩। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'; পৃষ্ঠা - ২২৯।

৬৪। 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব'; পৃষ্ঠা – ৬২-৮৫।

৬৫। তদেব: পৃষ্ঠা - ১৮২-১৮৩।

৬৬। 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর'; পৃষ্ঠা - ৩৯৩।

৬৭। তদেব; পৃষ্ঠা - ৩৯৮।

৬৮। 'রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা' (কাটোয়া মহকুমা); পৃষ্ঠা - ১৭৫।

৬৯। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড); পৃষ্ঠা – ১৩৫।

৭০। 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর' পৃষ্ঠা – ৪০১।

৭১। তদেব; পৃষ্ঠা – ৪০১।

৭২। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১৩৫।

৭৩। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পৃষ্ঠা - ২৫১।

৭৪। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১৩৪-১৩৫।

৭৫। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড): পৃষ্ঠা - ১৮৩-১৮৪।

৭৬। 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম'; পৃষ্ঠা - ১৫৮।

৭৭। 'কাটোয়ার ইতিহাস'; পৃষ্ঠা – ৬৮।

৭৮। তদেব; পৃষ্ঠা – ৬৬-৬৭।

৭৯। তদেব; পৃষ্ঠা – ৭৪।

৮০। তদেব; পৃষ্ঠা – ৭৩।

৮১। 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর'; পৃষ্ঠা – ৪৫।

৮২। 'প্রেমবিলাস'; পৃষ্ঠা - ১৪-১৫।

৮৩। 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর'; পৃষ্ঠা – ৪৯।

৮৪। 'প্রেমবিলাস'; পৃষ্ঠা - ২৪৮।

৮৫। তদেব; পৃষ্ঠা - ২৪৯।

৮৬। তদেব; পৃষ্ঠা – ৬০-৬৬।

৮৭। 'রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা' (কাটোয়া মহকুমা); পৃষ্ঠা – ১৮৯।

৮৮। 'শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ'; জীমূতবাহন রায়; বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি, শান্তিনিকেতন; জুলাই ১৯৮৪; পৃষ্ঠা - ১৫৪ [অতঃপর বইটি শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ নামে উল্লিখিত হবে]

৮৯। তদেব; পৃষ্ঠা - ৯০।

৯০। 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম'; পৃষ্ঠা – ৮৮।

৯১। 'রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা' (কাটোয়া মহকুমা); পৃষ্ঠা – ১৯৬।

৯২। 'শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ': পৃষ্ঠা- ২০৮-২১৪।

৯৩। 'রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা' (কাটোয়া মহকুমা): পৃষ্ঠা - ১৯৬।

৯৪। 'কর্ণানন্দ'; যদুনন্দন দাস; প্রকাশক - রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন; বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; ১৫ আশ্বিন ১২৯৮ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ১১ [অতঃপর বইটি 'কর্ণানন্দ' নামে উল্লিখিত হবে।]

৯৫। 'দশদিশি', বিষয়: শ্রীচৈতন্য (দ্বিতীয় পর্ব); সম্পাদক – অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়; প্রবন্ধ – 'ভক্তি, নারীত্বের বিনির্মাণ ও বঙ্গীয় বৈষ্ণবতার প্রশ্রয়' প্রাবন্ধিক - অপর্ণা রায়; সমাদৃতা কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড, কলকাতা - ১০৭; এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০১৫; পৃষ্ঠা - ২২১-২২২।

৯৬। 'রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা' (কাটোয়া মহকুমা): পৃষ্ঠা - ১৯৯।

৯৭। 'কর্ণানন্দ'; পৃষ্ঠা - ১১৯-১২৩।

৯৮। 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর'; পৃষ্ঠা – ৩৯৭।

৯৯। তদেব; পৃষ্ঠা - ৪০৭-৪১০।

১০০। তদেব; পৃষ্ঠা – ৬৩৫-৬৩৮।

১০১। ‘শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড); হরিদাস দাস; নিবেদন – মিহিরকুমার রায়; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা – ৬; প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা – ৩৬১।

১০২। ‘বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ (তৃতীয় খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১৪১।

১০৩। ‘বর্ধমান সমগ্র’ (ষষ্ঠ খণ্ড): সম্পাদনা - গোপীকান্ত কোঙার; প্রবন্ধ – ‘ঐতিহ্যের আলোকে জৌগ্রাম ও কুলীনগ্রাম’; প্রাবন্ধিক - রবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী; মিত্রম্ কলকাতা – ৭৩; প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১১; পৃষ্ঠা – ৪৮৯ [অতঃপর বইটি ‘বর্ধমান সমগ্র’ (ষষ্ঠ খণ্ড) নামে উল্লিখিত হবে।]

১০৪। ‘বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রাম’; সম্পাদনা - পুলককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রবন্ধ – ‘অন্তরঙ্গ অনুসন্ধানে বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রাম’; প্রাবন্ধিক - জগদীশচন্দ্র মণ্ডল; পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৯; প্রথম মুদ্রণ, ২০১৫; পৃষ্ঠা - ২৩ [অতঃপর বইটি ‘বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রাম’ নামে উল্লিখিত হবে।]

১০৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৫।

১০৬। ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’; পৃষ্ঠা - ৬৫।

১০৭। ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ (প্রথম খণ্ড); পৃষ্ঠা – ১৭৪।

১০৮। ‘বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রাম’; প্রবন্ধ – ‘কুলীনগ্রামের বিদ্রোহী কবি মালাধর’, প্রাবন্ধিক- ঝর্না বর্মণ; পৃষ্ঠা – ৬৪।

১০৯। ‘বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রাম’: প্রবন্ধ– ‘কুলীনগ্রামের ভাবসম্পদ ও কীর্তনীয়া সমাজ’, প্রাবন্ধিক - যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী; পৃষ্ঠা – ৭৯।

১১০। ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’; মালাধর বসু; সম্পাদনা – অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গল রাণা; রত্নাবলী, কলকাতা – ৯; দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২; পৃষ্ঠা - ১৬৩।

১১১। তদেব; পৃষ্ঠা – ৬৩।

১১২। তদেব; পৃষ্ঠা – ৬৯।

১১৩। ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’; পৃ: - ২৫১।

১১৪। তদেব; পৃষ্ঠা ২৫১।

১১৫। ‘বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রাম’; প্রবন্ধ – ‘ইতিহাসের আলোকে কুলীনগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি’; প্রাবন্ধিক - সবজিৎ যশ; পৃষ্ঠা - ৯০।

১১৬। ‘বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রাম’; প্রবন্ধ– ‘কুলীনগ্রামের ভাবসম্পদ ও কীর্তনীয়া সমাজ’, প্রাবন্ধিক - যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী; পৃষ্ঠা – ৮১।

১১৭। তদেব; পৃষ্ঠা – ৮২-৮৩।

১১৮। ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’, পৃষ্ঠা - ২৫১।

১১৯। তদেব; পৃষ্ঠা - ২৪৬।

১২০। ‘বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ (তৃতীয় খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১৪২-১৪৩।

১২১। ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’; পৃষ্ঠা - ২২৯।

১২২। ‘বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রাম’; প্রবন্ধ – ‘কুলীনগ্রামের ভাবসম্পদ ও কীর্তনীয়া সমাজ’ প্রাবন্ধিক - যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী; পৃষ্ঠা – ৮৪-৮৫।

১২৩। ‘বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ (তৃতীয় খণ্ড): পৃষ্ঠা – ১৪৩।

১২৪। ‘বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রাম’; প্রবন্ধ – ‘ইতিহাসের আলোকে কুলীনগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি’; প্রাবন্ধিক - সর্বজিৎ যশ; পৃষ্ঠা – ৯৩।

১২৫। ‘বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রাম’; প্রবন্ধ– ‘কুলীনগ্রাম, যবন হরিদাস এবং সারস্বতসাধক কবি কর্ণপুর’, প্রাবন্ধিক- তুলসীদাস চক্রবর্তী; পৃষ্ঠা – ৭০-৭২।

১২৬। তদেব; পৃষ্ঠা - ৭২।

১২৭। 'চৈতন্যমঙ্গল'; জয়ানন্দ; সম্পাদনা - সুখময় মুখোপাধ্যায় ও সুমঙ্গল রাণা; বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, শান্তিনিকেতন; সেপ্টেম্বর ১৯৯৪; পৃষ্ঠা – ৮৯

১২৮। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড): পৃষ্ঠা - ১৭২।

১২৯। তদেব; পৃষ্ঠা – ৭৩।

১৩০। 'কাটোয়ার ইতিহাস'; পৃষ্ঠা – ১০২।

১৩১। 'উৎসবে মেলায় ইতিহাসে'; সুধীর চক্রবর্তী; পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯; অক্টোবর ২০০৪; পৃষ্ঠা – ৪৩। [অতঃপর বইটি 'উৎসবে মেলায় ইতিহাসে' নামে উল্লিখিত হবে।]

১৩২। 'বর্ধমান সমগ্র' (ষষ্ঠ খণ্ড); প্রবন্ধ – 'গোপীনাথ-এর উৎসব ও মেলা : অগ্রদ্বীপ'; প্রাবন্ধিক কালীচরণ দাস; পৃষ্ঠা – ৪৬৬ - ৪৬৭

১৩৩। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১৭৩।

১৩৪। 'কাটোয়ার ইতিহাস'; পৃষ্ঠা - ১৪২।

১৩৫। 'বর্ধমান সমগ্র' (ষষ্ঠ খণ্ড); প্রবন্ধ – 'গোপীনাথ-এর উৎসব ও মেলা : অগ্রদ্বীপ'; প্রাবন্ধিক কালীচরণ দাস; পৃষ্ঠা – ৪৬৮।

১৩৬। তদেব; পৃষ্ঠা – ৪৬৬।

১৩৭। 'কাটোয়ার ইতিহাস'; পৃষ্ঠা - ১৪৩।

১৩৮। 'মেলা-মোচ্ছব-ধুলোট'; লীনা চাকী; কারিগর, কলকাতা; কারিগর সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩; পৃষ্ঠা – ৭১ [অতঃপর বইটি 'মেলা-মোচ্ছব-ধূলোট' নামে উল্লিখিত হবে।]

১৩৯। 'কাটোয়ার ইতিহাস'; পৃষ্ঠা – ১০৪।

১৪০। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১৭৩ - ১৭৪।

১৪১। 'কাটোয়ার ইতিহাস'; পৃষ্ঠা – ১০৭।

১৪২। 'বর্ধমান সমগ্র' (ষষ্ঠ খণ্ড); প্রবন্ধ – 'গোপীনাথ-এর উৎসব ও মেলা : অগ্রদ্বীপ', প্রাবন্ধিক কালীচরণ দাস; পৃষ্ঠা – ৪৬৭।

১৪৩। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'; পৃষ্ঠা: - ২২৯।

১৪৪। 'কাটোয়ার ইতিহাস'; পৃষ্ঠা - ১১৪।

১৪৫। 'বর্ধমান সমগ্র' (ষষ্ঠ খণ্ড); প্রবন্ধ – 'গোপীনাথ-এর উৎসব ও মেলা : অগ্রদ্বীপ'; প্রাবন্ধিক-কালীচরণ দাস; পৃষ্ঠা – ৪৭২ - ৪৭৩।

১৪৬। 'মেলা-মোচ্ছব-ধুলোট'; পৃষ্ঠা – ৮২।

১৪৭। 'উৎসবে মেলায় ইতিহাসে'; সুধীর চক্রবর্তী; পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯ অক্টোবর ২০০৪; পৃষ্ঠা – ৪৯।

১৪৮। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড); পৃষ্ঠা - ১৭৪ – ১৭৬।

১৪৯। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড); পৃষ্ঠা – ১১৮

১৫০। তদেব; পৃষ্ঠা – ১১৯-১২০।

১৫১। Vipradasa; 'Manasa-Vijaya'; Edit by –Sukumar Sen; The Asiatic Society, Park Street, Kolkata; 1953; page –142.

১৫২। 'চণ্ডীমঙ্গল'; মুকুন্দরাম চক্রবর্তী; সম্পাদনা – সুকুমার সেন; সাহিত্য অকাদেমী; নতুন দিল্লী; তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৩ সাল; পৃষ্ঠা- ২৬৭।

১৫৩। 'চৈতন্যমঙ্গল'; জয়ানন্দ; পৃষ্ঠা – ৮৯।

১৫৪। ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত’ ; বৃন্দাবন দাস ; পৃষ্ঠা - ২৬৬
১৫৫। ‘বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ (তৃতীয় খণ্ড) ; পৃষ্ঠা – ১১৯।
১৫৬। তদেব ; পৃষ্ঠা – ১১৯।
১৫৭। ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ (প্রথম খণ্ড) ; বিনয় ঘোষ ; পৃষ্ঠা –২৫।
১৫৮। ‘বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ (তৃতীয় খণ্ড) ; পৃষ্ঠা – ১২০।
১৫৯। ‘কালনার ইতিবৃত্ত’ ; দীপককুমার দাস ; ভাষাপথ, নির্ঝর স্মৃতি, কালীতলা, মধুবন, কালনা, বর্ধমান ; তৃতীয় সংস্করণ – ২০১৭ সাল ; পৃষ্ঠা – ৬।
১৬০। ‘শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) ; হরিদাস দাস ; পৃষ্ঠা – ১০৭
১৬১। তদেব ; পৃষ্ঠা – ১০৭।
১৬২। ‘শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) ; পৃষ্ঠা – ১০৭।
১৬৩। ‘Vaisnavism in Bengal (1486-1900)’; Ramakanta Chakravarti; Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta; First Published, October, 1985. Page – 165.
১৬৪। ‘শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর’ ; নরহরি চক্রবর্তী ; পৃষ্ঠা – ৩৫১
১৬৫। শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর ; পৃষ্ঠা – ৩৫১।
১৬৬। তদেব ; পৃষ্ঠা – ৩৫২।
১৬৭। তদেব ; পৃষ্ঠা – ৩৫২।
১৬৮। ‘বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ (তৃতীয় খণ্ড) ; পৃষ্ঠা – ১২২-১২৩।
১৬৯। ‘বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি’ ; ষষ্ঠিচরণ ভট্টাচার্য ; পৃষ্ঠা - ২৩
১৭০। ‘গৌরাঙ্গ পরিজন’ ; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ; পৃষ্ঠা- ৩৩৩-৩৩৪।
১৭১। ‘শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর’ ; পৃষ্ঠা – ৩৫৩।
১৭২। ‘ইতিহাসের পায়ে পায়ে’ ; বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ; মহাপ্রভুপাড়া, কালনা, বর্ধমান ; দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১৪ সাল ; পৃষ্ঠা – ১৯২ [অতঃপর বইটি ইতিহাসের পায়ে পায়ে নামে উল্লিখিত হবে।]
১৭৩। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষা ; সাক্ষাৎকারদাতা – বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ; বয়স – ৬৩ বছর ; অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক ; ঠিকানা – মহাপ্রভুপাড়া, কালনা, বর্ধমান ; তারিখ – ২৭.০৬.২০১৯ ; সাক্ষাৎকার গ্রহীতা – মিতালী বিশ্বাস।
১৭৪। তদেব।
১৭৫। ‘বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি’ ; পৃষ্ঠা – ২৭।
১৭৬। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষা ; সাক্ষাৎকারদাতা – বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ; বয়স – ৬৩ বছর ; অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক ; ঠিকানা – মহাপ্রভুপাড়া, কালনা, বর্ধমান ; তারিখ – ২৭.০৬.২০১৯ ; সাক্ষাৎকার গ্রহীতা – মিতালী বিশ্বাস।
১৭৭। তদেব।
১৭৮। ‘বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি’ ; পৃষ্ঠা – ২৮।
১৭৯। ‘ইতিহাসের পায়ে পায়ে’ ; পৃষ্ঠা – ৫৭-৫৯।
১৮০। তদেব ; পৃষ্ঠা – ৫৯-৬২।
১৮১। তদেব ; পৃষ্ঠা – ৬২-৬৩।
১৮২। তদেব ; পৃষ্ঠা – ৪৮-৪৯।
১৮৩। ‘Origin and Devalopment of Vaisnavism in Manipur’; Dr. Dwijendra Narayan Goswami; Akshar Publications, Jagannath Bari Road Agartala Tripura; Book Fair 2010; page

- 55.[অতঃপর বইটি Origin and Devalopment of Vaisnavism in Manipur ; নামে উল্লিখিত হবে।]

১৮৪। 'Origin and Devalopment of Vaisnavism in Manipur'; page - 56-57.

চতুর্থ অধ্যায়

বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চায় দুই জেলার পাটবাড়ির তুলনা

বাংলাদেশে ভক্তি আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল নদিয়া জেলায়। কিন্তু সেই আন্দোলনের বিকাশ ও প্রসার ঘটেছিল বর্ধমান জেলায়। মাধবেন্দ্রপুরীর নির্দেশে অদ্বৈতাচার্য যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার প্রধান নেতৃত্ব ছিলেন শ্রীচৈতন্য। তবে চৈতন্য বাংলাদেশ ছেড়ে নীলাচলে চলে যাওয়ায় স্তিমিত আন্দোলনে তেজজ্যোতি ফিরিয়ে এনেছিলেন নিত্যানন্দসহ বর্ধমানের মহতী বৈষ্ণবরা। অধ্যাপক ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ও এই একই মত প্রকাশ করেছেন –

> "... গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নবদ্বীপে, কিন্তু তার প্রধান কর্মকাণ্ড ছিল কাটোয়া, কালনা, বাঘনাপাড়া ও শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যরা বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে নরহরি সরকারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানের কায়স্থরাও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কুলিনগ্রামের মালাধর বসু, যিনি ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধ অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনা করেছিলেন।"[১]

যথার্থেই নদিয়ায় শান্তিপুর, নবদ্বীপ, যশড়া ও কুলিয়া প্রভৃতি বৈষ্ণব শ্রীপাট এবং বর্ধমানের কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কুলীনগ্রাম, অগ্রদ্বীপ ও অম্বিকা কালনা ইত্যাদি শ্রীপাট বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের প্রসারে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছিল।

চৈতন্যোত্তর যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত নানা সময়ে নদিয়া ও বর্ধমান জেলার এই বৈষ্ণব শ্রীপাটগুলো সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার দিক থেকেও প্রভূত মুন্সীয়ানা দেখিয়েছে। এই জেলার শ্রীপাটের সাহিত্যচর্চা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমে নদিয়া জেলাতে উল্লেখযোগ্য কোনো বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয়নি। সেই সময় নবদ্বীপ ভারতের মূল শিক্ষাক্ষেত্র হলেও সেখানে মূলত ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন ও তর্ক ইত্যাদি পড়ানো হত। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর পর নদিয়ায় চৈতন্যদেবের জীবনীকাব্য – মুরারিগুপ্তের কড়চা, অদ্বৈতাচার্যের জীবনী - ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ', হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল', সীতাদেবীর জীবনী - বিষ্ণুদাস আচার্যের 'সীতাগুণকদম্ব', লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র', জগদীশ পণ্ডিতের জীবনী আনন্দচন্দ্র দাসের 'জগদীশ চরিত্র বিজয়' এবং শ্রীদেবকীনন্দন দাসের (চাপাল গোপাল) 'শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা' ও 'বৈষ্ণবভিধান' ইত্যাদি বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয়েছিল। এরপর অনেকটা সময় জুড়ে নদিয়া নবদ্বীপ অঞ্চলে বিশেষ কোনো সাহিত্য রচিত হয়নি। একেবারে বিংশ শতাব্দীতে এসে নবদ্বীপের হরিবোল কুটীরের প্রধান বৈষ্ণব হরিদাস দাস অসংখ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করেন এবং সম্পাদনা করেন। হরিবোল কুটীরের বর্তমান সদস্য আনন্দদাসের কথা অনুযায়ী হরিদাস রচিত ও সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশো-সাড়ে তিনশোটি। বর্তমানে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, যশড়া ও কুলিয়া শ্রীপাটে আলাদা করে কোনো বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত না হলেও নিয়মিত বিভিন্ন বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চা হয়। শান্তিপুরের শ্রীপাটগুলোতে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে ভাগবত পাঠ এবং বিভিন্ন উৎসবে চৈতন্য জীবনীকাব্য ও অদ্বৈতের জীবনীকাব্য 'শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ'-এর চর্চা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন শাস্ত্রচর্চা তো আছেই। নবদ্বীপের বিভিন্ন শ্রীপাটেও নিয়মিত ও বিশেষ উৎসবে এই বৈষ্ণব সাহিত্যগুলো চর্চা হয়। আবার নবদ্বীপের শ্রীপাটগুলোর নিজেস্ব গ্রন্থমন্দির আছে। যেখানে বিভিন্ন বৈষ্ণব ও গবেষকদের রচিত নানা প্রাপ্য ও দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্ভার আছে। যশড়া শ্রীপাটের নিজস্ব গ্রন্থ মন্দির

না থাকলেও এখানে নিয়মিতভাবে এবং নানা উৎসবে বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ হয়। তবে কুলিয়া শ্রীপাটে এই সাহিত্যচর্চার রেওয়াজ যথেষ্ট কম।

কথায় আছে, বর্ধমান পদকর্তা ও কবির দেশ। বর্ধমানে বৈষ্ণব পদকর্তা, কবি থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্যের কবি ও শাক্তপদাবলির কবিরাও জন্মগ্রহণ করেছেন। মধ্যযুগের সাহিত্যচর্চার উৎকর্ষতায় বর্ধমান অগ্রগণ্য। আর বৈষ্ণব সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তো এখানে একাধিক কবির দর্শন মেলে। মালাধর বসু ('শ্রীকৃষ্ণবিজয়'), লোচন দাস ('চৈতন্যমঙ্গল'), বৃন্দাবন দাস ('চৈতন্যভাগবত'), কৃষ্ণদাস কবিরাজ ('শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত') ; বৈষ্ণব পদকর্তা - গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, নরহরি সরকার, লোচন দাস, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, যদুনন্দন, জগদানন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীরঘুনন্দন, রামানন্দ বসু প্রমুখ কবির চরাচর ক্ষেত্র এই জেলা।

তবে ইদানিং কালে বর্ধমানের বিভিন্ন শ্রীপাটে যেমন – কাটোয়া, কুলীনগ্রাম, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, অগ্রদ্বীপে ও অম্বিকা কালনায় নতুন কোন বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত না হলেও বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চা কিন্তু পুরোমাত্রায় আছে। শ্রীখণ্ডে নরহরি ঠাকুরের বংশধর গৌরগুণানন্দ ঠাকুর বিংশ শতাব্দীতে 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব', 'গৌরাঙ্গগীতা', 'রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ', 'শ্রীশ্রীগৌরভক্তিচন্দ্রিকা', 'বৈষ্ণব অভিধান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি অসংখ্য পদও রচনা করেছিলেন, বর্তমানে সেগুলোর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে শ্রীখণ্ডের মধুমতী সমিতি বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থের সঙ্গে এখনও 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' ও 'গৌরাঙ্গগীতা' বই দুটি সম্পাদনা করেন। বর্ধমানের শ্রীপাটগুলো বেশিরভাগই গ্রামকেন্দ্রিক হওয়ায় এখানে কথকতার রেওয়াজ প্রবল। প্রত্যেকটি শ্রীপাটে নিত্য ভাগবত পাঠ ও নামগান হয়। বিশেষ উৎসবে ভাগবত পাঠের সঙ্গে চৈতন্যজীবনী কাব্যপাঠ ও নানা শাস্ত্র আলোচনাও চলে।

বর্ধমানের শ্রীপাটের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কীর্তনগানের চর্চা। খেতুরি উৎসব যে বিভিন্ন বৈষ্ণৱ ঘরানার সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে রেনেটি, মান্দারনী এবং মনোহরশাহী বৈষ্ণব ঘরানা বর্ধমানেই প্রবর্তিত হয়েছিল। তবে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত বর্ধমানের শ্রীখণ্ডে জাত মনোহরশাহী ঘরানা। মনোহরশাহী কীর্তন সম্পর্কে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন -

> "মনোহরশাহী। বাংলা কীর্তনের প্রচলিত ধারাগুলির মধ্যে এখন অন্যতম প্রধান ঘরানা। কীর্তনের অন্য ধারাগুলি ক্ষীণ হয়ে গেলেও একমাত্র মনোহরশাহী ঘরানাই এখন বাংলা কীর্তনের মূল ধারা হিসেবে টিকে রয়েছে।"[২]

শুধু তাই নয় শ্রোতারাও লীলা কীর্তনের সম্পূর্ণ রূপ বলতে মনোহরশাহীকেই বোঝেন। বর্ধমানই নয় নদিয়াতেও মনোহরশাহী কীর্তন ঘরানার প্রচলন আছে। তবে নদিয়াতে একসময় গরানহাটি কীর্তনের প্রভাব ছিল। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে – "বাংলাদেশের রাজশাহীতে উৎপত্তি হলেও গরানহাটি কীর্তনের বিস্তারভূমি ছিল নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদ।"[৩]

খেতুরি উৎসবের অনেক আগে থেকেই নদিয়াতে কীর্তনের প্রচলন ছিল। চৈতন্য আবির্ভাবের আগে থেকেই অদ্বৈতাচার্য ব্যাক্তিগত উদ্যোগে নাম-সংকীর্তন করতেন। কিন্তু সমাজের প্রবল ব্রাহ্মণ্য প্রতাপ থেকে বাঁচতে এই কীর্তন কিছুটা আড়াল-আবডালেই হত।

গবেষক হিতেশরঞ্জন সান্যাল লিখেছেন – "অদ্বৈত আচার্যর নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের বাড়ীতেও কীর্তন হইত। বাড়ীর মধ্যে যে কীর্তন হইত তাহা অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে একান্তে ভক্তিসাধনা।"[৪] তবে সমাজের ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন ও রাজশক্তির রক্ত চক্ষুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সংকীর্তনকে সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ্য জনপথে এনে হাজির করেছিলেন নদিয়া-নাগর গৌরাঙ্গ। সেদিন সমগ্র নবদ্বীপবাসী দুয়ারে শতকোটি মঙ্গলঘট

স্থাপন করে, কোটি কোটি মঙ্গলদ্বীপ জ্বেলে মহোৎসবের সাজে সেজে উঠেছিল। কারণ শচীনন্দন যে ঘোষণা করেছিলেন –

"সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন।
দেখি মোরে কোন কর্ম করে কোনজন।।"[৫]

যেমন কথা, তেমনি কাজ। সন্ধ্যাবেলায় শুরু হল সেই পরিকল্পিত নগর সংকীর্তন।

"হরি বলি ডাকিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
সকল বৈষ্ণবগণ হইলা সত্বর।।
করিতে লাগিলা প্রভু বেঢ়িয়া কীর্ত্তন।
সভয়ে অঙ্গেতে মাল্য শ্রীখণ্ড চন্দন।।
...
চতুর্দিগে কোটি কোটি মহাদ্বীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দিগে হরি বোলে।।"[৬]

ষোড়শ শতাব্দীতে গৌরাঙ্গই বাংলার প্রচলিত কীর্তনের ঢঙকে এক নতুন পথে পরিচালিত করেছিলেন। শ্রীখোল, মৃদঙ্গ, মন্দিরা ও শঙ্খসহ গেয় কীর্তনের সঙ্গে তিনি করতালি যুক্ত নর্তনকেও যোগ করলেন। নবদ্বীপবাসীকে – 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।' এই মহামন্ত্র কৃষ্ণনাম শুনিয়ে নতুন কীর্তন রীতি শেখালেন। তিনি বললেন –

"দশে পাঁচে নিজ গৃহ-দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্তন করহ সবে হাথে তালি দিয়া।।"[৭]

গৌরাঙ্গ মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য ঈশ্বরানুদেশে প্রেমদান ও সংকীর্তন পথকে বেঁচে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর এত ব্যাগ্রতা এত চিন্তা। লোচনদাস লিখেছেন –

"...নিজ করুণায় প্রেমা করিবে প্রচার।।
ধর্ম্ম-সংস্থাপন ক্ষিতি করিবে কীর্তন।
খেদ না করিহ কার্য্য কর আরোপণ।।"[৮]

তাই নিজ অনুচর মুরারি গুপ্তকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন –

"জিবারে বাসনা যদি থাকয়ে তোমার।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে যদি সাধ থাকে আর।।
অধ্যাত্ম-চরচা তবে কর পরিত্যাগ।
গুণ সঙ্কীর্তন কর কৃষ্ণে অনুরাগ।।"[৯]

নগরবাসী গৌরাঙ্গের ডাকে সাড়া দিয়ে সন্ধ্যাকালে কীর্তন গানে মত্ত হলেন। বৃন্দাবন দাস লিখছেন –

"পরম আনন্দে সব নগরিয়াগণ।
হাথে তালি দিয়া বোলে রাম নারায়ণ।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্বঘরে।
দুর্গোৎসব-কালে বাজাবার তরে।।
সেই সব বাদ্য ইবে কীর্তন সময়ে।
গায়েন বায়েন সভে আনন্দ হৃদয়ে।।
হরি ও রাম রাম হরি ও রাম।
এমত নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম।।"[১০]

নবদ্বীপবাসীদের সঙ্গে গৌরাঙ্গ নিজেও নাচ-গানসহ কীর্তন করতেন। নাচবার সময় তাঁর মধ্যে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হত। কীর্তনের সময় নর্তনে তিনি পরিকরদেরও সংযুক্ত করতেন। জয়ানন্দ জানিয়েছেন –

"সংকীর্ত্তনে নাচে প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে
কত সুরধনী বহে নয়ন তরঙ্গে।
শ্বাস হাস স্বেদ কম্প হুঙ্কায় গর্জনে
অবনী ভরিল প্রেম মেঘ বরিষণে।"[১১]

অতীতের এই সংকীর্তনের ঐতিহ্য বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে নবদ্বীপের শ্রীপাটগুলোর বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে। এমনিতে এখানে প্রায় সবসময় কীর্তন হলেও ধুলোট উৎসবে নবদ্বীপ ধামের কীর্তন বাংলাখ্যাত। বিশিষ্ট কীর্তন রসিক ও মৃদঙ্গ বিশারদ মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী জানিয়েছেন –

"বৈষ্ণবদের কার্তিকব্রত বা পুরশ্চরণকাল হয় রাসপূর্ণিমায়। মাসাধিক এই সময়ে নবদ্বীপের প্রতিটি ঠাকুরবাড়ীতে বড় বড় গায়কদের গান থাকে। এই ঠাকুরবাড়ীগুলির মধ্যে মহাপ্রভুর বাড়ী, নিতাইর বাড়ী, গোবিন্দবাড়ী, শ্রীবাসঅঙ্গন, নবদ্বীপ হরিসভা, মদনমোহনের বাড়ী ইত্যাদি প্রধান। প্রায় প্রতিদিনই নগরসংকীর্তন এবং ধাম-পরিক্রমার দল নিয়ে সংকীর্তনাদি হয়ে থাকে।"[১২]

এই ধুলোট উৎসব অদ্বৈতপাট শান্তিপুরেও হয়। তবে শান্তিপুরের কীর্তন উৎসবের সঙ্গে একটি বিশেষ পূর্বস্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় মৃগাঙ্কশেখরের লেখায় –

"নদীয়া জেলার শান্তিপুরের অতিনিকটে 'বাবলাগ্রাম',...কীর্তনের ইতিহাসে এ স্থানটির গুরুত্ব খুবই বেশি, কারণ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ যৌথভাবে বিধিসম্মত কীর্তনের আয়োজন করেন এখানেই।"[১৩]

বর্ধমানের কীর্তনগান চর্চার কথা সর্বজনবিদিত। সারাবছর বিভিন্ন সময়ে বর্ধমানের শ্রীপাটগুলিতে বড় বড় কীর্তনের আসর বসে। এককথায় বাংলার কীর্তনের বর্তমান রূপটি ভীষণভাবে জীবিত আছে বর্ধমানের শ্রীপাটগুলোকে কেন্দ্র করেই। সেই কীর্তন হল মনোহরশাহী ঘরানা। কয়েক দশক আগেও বর্ধমানের শ্রীখণ্ডে নিয়মিত কীর্তন অধ্যায়ন করানো হত। নরহরি সরকারের উত্তরপুরুষ বিশিষ্ট কীর্তন সাধক গৌরগুণানন্দ ঠাকুর ছাত্রদের মনোহরশাহী কীর্তনের শিক্ষা দিতেন। সার্বভৌম কীর্তন গায়ক গৌরগুণানন্দ শুধুমাত্র মনোহরশাহীই নয় গরানহাটি ও রেনেটি কীর্তন ঘরানায়ও স্বচ্ছন্দবিহারী ও সিদ্ধকণ্ঠ ছিলেন। গরানহাটি ঢঙের শেষ বড় গায়ক ছিলেন তিনিই।[১৪] তবে এখন বর্ধমান ও নদিয়া উভয় জেলাতেই মনোহরশাহী কীর্তনের চর্চাই বেশি হয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতও প্রায় একই –

"বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে মনোহরশাহী কীর্তনের খুব ঘটা হইত। উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রীপাট, মন্দির, আখড়া বা জমিদারদের ঠাকুরবাড়ীতে কীর্তনের আসর বসিত। এখনও কয়েক জায়গায় বসে। নবদ্বীপে মাঘী পূর্ণিমায় ও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চৈতন্যদেবের জন্মতিথি উৎসব, শ্রীখণ্ডে (বড়ডাঙ্গা) নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব তিথি উপলক্ষ্যে গৌর নরহরি মিলন মহোৎসব, কাঁদরার সাঁজা ... উৎসবের কীর্তন সমারোহ সুপ্রসিদ্ধ।"[১৫]

সামগ্রিক আলোচনার পর বোঝা যাচ্ছে, নদিয়া ও বর্ধমান জেলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিচর্চার দিক থেকে সমানভাবে অগ্রগণ্য। শ্রীপাটগুলো নিজেদের রীতিনীতির মধ্যে এই ধারাকে সুন্দরভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে।

তথ্যসূত্র :

১। 'বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান'; সম্পাদনা - জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও গিরিধারী সরকার; প্রবন্ধ – 'বর্ধমানের ধর্মীয় বাতাবরণ সেকাল-একাল', প্রাবন্ধিক - ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়; দে' জ পাবলিশিং, কলকাতা –

৭৩ ; প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১২ ; পৃষ্ঠা – ৬৯।

২। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ; দৈনিক সম্পাদক - অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ; প্রবন্ধ – 'কাহিনির টানেই জনপ্রিয়তা বেড়েছে মনোহরশাহী ঘরানার', প্রাবন্ধিক - দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা - ১ ; ১৫ জুন, ২০১৬ সাল ; পৃষ্ঠা - ১৩।

৩। তদেব ; পৃষ্ঠা - ১৩।

৪। 'বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস' ; হিতেশরঞ্জন সান্যাল ; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী,

কলকাতা - ১২ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১২ ; পৃষ্ঠা - ৩১ [অতঃপর বইটি 'বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস' নামে উল্লিখিত হবে।]

৫। 'চৈতন্যভাগবত বৃন্দাবন দাস' ; সম্পাদনা - সুকুমার সেন ; সাহিত্য আকাদেমি, কলকাতা - ২৫ ; চতুর্থ মুদ্রণ ২০১১ ; পৃষ্ঠা - ১৮৫ [অতঃপর বইটি 'চৈতন্যভাগবত' নামে উল্লিখিত হবে।]

৬। তদেব ; পৃষ্ঠা - ১৮৬-১৮৭।

৭। তদেব ; পৃষ্ঠা - ১৮৪।

৮। 'চৈতন্য-মঙ্গল' ; লোচনদাস ; সম্পাদনা- রমনারায়ণ বিদ্যারত্ন ; বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ; ১লা মাঘ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ ; পৃষ্ঠা - ১৫৮।

৯। তদেব ; পৃষ্ঠা - ১৭২।

১০। 'চৈতন্যভাগবত' ; পৃষ্ঠা - ১৮৫।

১১। 'চৈতন্যমঙ্গল' ; জয়ানন্দ ; সম্পাদক - সুখময় মুখোপাধ্যায়, সুমঙ্গল রাণা ; গবেষক প্রকাশন বিভাগ বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ; সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সাল ; পৃ : - ৮৪।

১২। 'বাংলার কীর্তন গান' ; মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী ; সাহিত্যলোক, কলকাতা - ৬ ; দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ, ১৯৯৮ ; পৃষ্ঠা - ১১।

১৩। তদেব ; পৃষ্ঠা - ১০-১১।

১৪। 'বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস' ; পৃষ্ঠা - ১৬৬।

১৫। তদেব ; পৃষ্ঠা - ১৭১।

নির্যাস কথন

একসময় ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে ছিল বৈষম্যজনিত কঠোর অনুশাসন। মানবিকতার পরিবর্তে ছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জাত-অজাত বিচার। উন্নত ও প্রসারিত চিন্তার বদলে কূপমণ্ডুকতা। আর শাক্ত ও লৌকিক ধর্ম পালনের নামে ছিল উদারতাহীন পাশবিক রক্তাক্ত খেলা, ইত্যাদি থেকে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন ভক্তিসুরে বাঁধা বৈষ্ণবধর্মে। যেখানে ধর্মশাস্ত্র হল 'কৃষ্ণনাম', সাধ্য-সাধন হল কৃষ্ণ আর সাধনের উপাদান গ্লানিমুক্ত, উদার ও প্রেমপূর্ণ একটি মন। বাংলার সমস্ত বৈষ্ণব নেতৃত্বরা প্রেম বিলিয়ে মানুষকে ভক্তি ও মুক্তির গান শিখিয়েছিলেন। এই নেতৃত্বদের বিশেষ করে চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদদের বসবাস ভূমি এবং তাঁদের নানা স্মৃতি বিজড়িত স্থানকে কেন্দ্র করে যে শ্রীপাট গড়ে উঠেছিল সেগুলোই বর্তমানে বৈষ্ণব ধর্মের এক একটা বড় প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে কিছু গৌড়ীয় মঠ, বৈষ্ণব আখড়া, বৈষ্ণব আশ্রম ও বৈষ্ণব মন্দির ছাড়া শুধুমাত্র বৈষ্ণব পাটবাড়িতেই বৈষ্ণব ধর্ম লালিত ও পালিত হচ্ছে। যদিও আখড়া ও আশ্রমগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলার গৌণ ধর্মের কেন্দ্র।

বাংলাদেশের শ্রীপাটগুলো জীবন্ত এক কাহিনির সম্ভার। যার কর্ণধার হল শ্রীপাটের বিগ্রহ। আর যেন বিগ্রহদের দ্বারাই শ্রীপাটের সেবাইত সদস্যরা নিয়ন্ত্রিত হন। তাঁদের ওঠা-বসা, কাজ-কর্ম সমস্ত কিছুই এই বিগ্রহকে ঘিরে। এখানে আরও একটি দিক আছে, সমাজের আপামর সাধারণ মানুষ বা পাটবাড়ির সেবাইতদের শিষ্যকুল। যাদের নির্ভর করে আরও সজীব হয়ে উঠেছে বৈষ্ণব ধর্মের মূল কেন্দ্র এই শ্রীপাটগুলো। পূর্ব অধ্যায়গুলোতে নদিয়া ও বর্ধমান জেলার বিভিন্ন পাটবাড়ির কথা আলোচনা সূত্রে আমরা এই কথা প্রমাণ করেছি। নদিয়া ও বর্ধমান জেলার শ্রীপাটের সেবাইত বংশধররা অনেকেই (যেমন – শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কাটোয়া, যাজিগ্রাম, শ্রীখণ্ড, অম্বিক কালনা, কুলীনগ্রাম, কুলিয়া) দ্বার পরিগ্রাহী। তাই কেবল রাধাকৃষ্ণের যুগল সাধনার কারণেই নয় গৃহী বৈষ্ণবদের ঐতিহ্যানুসারেই পাটবাড়িগুলোতে শ্রীকৃষ্ণের পাশে শ্রীরাধিকা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বিস্তারিত ক্ষেত্রে সমীক্ষার সাহায্যে আমরা জানতে পেরেছি, পাটবাড়ির সেবাইত বংশধররা বিগ্রহকে (কৃষ্ণ ও রাধিকাকে) বাড়ির ছেলে ও বধূরূপে সেবা করেন। বিগ্রহের জন্য ঋতুভেদে ভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ, ভোগ, শৃঙ্গার ও অলংকারের ব্যবস্থা আছে। গরমে হালকা পোশাক ও শীতে গরম পোশাক পরানো হয়। বিগ্রহের শয্যার ব্যবস্থা, স্নানের ব্যবস্থা প্রভৃতি ধুলো-মাটি মাখা পৃথিবীর মানুষের অনুরূপ। তাঁরা যেন বাড়ির ছেলেকেই নিজেদের সাধ্য ও সামর্থ মত সেবা দেন। এখানে কোনো কৃত্তিমতা নেই। বাহ্যিক কঠোরতা ও নিয়মের আতিশয্যও অনুপস্থিত। বাড়ির মহিলারা নিজের হাতে রান্না করে আন্তরিকভাবে বিগ্রহকে অর্পণ করেন (এই ঘটনাটি বেশি লক্ষ করা যায় শান্তিপুরের শ্রীপাটগুলোতে)। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

"দেবতারা যখন বাহিরে থাকেন, যখন মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ অনুভূত হয় না, তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কেবল কামনার সম্বন্ধ ও ভয়ের সম্বন্ধ। ... এই কামনা এবং ভয়ের পূজা বাহ্য পূজা, ইহা পরের পূজা। দেবতা যখন অন্তরের ধন হইয়া ওঠেন, তখনই অন্তরের পূজা আরম্ভ হয় – সেই পূজাই ভক্তির পূজা।" ('শান্তিনিকেতন ভাষণমালা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী; বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।)

পাটবাড়ির সেবাইতরা অন্তরের পূজাকে পালন করেন আর কামনার পূজাকে লালন করেন। অর্থাৎ একদিকে তারা বিগ্রহগুলিকে নিজেদের ঘরের মানুষ মনে করে আন্তরিকভাবে সেবা করেন। অন্যদিকে

বাহ্যিকভাবে উন্নতি ও প্রাপ্তির কামনা করে বিগ্রহের কাছে মানত করেন। যাই হোক, এই কামনা শুধু তাঁদেরই নয় আপামর শিষ্য বর্গেরও।

শ্রীপাটগুলো যত বেশি ধর্মীয় গণ্ডি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সামাজিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে, সাধারণ মানুষের কাছে বৈষ্ণব ধর্মের গ্রহণীয়তাও তত বাড়ছে। বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রীপাটগুলো নানা ভূমিকা পালন করে। সমাজের অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষরা শ্রীপাটে নিয়মিত বিনামূল্যে খেতে পায়। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে শ্রীপাটগুলো আর্ত দুঃস্থ মানুষদের নানা জিনিষ দান করে। দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় সাহায্য করে। গরিব মানুষের জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু সংক্রান্ত নানা শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান শ্রীপাটগুলোর মাধ্যমে প্রায় বিনমুল্যেই নির্বাহ হয়। এর ফলে শ্রীপাটগুলো শুধু ধর্মের নয়, ধীরে ধীরে সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। আমরা চতুর্থ অধ্যায়েই দেখেছি, নদিয়া ও বর্ধমানের শ্রীপাটগুলোতে বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চার যথাযথ রেওয়াজ আছে। নিয়মিত বৈষ্ণব গ্রন্থের পঠন পাঠনের সঙ্গে কোনো কোনো পাটবাড়ির নিজস্ব মুখপত্রও আছে। নদিয়ার শান্তিপুর শ্রীপাটের মুখপত্র সমাজের প্রতিচ্ছবি' ও 'চিত্রভানু'। নদিয়া (নবদ্বীপ, কুলিয়া ও যশড়া) ও বর্ধমানের অন্যান্য শ্রীপাটগুলোরও (কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কুলীনগ্রাম, অগ্রদ্বীপ ও অম্বিকা কালনা) মুখপত্র হিসাবে কিছু পুস্তিকা রয়েছে। উপস্থিত ভক্ত সমক্ষে শ্রীপাটে নিয়মিত শাস্ত্র চর্চা হয়। স্মরণীয়, মধ্যযুগের মৌখিক সংস্কৃতিচর্চার প্রথাটি পাটবাড়িগুলোর কথকতার আসরের মধ্যে দিয়ে এখনও বেঁচে আছে। প্রতিষ্ঠাকালে ধর্মীয় আবেদন কাজ করলেও ক্রমশ শ্রীপাটগুলি ধর্মীয় সংকীর্ণতা অতিক্রমী সংস্কৃতিচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

সংস্কৃতিপূর্ণ উন্নত মনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। অতীতে পাটবাড়ির সদস্যদের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু পুরুষরাই নয়, নারীরাও উল্লেখযোগ্য এক নজির তৈরি করেছিলেন। গোলাম মুরশিদ জানিয়েছেন –

> "ধনী-দরিদ্র কোনো মহিলাকে লেখাপড়া শেখানোর রীতি প্রাচীন অথবা মধ্যযুগের বঙ্গদেশে ছিলো না। তবে ব্যতিক্রম ছিলো বৈকি! ... ষোলো শতকে অদ্বৈতাচার্যের স্ত্রী সীতাদেবী এবং নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবাদেবী বৈষ্ণবশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। .. শ্রীনিবাস আচার্যের পত্নী পদ্মাবতীও এই শতকে শাস্ত্রজ্ঞান এবং সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন।" (হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি গোলাম মুরশিদ; অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা - ১১০০; সপ্তম মুদ্রণ, জুলাই ২০১৪; পৃষ্ঠা - ২৩৯।)

সীতাদেবী, পদ্মাবতী দেবী, হেমলতা ঠাকুরানি প্রমুখ বৈষ্ণব নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পর্দাপ্রথাকে ভেঙে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সমাজে সম্মানীয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। সীতাদেবী সমাজের বাঁধা ছকের বাইরে এসে রূপান্তরকামী মানুষদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এছাড়া অন্যরাও নিজস্ব শিষ্যবর্গের মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনে যথাযথ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে বর্তমানে শ্রীপাটগুলিতে বা বৈষ্ণব সমাজে নারীর স্বাধিকার কিছুটা হলেও খর্ব হয়েছে। শান্তিপুর ও যাজিগ্রাম শ্রীপাট ছাড়া আর কোথাও তেমন করে নারীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায় না। শ্রীখণ্ড শ্রীপাটে কিছু বৃদ্ধা মহিলার আবাসনের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া সার্বিকভাবে নারীদের প্রভাব খুবই কম। এই বৈষ্ণব নারীরাই একদিন সমাজের সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের পর্দানসীন নারীদের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। একসমইয়ে সমাজের উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত পরিবার, কলকাতার ঠাকুর পরিবারের অন্দরমহলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন বৈষ্ণব নারীরা ['আত্মজীবনী'; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন; ১৯৮১; পৃষ্ঠা - ২৫২-২৫৩] কিন্তু সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। পাটবাড়িগুলিতে চিরকালই রক্ষণশীল নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা ছিল। তাই সেই অর্থে সমাজের পতিতা ও অসহায় নারীদের পুনর্বাসনের ও বিকাশের জায়গা বৈষ্ণব শ্রীপাট নয়। বরং এর বিস্তারিত পরিসর মেলে বৈষ্ণব আখড়াগুলোতে।

আমাদের বিস্তারিত আলোচনার পর একথা বলতে পারি যে, নারীপুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষের সহজ সরল ধর্মীয় জীবনযাপনের অন্যতম ক্ষেত্র নদিয়া ও বর্ধমান জেলার এই শ্রীপাটগুলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীপাটগুলো চরম আর্থিক দুরাবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে। বাড়িগুলোর আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে পাটবাড়িগুলোর ঐতিহ্যও নষ্ট হচ্ছে। গর্ভমন্দিরগুলো ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শান্তিপুরের মধ্যম গোস্বামীর বাড়ির ‘গোকুলচাঁদ দেব’-এর মন্দিরের গায়ে সূক্ষ্ম টেরাকোটার কাজ চোখে পড়ার মতো। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা, মধুরলীলা, দশাবতারের ছবি, সমাজের নানা ছবি চিত্রিত আছে এখানে। এগুলি নষ্ট হতে শুরু করেছে। অর্থের অভাবে বিগ্রহের নিত্যসেবা ও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করা শ্রীপাটগুলির পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যথেষ্ট নিরাপত্তার কারণে একের পর এক বহুমূল্য বিগ্রহ চুরি হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পাটবাড়ির বর্তমান বংশধরেরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজেদের সহায় সম্বল দিয়ে নতুন মন্দির তৈরি করছেন। বিগ্রহের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁরা মন্দির গুলোর সংস্কারও করছেন। এঁদের সরকারি অনুদানের আশু প্রয়োজন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসকন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পাটবাড়িগুলোর দিকে (যাজিগ্রাম ও কুলীনগ্রামের হরিদাস মঠে ইসকন নানা সাহায্য করেছে।) সদর্থক হোক বা নঞর্থক হোক ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গে বৈষ্ণব মঠের সংখ্যা বাড়ছে। আর স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীপাটের উপর মঠগুলোর প্রভাব বিস্তারিত হচ্ছে।

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে নদিয়া (শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কুলিয়া, যশড়া) এবং বর্ধমান (কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কুলীগ্রাম, অগ্রদ্বীপ ও অম্বিকা কালনা) জেলার বৈষ্ণব শ্রীপাটের আলোচনা সূত্রে ভারতবর্ষের অন্যতম ধর্ম বাংলার বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের সামগ্রিক রূপটি দেখতে পেয়েছি। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শ্রীপাটের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈষ্ণব নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন ও ধর্মীয় জীবনের নানা পরিচয় পেয়েছি। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শ্রীপাটগুলো নিজেদের মধ্যে সৌহার্দতা বজায় রেখে চলেছে। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে নদিয়া ও বর্ধমান জেলার শ্রীপাটের সেবাইত সদস্যরা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। দীর্ঘ সময়ের চলমানতায় তাঁদের আচার আচরণ কিছুটা পরিবর্তিত হলেও বৈষ্ণব ধর্ম চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসাবে বর্তমানে নদিয়া ও বর্ধমান জেলার শ্রীপাটগুলোর প্রাচীন ঐতিহ্য ও মর্যাদা বহুলাংশে সজীব হয়ে আছে। তাই সমাজে শ্রীপাটগুলোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের যথোপযুক্ত মূল্যায়নের ভীষণ প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ :

১। আহমদ, শরীফ, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' (দ্বিতীয় অধ্যায়); নিউ এজ, ঢাকা, ২০১৪।

২। কবিরাজ, কৃষ্ণদাস, 'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত'; সম্পা: সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮২।

৩। কোঙার, গোপীকান্ত সম্পাদিত, 'বর্ধমান সমগ্র'; মিত্রম্, কলকাতা, প্রথম খণ্ড-২০০৯, ষষ্ঠ খণ্ড-২০১১

৪। কুণ্ড, সুজলা, 'নিত্যানন্দ পরিক্রমা'; মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬।

৫। গিরি, সত্যবতী, 'বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ'; রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৮।

৬। গোস্বামী, কাননবিহারী, 'বাঘনাপাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য'; রবীন্দ্রভারতী, কলকাতা, ২০০৮।

৯। ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, 'রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা' (কাটোয়া মহকুমা); প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯।

১০। ঘোষ, বিনয়, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'; প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম খণ্ড- ২০১৪, দ্বিতীয় খণ্ড- ২০১৩, তৃতীয় খণ্ড- ২০১৩, চতুর্থ খণ্ড- ২০১২।

১১। চক্রবর্তী, নরহরি, 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর'; সম্পা: শ্রী নন্দলাল বিদ্যাসাগর, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা, ১৯৬০।

১২। চক্রবর্তী, মৃগাঙ্কশেখর, 'বাংলার কীর্তন গান'; সাহিত্যলোক, কলকাতা – ৬, ১৯৯৮।

১৩। চক্রবর্তী, রমাকান্ত, 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম'; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬।

১৪। চক্রবর্তী, রমাকান্ত, 'বাঙালির ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি'; সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০২।

১৫। চক্রবর্তী, সুধীর, 'উৎসবে মেলায় ইতিহাসে'; পুস্তকবিপনি, কলকাতা, ২০০৪।

১৬। চাকী, লীনা, 'মেলা-মোচ্ছব-ধুলোট'; কারিগর, কলকাতা; কারিগর সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩;

১৭। চট্টোপাধ্যায়, নিবারণচন্দ্র, 'কাটোয়ার ইতিহাস'; সম্পাদনা - স্বপনকুমার ঠাকুর, রাঢ়, বীরভূম, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

১৮। চৌধুরী, কমল, 'নদিয়ার ইতিহাস'; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম পর্ব- ২০১৫, দ্বিতীয় পর্ব- ২০১২।

১৯। চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড); পুস্তক বিপণি, কলিকাতা – ৯; প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯৪।

২০। চৌধুরী, ড. সুবোধ, 'বাঙালির বৈষ্ণব ভাবনা'; জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কোলকাতা, ২০০৯।

২১। জয়ানন্দ, 'চৈতন্যমঙ্গল'; সম্পা: সুখময় মুখোপাধ্যায় ও সুমঙ্গল রানা, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশনা বিভাগ, শান্তিনিকেতন, ১৯৯৪।

২২। জয়ানন্দ, 'চৈতন্যমঙ্গল'; সম্পা: নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১২ (ব.)।

২৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'শান্তিনিকেতন ভাষণমালা'; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৭

২৪। ঠাকুর, শ্রীগৌরগুণানন্দ, 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব'; বর্ধমান, ১৩৬১ (ব.)

২৫। দত্ত, অক্ষয় কুমার, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম ভাগ- ১৪২০ (ব.), দ্বিতীয় ভাগ- ১৪২২ (ব.)

২৬। দাস, অজিত, 'জাত বৈষ্ণব কথা' ; চারুবাক, কলকাতা, ১৯৯৩।
২৭। দাস, আনন্দ, 'শ্রীশ্রীজগদীশ চরিত্র বিজয়' ; সম্পাদনা - কিশোরী দাস বাবাজী, চৈতন্যডোবা উত্তর ২৪ পরগণা ; প্রথম সংস্করণ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
২৮। দাশ, লোকনাথ, 'সিতাচরিত্র পুথিক্ৰম' ৯৮২, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-মন্দির, কলকাতা।
২৯। দাস, গোবিন্দ, 'গোবিন্দদাসের কড়চা' ; দে'জ পাবলিশিং, কল, ১৪০৪ (ব.)।
৩০। দাস, চূড়ামণি, 'গৌরাঙ্গবিজয়' ; সম্পা : সুকুমার সেন, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৫৭।
৩১। দাস, নিত্যানন্দ, 'প্রেমবিলাস' ; সম্পা : শ্রী রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১২৯৮ (ব)।
৩২। দাস, পরিতোষ, 'সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম' ; ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৭।
৩৩। দাস, বৃন্দাবন, 'চৈতন্যভাগবত' ; সম্পা : সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ১৯৮২।
৩৪। দাস, লোচন, 'চৈতন্যমঙ্গল' ; সম্পা : বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৪০৭ (ব.)
৩৬। দাস, যদুনন্দন, 'কর্ণানন্দ' ; প্রকাশক - রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ; ১৫ আশ্বিন ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।
৩৭। দাস, শ্রীহরিদাস, 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান' ; সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড- ১৪২১ (ব.)
৩৮। দাস, শ্রীহরিদাস, 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন' ; নিবেদন : মিহিরকুমার রায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা ১৪২১ (ব.)
৩৯। দাস, শ্রীহরিদাস, 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-তীর্থ বা শ্রীপাট-বিবরণী', শ্রীহরিবোল কুটীর, নবদ্বীপ, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ।
৪০। দাস, হরিচরণ, 'অদ্বৈতমঙ্গল' ; সম্পা : শ্রী রবীন্দ্রনাথ মাইতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৩৭৩ (ব.)
৪১। দাস, ড. ক্ষুদিরাম, 'বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ' ; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩।
৪২। ধর, নিরঞ্জন, 'অবতার থেকে মানুষ' ; রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা –৭৩ ; জুন ২০১৩।
৪৩। নাগ, কল্যাণী, 'শান্তিপুর প্রসঙ্গ' ; প্রকাশক : রীনুয়া নাগ, নদিয়া, প্রথম খণ্ড- ১৯৯৪।
৪৪। নাগ, কল্যাণী, 'শান্তিপুর নাথ শ্রী শ্রী অদ্বৈতাচার্যের জীবনলীলা' ; প্রকাশক : শ্রী প্রভুপাদ স্বরুপ গোস্বামী, নদিয়া, ২০১৫।
৪৫। নাগর, ঈশান, 'শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ' ; সম্পা : সতীশচন্দ্র মিত্র, মানসী, কলকাতা, প্রথম মানসী সংস্করণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ।
৪৬। পণ্ডিত, কৃত্তিবাস, 'রামায়ণ' ; সম্পাদনা- সুখময় মুখোপাধ্যায় ; ভারবি, কলকাতা- ৭৩ ; ২০১৫
৪৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস, চৈতন্যচর্চার পাঁচশো বছর ; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭।
৪৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলক কুমার সম্পাদিত, 'বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রাম' ; পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।
৪৯। বসু, তাপস (সম্পা :), 'শ্রীচৈতন্য একালের ভাবনা' ; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪।
৫০। বসু, মালাধর, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', সম্পাদনা - অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গল রাণা। রত্নাবলী, কলকাতা – ৯ ; ২০১২।
৫১। ভট্টাচার্য, কালীকৃষ্ণ, 'শান্তিপুর পরিচয়' ; কলকাতা, ১ম ও ২য় ভাগ- ১৩৪৯ (ব.)

৫২। ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা:), 'চৈতন্য প্রসঙ্গ' ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৯৬ (ব.)
৫৩। ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় ও সরকার গিরিধারী সম্পাদিত; 'বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান', কলকাতা ৭৩, ২০১২।
৫৪। ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, 'ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস' ; জেনারেল, কলকাতা, ২০১৪।
৫৫। ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ, 'ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য' ; কলিকাতা গ্রন্থাগার, ১৯৬৪।
৫৬। ভট্টাচার্য, রত্না, ভট্টাচার্য, শক্তিপদ, 'পায়ে পায়ে নদিয়া' জেলা ভ্রমণ গ্রন্থমালা/৫),
পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা – ৭৩, মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
৫৭। ভট্টাচর্য, ষষ্ঠীচরণ, 'বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি' ; পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০১।
৫৮। ভদ্র, জগদ্বন্ধু, 'শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী' ; সম্পাদনা - মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির, কলকাতা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ।
৫৯। মজুমদার, বিমানবিহারী, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' ; সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৬।
৬০। মজুমদার, রমেশচন্দ্র, 'বাংলাদেশের ইতিহাস' (মধ্যযুগ) ; জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৮৭।
৬১। মণ্ডল,রাধামাধব,'বর্ধমানের ইতিহাস ইতিহাসের বর্ধমান' ;সহযাত্রী, কল- ৯, ১৬।
৬২। মল্লিক, কুমুদনাথ, 'নদিয়ার ইতিহাস' (প্রথম পর্ব) ; সৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফী, হরিদাস নন্দী, সংগ্রহ ও সম্পাদনা - কমল চৌধুরী,কলকাতা ৭৩।
৬৩। মাইতি, রবীন্দ্রনাথ, 'চৈতন্যপরিকর' ; বুকল্যাণ্ড, কলকাতা, ১৯৬২।
৬৪। মুখোপাধ্যায়, ডঃ হরেকৃষ্ণ, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা' ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১১।
৬৫। মুখোপাধ্যায়, ডঃ হরেকৃষ্ণ, 'গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি' ; সম্পা: বিশ্বনাথ রায়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৯।
৬৬। মুখোপাধ্যায়, ডঃ হরেকৃষ্ণ, 'বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া' ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১১।
৬৭। মিত্র, সতীশচন্দ্র, 'যশোর-খুলনার ইতিহাস' (১ম খণ্ড) ; চক্রবর্তী চাটার্জী এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।
৬৮। মুরশিদ, গোলাম, 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' ; অবসর, ঢাকা, ২০১৪।
৬৯। রানা, সুমঙ্গল, 'ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্য' ; অঞ্জন প্রকাশনী, বোলপুর, ১৯৮৮।
৭০। রায়, কার্তিকেয় চন্দ্র দেওয়ান, সেন, নবীনচন্দ্র 'নদিয়ার ইতিহাস' (দ্বিতীয় পর্ব) ; সংগ্রহ ও সম্পাদনা - কমল চৌধুরী, কলকাতা ৭৩, ২০১২।
৭১। রায়, জীমূতবাহন, 'শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবসমাজ' ; বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৮৪।
৭২। রায়, নীহাররঞ্জন, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' ; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আদিপর্ব- ১৪২০
৭৩। রায়চৌধুরী, গিরিজাশঙ্কর, 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ' ; অরুণা প্রকাশনা, কলকাতা, ২০১২।
৭৪। সান্যাল, হিতেশরঞ্জন, 'বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস' ; কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০১২।
৭৫। সিংহ, কবিতা, 'সপ্তদশ শতকের বাঙালির সমাজ ও সাহিত্য' ; পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৪।
৭৬। সেন, দীনেশচন্দ্র, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ; সম্পা: নিমাইচন্দ্র পাল, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, ২০০৯।
৭৭। সেন, দীনেশচন্দ্র, 'হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম' ; নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৫ সাল ;

৭৮। সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, 'গৌরাঙ্গ পরিজন'; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; কলকাতা – ৭৩, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।
৭৯। সেন, সুকুমার, 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী'; বিশ্বভারতী গবেষণা বিভাগ, ১৩৫২ (ব.)
৮০। সেন, ক্ষিতিমোহন, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা; বঙ্গীয় কলা কেন্দ্র, কলকাতা, ২০১৪।

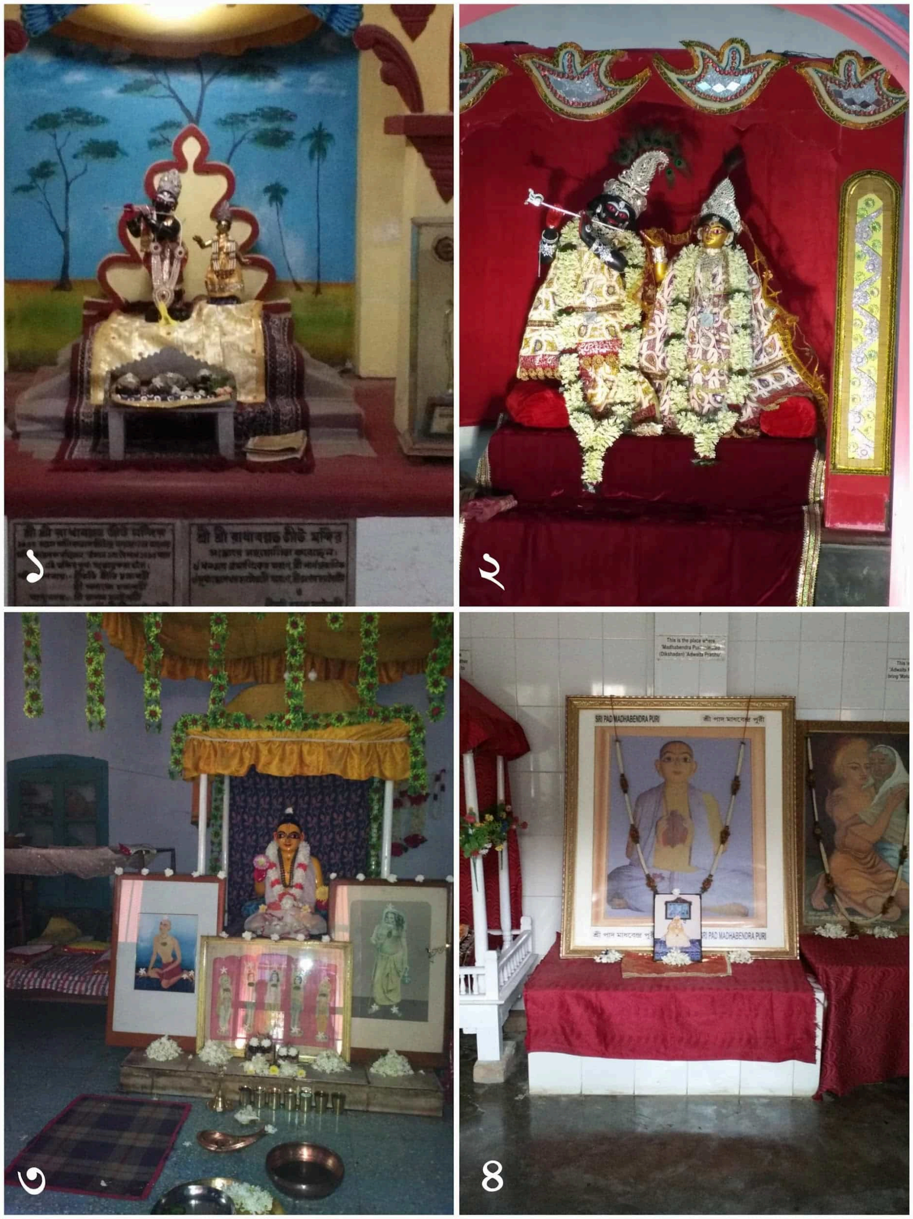
ইংরেজি গ্রন্থ :
1. Chakrabarty, Ramakanta, 'Vaishnavism in Bengali : 1486 – 1900' ; Sanskrita Pustak Bhandar, Calcutta, 1985.
2. De, S.K, 'Early History of Vaishnavism Faith & Movement'; Firmar KL.M, Calcutta, 1961.
3. Goswami, Dr.DwijendraNarayan; 'Origin and Development of Vaisnavism in Manipur', Akshar Publication, Agartala, 2010
4. J.G.Bartholomew F.R.G.S, 'IMPERIAL GAZETTEER OF INDIA'; (Vol-XVII), Oxford at the Clarendon Press, London, 1908

পত্রিকাপঞ্জি
বাংলা :
১। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'; ১১ই নভেম্বর, ১৯৮৯।
২। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'; ১৫ই অগস্ট, ২০১৫।
৩। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'; ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
৪। 'ইতিহাস অনুসন্ধান' (২৫খণ্ড); পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা-২০; ২০১১।
৫। 'ওভারল্যাণ্ড'; ৩১শে অক্টোবর- ৬ই নভেম্বর, ১৯৯০।
৬। 'খবরের কাগজ'; ২৮শে নভেম্বর, ২০১২।
৭। 'দশদিশি'; চৈতন্যসংখ্যা, জুলাই, ২০০৯।
৮। 'দশদিশি'; চৈতন্যসংখ্যা (দ্বিতীয় পর্ব), এপ্রিল- সেপ্টেম্বর, ২০১৫।
৯। 'দেশ'; ১৭ই মার্চ, ২০১১।
১০। 'দৈনিক বসুমতী'; ৫ই নভেম্বর, ১৯৮৭।
১১। 'বর্তমান'; ২১শে নভেম্বর, ১৯৯৯।
১২। 'মিলেমিশে'; ডিসেম্বর, ২০১০।
১৩। 'শ্রীময়ী শান্তিপুর'; ১৫ই নভেম্বর, ২০০৫।
১৪। 'সমাজের প্রতিচ্ছবি'; এপ্রিল, ১৯৯৭।
১৫। 'সমাজের প্রতিচ্ছবি'; রাসসংখ্যা, নভেম্বর, ২০১১।
১৬। 'সাপ্তাহিক বর্তমান'; ১১ই নভেম্বর, ২০০০।
১৭। 'সাপ্তাহিক বর্তমান'; মার্চ, ২০১১।
১৮। 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা' অষ্টাদশ ভাগ (ত্রৈমাসিক); সম্পাদক – নগেন্দ্রনাথ বসু; ১৩১৮ বঙ্গাব্দ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-মন্দির, কলকাতা- ৭।

ইংরাজি পত্রিকাপঞ্জি :

1. 'BENGAL PAST & PRESENT' (VOL-III); Journal of The Calcutta Historical Society; calautta, 1938.

পরিশিষ্ট



১ শান্তিপুরে চাকফেরা গোস্বামী বাড়ির রাধাবল্লভ ও রাধিকা বিগ্রহ; ২. শান্তিপুরে গোস্বামী ভট্টাচার্য বাড়ির বিজয়কৃষ্ণ বিগ্রহ; ৩. শান্তিপুরে অদ্বৈত অদ্বৈতাচার্যের বিগ্রহ; ৪. শান্তিপুরে অদ্বৈতপাটে মাধবেন্দ্র পুরীর চিত্র



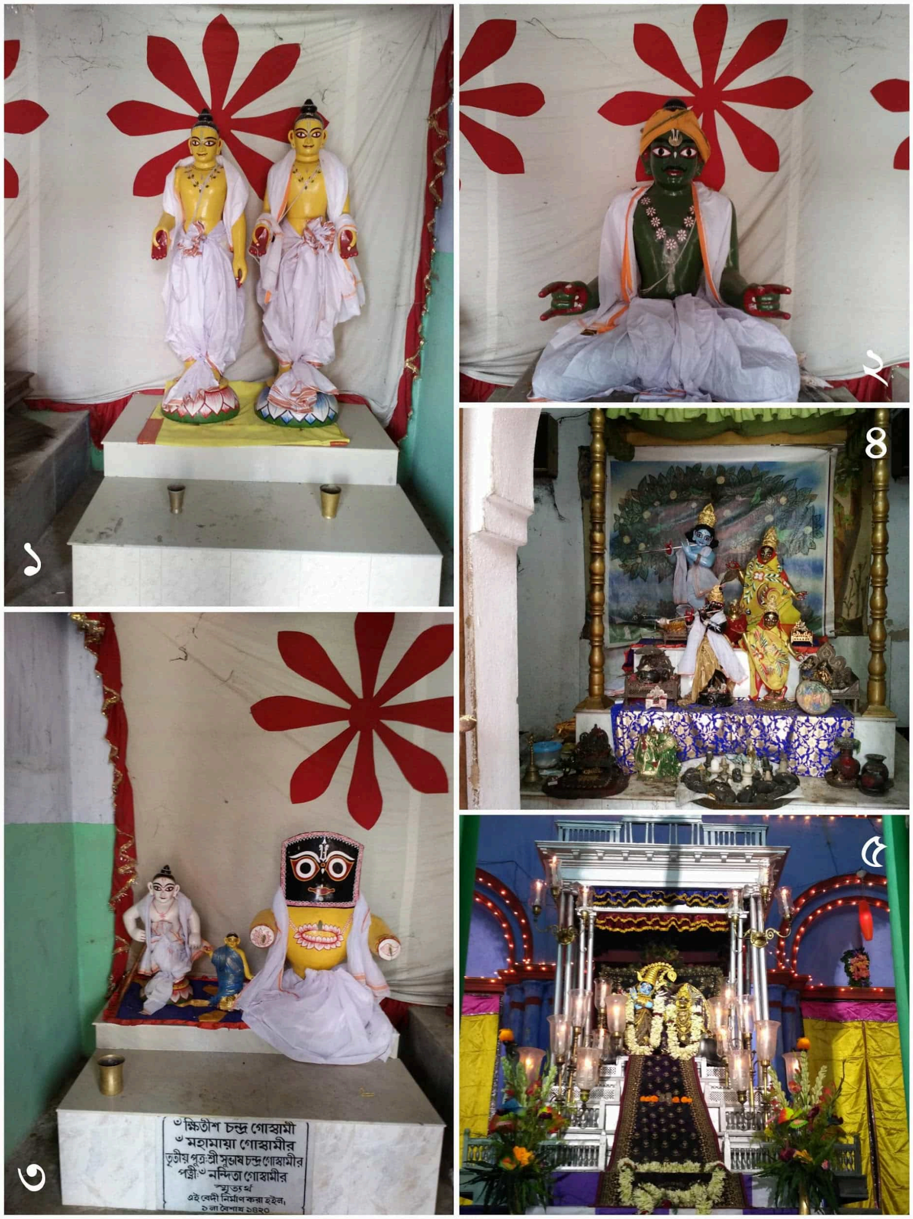
১ - ৬ শান্তিপুরে পাগলা গোস্বামী বাড়ির কেশবরায় রাধিকা বিগ্রহ বিভিন্ন সাজে সজ্জিত; ৭. পাগলা গোস্বামী বাড়ির রাসের কুঞ্জ সজ্জা; ৮. পাগলা গোস্বামী বাড়ির কুঞ্জভঙ্গের দৃশ্য; ৯. পাগলা গোস্বামী বাড়ির নারীদের বিগ্রহ সেবা; ১০. পাগলা গোস্বামী বাড়ির বিগ্রহের ভোগরাগ



শান্তিপুরে বড়গোস্বামী বাড়ির জন্মাষ্টমী, ফুলদোলে রাধারমণ ও রাধিকার
সাজ-সজ্জার চিত্র



১. শান্তিপুরে মদনগোপাল বাড়ির মদনগোপাল বিগ্রহ; ২. মদনগোপাল বাড়ির অদ্বৈতাচার্য ও সীতাদেবী; ৩. মদনগোপাল বাড়িতে গৌর নিতাই বিগ্রহ;
৪. আতাবুনিয়া গোস্বামী বাড়িতে শ্যামসুন্দর ও রাধিকা বিগ্রহ; ৫. বাঁশবুনিয়া গোস্বামী বাড়ির শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ ও রাধিকা বিগ্রহ



১. শান্তিপুরে হাটখোলা বাড়ির গৌর-নিতাই বিগ্রহ ; ২. হাটখোলা বাড়ির রামচন্দ্রের বিগ্রহ ; ৩. হাটখোলা বাড়ির জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম বিগ্রহ ; ৪. হাটখোলা বাড়ির শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদ ও রাধিকা, রাধাবিনোদ ও রাধিকা বিগ্রহ ; ৫. হাটখোলা বাড়ির শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদ ও রাধিকা বিগ্রহ



শান্তিপুরে হাটখোলা বাড়ির মন্দির গাত্রে টেরাকোটার চিত্র



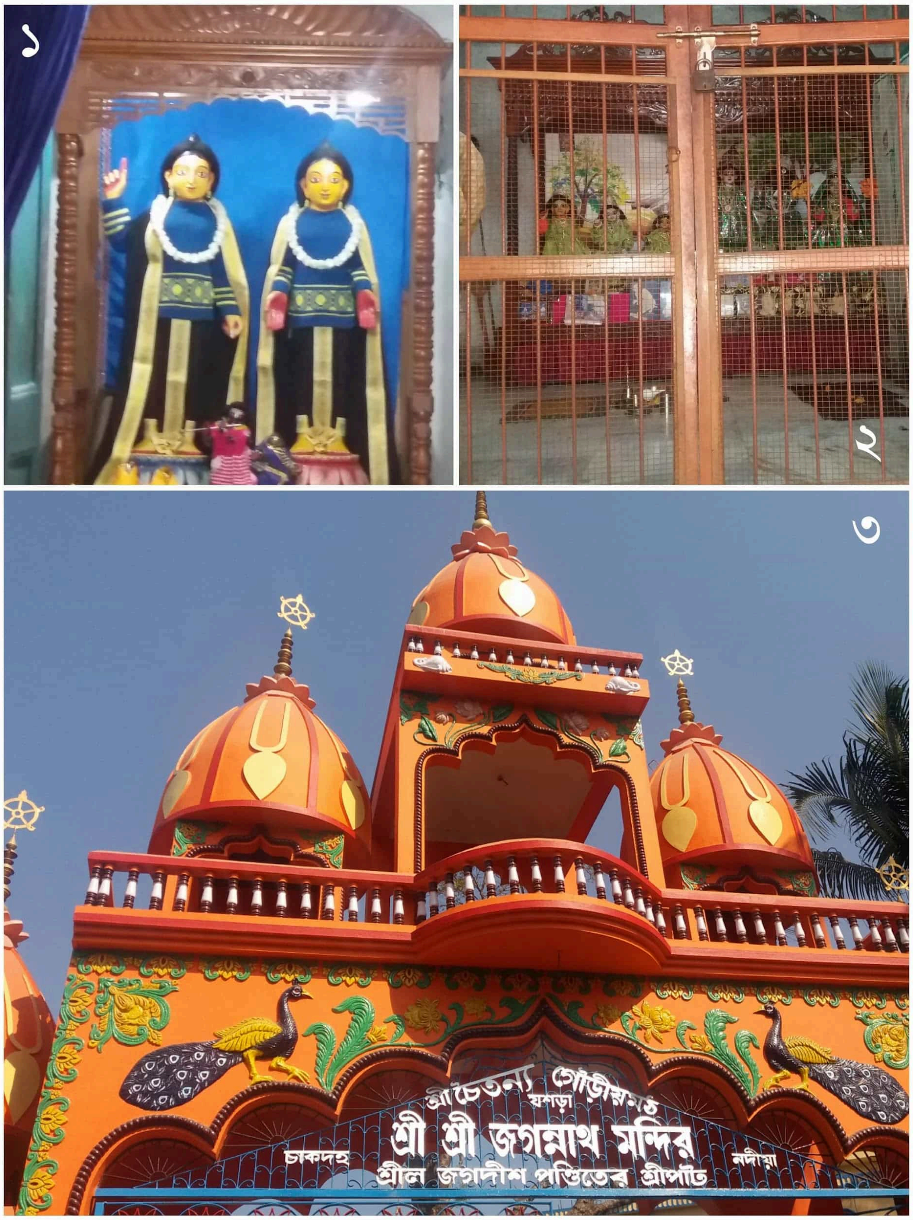
১. শান্তিপুরের রাসের শোভাযাত্রার বিগ্রহ ; ২. রাসের শোভাযাত্রায় রাইরাজা ;
৩. শান্তিপুরের রাসে কাশীর শঙ্করাচার্য



১. শ্রীপাট নবদ্বীপে রাধারমণ চরণদাসের মূর্তি; ২. শ্রীপাট নবদ্বীপে রাধারমণ বাগ সমাজবাড়ির গৌর-নিতাই বিগ্রহ; ৩. শ্রীপাট নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের সূতিকা গৃহ, নিম বৃক্ষ
৪. শ্রীপাট নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের জন্মস্থানে সেবিত বিগ্রহ



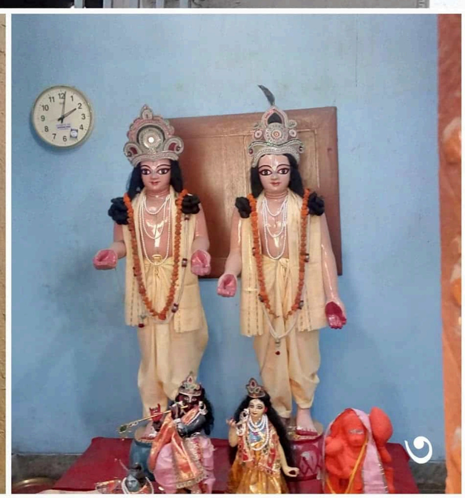
১. শ্রীপাট নবদ্বীপে সোনার গৌরাঙ্গ বিগ্রহ; ২. শ্রীপাট নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনের পঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহ; ৩. শ্রীপাট নবদ্বীপে জগাই-মাধাই উদ্ধার মন্দিরে ষড়ভূজ গৌরাঙ্গ মূর্তি;
৪. শ্রীপাট নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনের গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ; ৫. শ্রীপাট নবদ্বীপে জগাই-মাধাই উদ্ধার মন্দিরে গৌর-নিতাই বিগ্রহ; ৬. শ্রীপাট নবদ্বীপে রাধারমণ বাগ সমাজবাড়ির বিগ্রহ



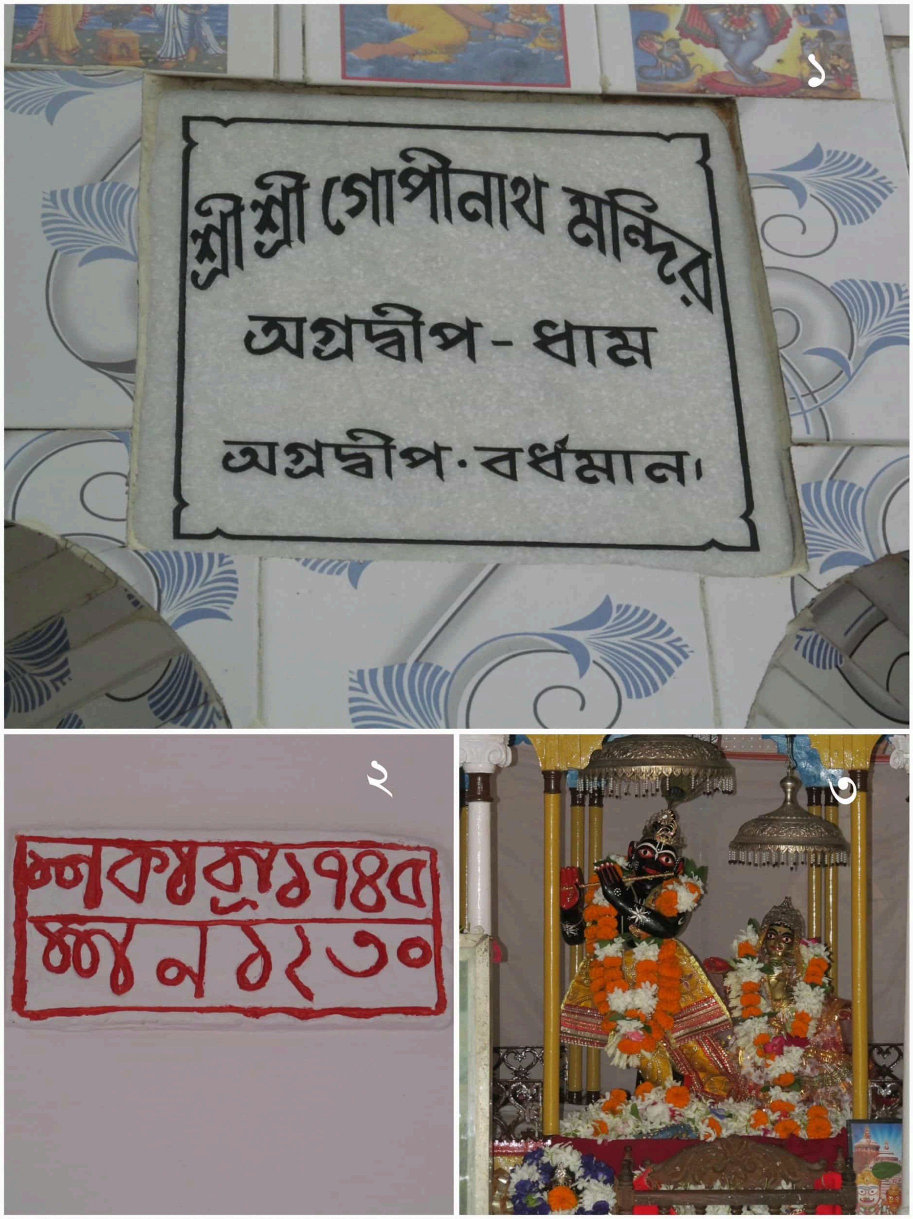
১. যশড়ায় মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে গৌর-নিতাই বিগ্রহ; ২. যশড়া শ্রীপাটে বিগ্রহ; ৩. শ্রীপাট যশড়া



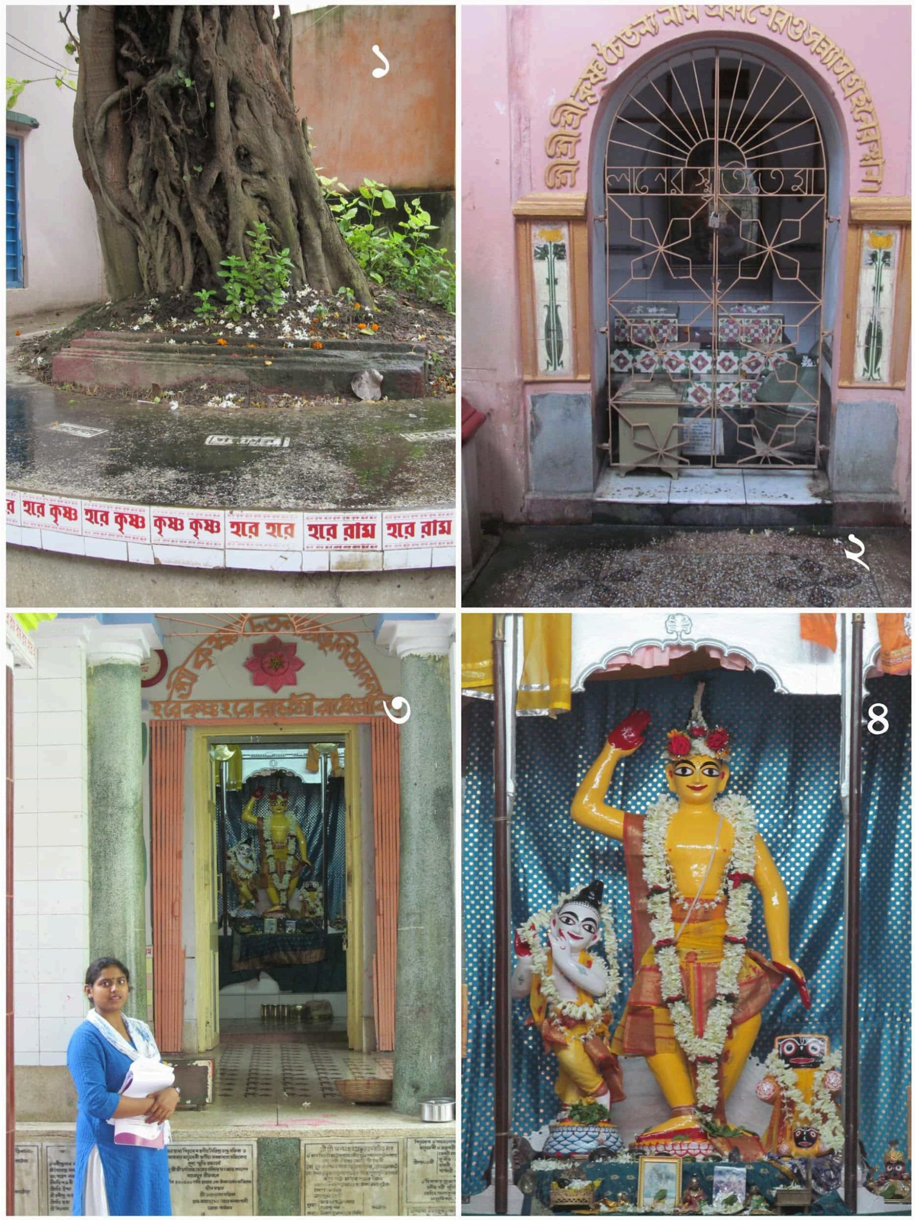




১. কুলিয়া শ্রীপাটে চাপাল-গোপালের সমাধি মন্দির; ২. কুলিয়া শ্রীপাটের নামফলক
৩. কুলিয়া শ্রীপাটে গৌর-নিতাই বিগ্রহ



১,২. শ্রীপাট অগ্রদ্বীপের নামফলক ও প্রতিষ্ঠা ফলক ; ৩. শ্রীপাট অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ ও রাধিকা বিগ্রহ



১. গৌরাঙ্গের মস্তক-মুণ্ডন স্থান; ২. গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ স্থান; ৩. কাটোয়া গৌরাঙ্গ বাড়িতে গবেষক; ৪. শ্রীপাট কাটোয়ার গৌরাঙ্গ মূর্তি



১. হরিদাস গৌড়ীয় মঠের মহাপ্রভু বিগ্রহ; ২. কুলীনগ্রাম শ্রীপাটে রঘুনাথ মন্দিরে রাম-সীতা-হনুমান বিগ্রহ;
৩. কুলীনগ্রাম হরিদাস গৌড়ীয় মঠের হরিদাস বিগ্রহ;
৪. কুলীনগ্রাম শ্রীপাটে জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ বিগ্রহ; ৫. কুলীনগ্রাম শ্রীপাটে মদনগোপাল মন্দিরে মদনগোপাল-শ্রীরাধিকা-শ্রীললিতা বিগ্রহ



১. যাজিগ্রাম শ্রীপাটের কূলদেবতা রাধানাথ ও রাধারাণী বিগ্রহ; ২. যাজিগ্রাম শ্রীপাটে হেমলতা দেবী সেবিত গোপাল বিগ্রহ; ৩. যাজিগ্রাম শ্রীপাটে গোপাল ভট্টের থেকে পাওয়া শ্রীনিবাস আচার্য সেবিত বংশীবদন শিলা; ৪. শ্রীপাট যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের মূর্তি



১. শ্রীপাট শ্রীখণ্ডের শ্যামসুন্দর ও রাধারানী বিগ্রহ; ২-৩ শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুরের গৃহ ও শিলা ফলক; ৪. মদনমোহন ও রাধিকা বিগ্রহ; ৫. মদন গোপাল, রাধারানী বিগ্রহ এবং গৌরাঙ্গ জিউ; ৬. শ্ৰীপাট শ্রীখণ্ডে ক্ষীর খাওয়া গোপীনাথ;

৭. শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে বসবাসকারী বৈষ্ণবী; ৮. শ্রীপাট শ্ৰীখণ্ডের অন্তর্গত বড়ডাঙ্গা মন্দিরের নাটুয়া গৌর; ৯. রঘুনন্দন গোস্বামী ও অভিরাম ঠাকুরের মিলনস্থল;

১০. লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল রচনার স্থান